NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

SELF LEARNING MATERIAL

POST GRADUATE DEGREE PROGRAMME

PGJM

MA IN JOURNALISM & MASS COMMUNICATION

PGJM-1A PRINCIPLES OF COMMUNICATION
PGJM-1B HISTORY OF MEDIA

1

A & B

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনও বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হয়ে চলেছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধীতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার সুবিধা পেয়ে যাবেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি, 2022

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ডিসট্যান্স এডুকেশন ব্যুরোর সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the University Grant Commission (UGC),
Distance Education Bureau, New Delhi.

PGJM

M.A. in Journalism & Mass Communication

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

প্রথম পত্র - IA জ্ঞাপন- নীতি (Principles of Communication)

রচনা (Content Writer)

ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর,
সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
মানববিদ্যা অনুষদ,
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা (Editor)

অধ্যাপক শাশ্বতী গঙ্গোপাধ্যায়
অধ্যাপক, গণজ্ঞান বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পত্র - IB মিডিয়ার ইতিহাস (History of Media)

মডিউল	রচনা (Content Writer)	সম্পাদনা (Editor)
মডিউল ১	**সুস্মিতা পণ্ডিত** অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ফিউচার ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট, কলকাতা	**ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য** অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ মানববিদ্যা অনুষদ নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
মডিউল ২	**রাতুল দত্ত** সহ-সম্পাদক (গ্রুপ-এ), তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	
মডিউল ৩	**সায়ন চট্টোপাধ্যায়** অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, বারুইপুর কলেজ	
মডিউল ৪	**ড: জয়তী কুমার** ফ্যাকাল্টি , গণজ্ঞাপন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়	

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোরকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

কিশোর সেনগুপ্ত
নিবন্ধক

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ

স্নাতকোত্তর বিষয় সমিতি (PG Board of Studies)

অধ্যাপক শাশ্বতী গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক, গণজ্ঞাপন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান

স্নেহাশিস সুর, প্রবীণ সাংবাদিক, দূরদর্শন কেন্দ্র, কলকাতা

ড: দেবজ্যোতি চন্দ, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, গণজ্ঞাপন ও ভিডিওগ্রাফি বিভাগ,
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

ড: পল্লব মুখোপাধ্যায়, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ,
মানববিদ্যা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ,
মানববিদ্যা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অরিজিৎ ঘোষ, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ,
মানববিদ্যা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল, ডিরেক্টর, মানববিদ্যা অনুষদ,
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

PGJM

প্রথম পত্র ঃ প্রথম পর্যায় - **IA**

জ্ঞাপন-নীতি **(Principles of Communication)**

মডিউল -১ : জ্ঞাপন ধারণা

একক - ১ ◘	জ্ঞাপনের মাত্রা, বিভিন্ন ধরনের জ্ঞাপন	**9-12**
একক - ২ ◘	মৌখিক এবং অমৌখিক জ্ঞাপন	**13-15**
একক - ৩ ◘	গণজ্ঞাপনের কাজ এবং উপাদান	**16-19**
একক - ৪ ◘	গণজ্ঞাপনের প্রভাব-গণজ্ঞাপন এর বিভিন্ন মাধ্যম এবং তাদের বৈশিষ্ট্য	**20-26**

মডিউল -২ : জ্ঞাপন তত্ত্ব-১

একক - ১ ◘	জ্ঞাপন তত্ত্বের গুরুত্ব, দ্বি-স্তর ও বহুস্তর প্রবাহ তত্ত্ব, জ্ঞাপন পৃথক পার্থক্য তত্ত্ব	**29-34**
একক - ২ ◘	বিষয় নির্বাচন ও দ্বার-রক্ষার তত্ত্ব, উদ্ভাবন মিথস্ক্রিয়া তত্ত্ব, ব্যক্তি প্রভাব তত্ত্ব	**35-39**
একক - ৩ ◘	বিভিন্ন তত্ত্ব : কর্তৃত্ববাদী, উদারবাদী, সাম্যবাদী গণমাধ্যম, সামাজিক দায়বদ্ধতা	**40-42**
একক - ৪ ◘	উন্নয়ন গণমাধ্যম তত্ত্ব, গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ তত্ত্ব, কনভারজেন্স	**43-47**

মডিউল -৩ : জ্ঞাপন তত্ত্ব-২

একক - ১ ◘	জ্ঞাপন মডেল ধারণা, লিনিয়ার এবং নন-লিনিয়ার মডেল। (রৈখিক এবং অরৈখিক মডেল) মৌখিক মডেল, আইকনিক মডেল, অ্যানালগ্ মডেল	**49-54**
একক - ২ ◘	অ্যারিস্টটল মডেল, লাসওয়েল্ মডেল, ওসগুড্ মডেল, স্ক্রাম মডেল, গাবর্নর মডেল	**55-61**
একক - ৩ ◘	বার্লো মডেল, শ্যানন্ ওয়েডার মডেল, দ্য ফ্ল্যর মডেল, দ্বি-স্তর প্রবাহ মডেল	**62-69**
একক - ৪ ◘	নিউকম্ব মডেল, ওয়েসলি এবং ম্যাকলিন মডেল, ডান্স মডেল	**70-73**

মডিউল -৪ : জ্ঞাপন প্রভাব তত্ত্ব

একক - ১ ◘	ম্যাজিক বুলেট তত্ত্ব ব্যবহার এবং সন্তুষ্টি তত্ত্ব	**74-78**
একক - ২ ◘	স্পাইরাল অফ সাইলেন্স, জ্ঞানীয় ও অনৈক্য তত্ত্ব	**79-83**
একক - ৩ ◘	উপস্থাপনা বিন্যাস তত্ত্ব, সাম্যবাদী তত্ত্ব, অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য	**84-93**
একক - ৪ ◘	কাল্টিভেশন তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ	**94-97**

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

PGJM

প্রথম পত্র ঃ দ্বিতীয় পর্যায় - **IB**

মিডিয়ার ইতিহাস **(History of Media)**

মডিউল - ১ : ভারতে প্রেসের ইতিহাস

একক - ১ ◻ টাইপসেটিং এবং মুদ্রণ প্রযুক্তির বিকাশ এবং তাদের প্রভাব-বিশেষ উল্লেখ ভারতের ক্ষেত্রে **101-107**

একক - ২ ◻ ভারতে প্রেসের প্রারম্ভিক ইতিহাস **108-117**

একক - ৩ ◻ ১৮৫৭ এর পরে ভারতীয় প্রেসের বিকাশ **118-124**

একক - ৪ ◻ স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং স্বাধীনতার পর থেকে প্রেসের ভূমিকা **125-135**

মডিউল - ২ : সংবাদ সংস্থা

একক - ১ ◻ সংবাদ সংস্থার বিকাশ **136-141**

একক - ২ ◻ ভারতে সংবাদসংস্থার বিকাশ **142-146**

মডিউল - ৩ : স্বাধীনতা পরবর্তী প্রধান প্রবণতা

একক - ১ ◻ স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে বেতার, টেলিভশন, স্যাটেলাইটে টিভি ও ইন্টারনেট-এর সম্প্রসারণ **147-156**

একক - ২ ◻ প্রেস কমিশন এবং প্রেস কাউন্সিল **157-165**

একক - ৩ ◻ ভারতীয় গণমাধ্যম ও বিশ্বায়ন **166-174**

একক - ৪ ◻ ভারতে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন শিক্ষার বিকাশ **175-183**

মডিউল -৪ : ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাস

একক - ১ ◻ ভারতীয় চলচ্চিত্রের ঐতিহাসিক বিকাশ-প্রধান চলচ্চিত্র প্রযোজনা কেন্দ্র — বোম্বাই, চেন্নাই, কলকাতা ইত্যাদি **184-193**

একক - ২ ◻ ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের গুণীজন (স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়) **194-207**

একক - ৩ ◻ ফিল্ম সেন্সরশিপ **208-215**

একক - ৪ ◻ বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস **216-222**

প্রথম পত্র : প্রথম পর্যায়

পেপার - **IA**

জ্ঞাপন-নীতি
(Principles of Communication)

মডিউল-১ : জ্ঞাপন ধারণা (Conceptualizing Communication)

একক ১ ◘ জ্ঞাপনের মাত্রা, বিভিন্ন ধরনের জ্ঞাপন

গঠন

১.১.১ উদ্দেশ্য

১.১.২ প্রস্তাবনা

১.১.৩ জ্ঞাপন

১.১.৩.১ জ্ঞাপনের সংজ্ঞা

১.১.৩.২ বিভিন্ন ধরনের জ্ঞাপন

১.১.৪ সারাংশ

১.১.৫ অনুশীলনী

১.১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১.১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে জ্ঞাপন এর ধারণা পরিষ্কার হবে। তাহলে জানা যাক জ্ঞাপন বিষয়টি কি?

১.১.২ প্রস্তাবনা

এই একক জ্ঞাপন এর ধারণাকে আরও স্পষ্ট করবে। বিভিন্ন ধরনের জ্ঞাপন এর পরিচয় পাওয়া যাবে।

১.১.৩ জ্ঞাপন

জ্ঞাপন কী তা জানা জরুরী। জ্ঞাপন হলো তথ্যের আদান প্রদান এবং এই প্রক্রিয়া সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার।

জ্ঞাপন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন পারস্পরিক জ্ঞাপন, দলগত জ্ঞাপন, গণ জ্ঞাপন, এবং গণরেখ জ্ঞাপন।

পারস্পরিক জ্ঞাপন দুজন ব্যক্তির মধ্যে সংঘটিত হয়। যখন দুই বন্ধু কথা বলছে সেটি হলো পারস্পরিক জ্ঞাপন। একজন বলছে এবং অন্যজন শুনছে। একইভাবে অন্যজন বলছে আরেকজন শুনছে। তাৎক্ষণিক প্রতিবার্তা সহ এই জ্ঞাপন প্রতিনিয়ত চারপাশে ঘটছে।

দলগত জ্ঞাপনে অংশগ্রহণ করে দুই এর অধিক ব্যক্তি। চেনা কয়েকজন বন্ধু কফি হাউজে আড্ডা মারছে, এ হলো দলগত জ্ঞাপন।

গন জ্ঞাপনে ঘটে বহু মানুষের অংশগ্রহণ। একটি পরিকল্পিত বার্তা নির্বাহের মাধ্যমের সাহায্যে লক্ষ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক প্রতিবার্তা পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

গণ-রেখ জ্ঞাপন ঘটে বিখ্যাত নেতাদের বক্তৃতায়। মাও সে তুং, মহাত্মা গান্ধী, উইনস্টন চার্চিল শুধু বক্তৃতা দিয়েই মানুষের মনে গভীর পরিবর্তন এনেছিলেন। এই হল গণরেখা জ্ঞাপন।

১.১.৩.১ জ্ঞাপনের সংজ্ঞা

পারস্পারিক তথ্য ভাবনার আদান-প্রদান হল জ্ঞাপন। আমাদের নিত্যদিনের বেঁচে থাকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে জ্ঞাপন। দেহের ভঙ্গিমায়, মানুষের কথায়, গানের সুরে, লেখায়, ছবিতে ঘটে চলেছে এই জ্ঞাপন। জ্ঞাপন এর ইংরেজি শব্দ হল কমিউনিকেশন (communication) যা লাতিন ভাষা কমিউনিস (communis) থেকে এসেছে। Communis কথার অর্থ সাধারণ। ভাবনা এবং বার্তা যখন সাধারণের গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে তখনই সেটি সার্থক জ্ঞাপন। Dennis McQuail বলেছেন ''communication is a process which increases commonality'' অর্থাৎ জ্ঞাপন হল একটি প্রক্রিয়া যা সাধারণ গ্রহণযোগ্যতাকে বাড়ায়। বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা মারার সময় একটি কমন ভাষা দরকার যেটা আমি এবং আমার বন্ধু বুঝি। Dennis McQuail জ্ঞাপন কে মানবিক বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেন মানুষে মানুষে বোঝাপড়া, ভাবনার আদান-প্রদান ঘটে চলার মধ্যে দিয়ে সামাজিক সংহতি গড়ে ওঠে।

John C Merril and Ralph L Lowenstein বলেছেন জ্ঞাপন হলো দ্বিমুখী বার্তা। দুটি রাস্তা দিয়েই বার্তা প্রভাবিত হয়। একটি রাস্তা প্রেরকের থেকে গ্রাহকের দিকে যাবে। আরেকটি রাস্তা গ্রাহকের থেকে প্রেরকের দিকে আসবে। বোঝাপড়া নির্ভর করছে এই আদান-প্রদানের উপরে।

বিশ শতকের প্রখ্যাত গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ Wilbur Schramm বলেছেন জ্ঞাপন হলো সাধারণ গ্রহণযোগ্যতার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া। আমরা যখন জ্ঞাপন করি তখন বার্তা, ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গী ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করি। Schramm বলেছেন ''When we communicate we are trying to establish a commonness with someone'' বার্তা যাই হোক না কেন দু'জনকেই তা ভাগ করে নিতে হয়।

Colin Cherry বলেছেন জ্ঞাপন হলো উদ্দীপনা প্রেরণ এবং প্রতুত্তর তৈরীর প্রক্রিয়া (transmission of stimuli and evocation of response)। এর অর্থ হলো শুধুমাত্র বার্তা বিনিময় দিয়ে জ্ঞাপন হয়না, তাকে অবশ্যই উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হবে। গ্রাহক উদ্দীপিত হলেই তৈরি হবে প্রতিক্রিয়া যা তৈরি করবে প্রতুত্তর। এই ভাবেই জ্ঞাপন হয়ে ওঠে মানবিক।

George Gerbner জ্ঞাপন প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন জ্ঞাপন হল বার্তা বিনিময়ের মাধ্যমে সংগঠিত এক সামাজিক মিথস্ক্রিয়া (Communication is social interaction through messages)। গণমাধ্যম যখন কোন বার্তা পৌঁছে দেয় পাঠক বা দর্শকের কাছে তখন তৈরি হয় এক সামাজিক আন্তঃসম্পর্কের বিন্যাস, যার কোন স্থির রূপ নেই, ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তার নির্মাণ এবং পুনর্নির্মাণ হয়। জ্ঞাপন কাজে মানুষের অংশগ্রহণ যত বাড়ে আন্তঃসম্পর্কের ক্ষেত্র ততো প্রসারিত হয়ে মিথস্ক্রিয়ার শক্তি বৃদ্ধি করে।

১.১.৩.২ বিভিন্ন ধরনের জ্ঞাপন

জ্ঞাপন বিভিন্ন ধরনের হয়। জ্ঞাপন কে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, সেগুলি হল—

১. পারস্পরিক জ্ঞাপন (Interpersonal Communication) :

দুজন ব্যক্তির মধ্যে যে কথোপকথন চলে তাই হল পারস্পরিক জ্ঞাপন। প্রধানত কথাই হলো এই জ্ঞাপনের মাধ্যম। মানুষ মানুষের সঙ্গে কথা বলে বার্তা ভাব বিনিময় করে।এক বিশেষ সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল এর মধ্যে এই জ্ঞাপন প্রতিনিয়ত ঘটছে। পারস্পরিক জ্ঞাপন এর মধ্যে শুধুমাত্র কার্যকারী উপযোগিতা নেই , আনন্দ এবং দুঃখের মত অনুভবও আছে। এই জ্ঞাপনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো তাৎক্ষণিক প্রতিবার্তা। প্রত্যক্ষ জ্ঞাপন এর মধ্যে আন্তরিকতা আছে তা আর কোথাও পাওয়া যায় না।

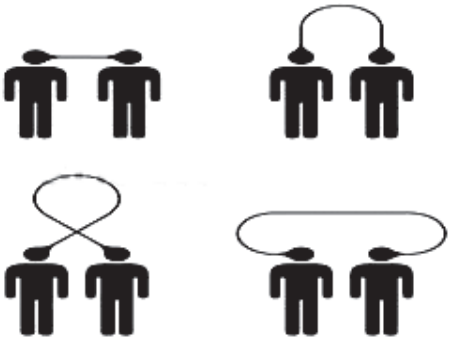

২. দলগত জ্ঞাপন (Group Communication) :

বেশকিছু মানুষ যখন জ্ঞাপন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তখন ঘটে দলগত জ্ঞাপন। একদল মানুষ নিজেদের মধ্যে আলোচনার মধ্যে দিয়ে ভাবের আদান প্রদান করে। এক্ষেত্রে কথোপকথন হলো প্রধান মাধ্যম। সভা-সমিতি আলোচনা সভা প্রভৃতি হলো দলগত জ্ঞাপন এর ক্ষেত্র। যেখানে একজন বলে বাকি সবাই শোনে। তারপর একে একে সকলের বলার সুযোগ আসতে পারে। তবে প্রতিবার্তা পেতে একটু সময় লাগে। দলগত জ্ঞাপন এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল বেশ কিছু মানুষকে এর মাধ্যমে এক সঙ্গে যুক্ত করা যায়।

গণ জ্ঞাপন (Mass Communication) :

জ্ঞাপন যখন গণ-র উদ্দেশ্যে করা হয় তখনই ঘটে গন জ্ঞাপন। যন্ত্র নির্ভর মাধ্যমের সাহায্যে এই জ্ঞাপন কার্য সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন, ভিডিও এবং সিনেমা এই জ্ঞাপন কার্য সম্পন্ন করে। গন জ্ঞাপনে প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাতে তাৎক্ষণিকতা ও স্বতস্ফূর্ততা একেবারেই থাকে না। প্রতিবার্তাও সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়

না। আজকাল সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবার্তা পাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু যন্ত্র নির্ভরতার জন্য সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু চেষ্টা চলছে। গনজ্ঞাপন পুরোপুরি পরিকল্পিত জ্ঞাপন প্রক্রিয়া। গণ মাধ্যমের প্রভাব আধুনিক সমাজে সবচেয়ে বেশি।

গণ-রেখ জ্ঞাপন (Mass Line Communication)

রাষ্ট্রনেতারা সাধারণ মানুষের কাছে বক্তৃতার মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন। এই বক্তব্যে যুক্তি যেমন থাকে তেমনি আবেগ থাকে। তারা জনগণকে শিক্ষিত করেন, প্রণোদিত করেন এবং উদ্দীপ্ত করেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজী সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন ব্রিটিশদের সঙ্গে অসহযোগিতা করতে। এই অসহযোগিতার বার্তা সাধারণ মানুষ গ্রহণ করেছিল। এই হল গণ রেখ জ্ঞাপনের দৃষ্টান্ত। চীনে মাও সে তুং, ব্রিটেনে চার্চিল বক্তৃতা দিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করেছিলেন। এই জ্ঞাপনে প্রতিবার্তা পেতে সময় লাগে।

১.১.৪ সারাংশ

জ্ঞাপন মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ স্থাপন করে। সামাজিক সম্পর্ক গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ স্থাপিত হলেই জ্ঞাপন ঘটে। জ্ঞাপন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে এগুলি হল পারস্পরিক, অন্তর্মুখী, দলগত এবং গণ জ্ঞাপন।

১.১.৫ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জ্ঞাপন কাকে বলে?

২. জ্ঞাপন এর উপাদান কি কি?

বড় প্রশ্ন

১. বিভিন্ন ধরনের জ্ঞাপন ব্যাখ্যা করুন।

২. জ্ঞাপন এর সংজ্ঞা নির্দেশ করে বুঝিয়ে দিন পারস্পরিক জ্ঞাপন আর দলগত জ্ঞাপন এর মধ্যে পার্থক্য কি?

১.১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১) Mass Communication Theory and Practice : Uma Narula

২) Communication Theory Today - Edited by David Cowley and Devid Michel

৩) গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী (অনুবাদ) : মেলভিন এল দি ফ্ল্যার, সন্দ্রাবল রোকেশ (বাংলা একাডেমি ঢাকা)

৪) জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম- ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা)

৫) গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি - ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা)

একক - ২ ◘ মৌখিক এবং অমৌখিক জ্ঞাপন

গঠন

১.২.১ উদ্দেশ্য

১.২.২ প্রস্তাবনা

১.২.৩ মৌখিক এবং অ-মৌখিক জ্ঞাপন

১.২.৪ সারাংশ

১.২.৫ অনুশীলনী

১.২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১.২.১ উদ্দেশ্য

পূর্ববর্তী ইউনিটে আমরা জ্ঞাপনের প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই ইউনিটে আমরা আরও দুটি ধরণের জ্ঞাপন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করব। এই ইউনিটটি পড়ার পরে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন।

- মৌখিক এবং অ-মৌখিক জ্ঞাপনের মধ্যে পার্থক্য

১.২.২ প্রস্তাবনা

পূর্ববর্তী ইউনিটে আমরা জ্ঞাপনের প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই ইউনিটে আমরা আরও দুটি ধরণের জ্ঞাপন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করব ।আমরা সকলেই জ্ঞাপনের জন্য মৌখিক অর্থ বা অ-মৌখিক উপায় ব্যবহার করি। আমরা এই ইউনিটে এটি নিয়ে আলোচনা করব।

১.২.৩ মৌখিক এবং অমৌখিক জ্ঞাপন

মৌখিক জ্ঞাপন

মৌখিক জ্ঞাপন ঘটে মুখের ভাষায়। মানুষের সঙ্গে মানুষের কথা বলার মাধ্যমে। সেটা বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর গল্প হতে পারে, আবার মা-ছেলের কথাবার্তা হতে পারে, আবার শিক্ষক ক্লাসে পড়ান, মুখের কথায় ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন জটিল বিষয়। এই সব হল মৌখিক জ্ঞাপন। মৌখিক জ্ঞাপনে তাৎক্ষণিক প্রতিবার্তা পাওয়া যায়। প্রতি সেকেন্ডে প্রতিবার্তা বিনিময় ঘটে চলেছে। শিক্ষক যখন ক্লাসে পড়ান ছাত্ররা তন্ময় হয়ে শোনে। এর অর্থ হল শিক্ষক যা মুখে বলছেন ছাত্রছাত্রীরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারছে।

মৌখিক জ্ঞাপন স্থাপিত হয় মুখোমুখি বা ফোন, ভয়েস চ্যাট, ভিডিও কনফারেন্সিং বা অন্য কোনও মাধ্যমে। বক্তৃতা, সম্মেলন হিসাবে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ মৌখিক জ্ঞাপনের ধরণ।

মৌখিক কথোপকথনের কার্যকারিতা বক্তৃতা, ভয়েস মড্যুলেশন, পিচ, ভলিউম, গতি এবং এমনকি শারীরিক ভাষা এবং ভিজ্যুয়াল সংকেতের উপর নির্ভর করে।

অ-মৌখিক জ্ঞাপন

অ-মৌখিক জ্ঞাপন মুখের ভাষায় ঘটে না, অভিব্যক্তিতে, গানে, ছবিতে লেখায় ঘটে চলে এই জ্ঞাপন। শেক্সপিয়ার থেকে রবীন্দ্রনাথ হল অ মৌখিক জ্ঞাপন যাত্রা। শুধু লেখায়, শব্দ নির্বাচনে, অসামান্য কুশলতা এবং ছন্দ বন্ধ নির্মাণে অমৌখিক জ্ঞাপন এক অন্য মাত্রা পেয়েছিল। কথা না বলেও কতকিছু যে জানানো যায় তা প্রকৃত অর্থে অকল্পনীয়। যেমন নাচ দেহের ভঙ্গিমাটি ছন্দে, নাটকীয়তায় অপরূপ শিল্পকলা মূর্ত হয়ে ওঠে এখানে। এটাই অ-মৌখিক জ্ঞাপন।

অ-মৌখিক জ্ঞাপন এর সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রতিনিধি হলো ছবি। রেখায় রেখায় রঙের বিচিত্র খেলা তৈরি করে বিমুর্ত শিল্প যা দর্শকদের দেয় শিল্পের অনুভব, আনন্দ রসের অঙ্গীকার। লেখার অনেক আগে কিন্তু ছবির আগমন হয়েছে। মানুষ যখন কথা বলতে শেখেনি তখনো সে গুহাচিত্রের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছে। সভ্যতার উন্মেষ এর সঙ্গে মানুষ ছবি এঁকেছে। ভাস্কর্য নির্মাণ করেছে। তৈরি হয়েছে যুগান্তকারী ছবি, ভাস্কর্য ও শিল্পকলা। ষোড়শ শতাব্দীতে আমরা পেয়েছি মাইকেলঅ্যাঞ্জেলো, রুবেন্স ইত্যাদিকে। এরা প্রত্যেকেই ছিলেন ইউরোপের রেনেসাঁর অগ্রদূত। ১৮ শতক থেকে ২০ শতক পর্যন্ত বহু নামিদামি শিল্পীই আবির্ভাব ঘটেছিল। রেমব্রাডন্ট, ভ্যান গগ, মাতিস, ক্লদ মোনে সালভাদর দালি, পিকাসো, রবীন্দ্রনাথ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলত কবি, গদ্যকার, গীতিকার। প্রকাশের সর্বস্তরে তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য। এমন বহুমুখী প্রতিভা নিজের সৃষ্টিকে বোধ হয় সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারছিলেন না তাই ৬৩ বছর বয়সে শুরু করেছিলেন ছবি আঁকা। প্রায় ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত অক্লান্তভাবে ছবি এঁকেছিলেন প্রায় আড়াই হাজার ছবি। বিশেষজ্ঞরা বলেন তার ছবি ছিল অসামান্য। তার ছবি তার সব সৃষ্টিকে ছাড়িয়ে গেছে। প্রতিনিয়তই আমরা এরকম অমৌখিক জ্ঞাপন এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি আকারে-ইঙ্গিতে এবং ভঙ্গিমায় তার প্রকাশ ঘটে।

তবে, লক্ষ করা উচিত যে অ-মৌখিক যোগাযোগ একা বা সাংকেতিক ছবির মাধ্যমে সংঘটিত হতে পারে। নীচের চিত্রটি দেখুন একি একটি মুখের অভিব্যক্তি নির্দেশ করে যা আমরা 'স্মাইলি' বলে জানি। এগুলি হ'ল সুখ, রাগ, শোক, ভয় ইত্যাদি বিভিন্ন মুখের ভাব। ট্রাফিক পয়েন্টে একজন ট্রাফিকপুলিশকে দেখুন। তিনি কোনও কথা বলেন না তবে 'থামুন' বা 'যান' সিগন্যাল করতে তাঁর হাত ব্যবহার করেন। কেউ আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে, "আপনি কি বাজারে যাচ্ছেন"? আপনি আপনার মাথাটি ব্যবহার করে "হ্যাঁ" বা "না" বলেন। উপরের সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা কোনও শব্দ ব্যবহার না করে আমাদের অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা প্রকাশ করি।

১.২.৪ সারাংশ

জ্ঞাপনকে আবার দুভাগে বিভাজন করা যায় একটি হলো মৌখিক জ্ঞাপন। যোগাযোগ যখন মুখের কথায় আটকে থাকে তখন হয় মৌখিক জ্ঞাপন। অন্যটি হলো অ মৌখিক জ্ঞাপন, সম্ভবত লিখিত যোগাযোগ হল অমৌখিক জ্ঞাপন, ছবির মাধ্যমে হলেও তা কিন্তু অ মৌখিক জ্ঞাপন এর পর্যায়ে পড়ে।

১.২.৫ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মৌখিক জ্ঞাপন কাকে বলে?

২. অ মৌখিক জ্ঞাপন কি?

বড় প্রশ্ন

১. মৌখিক ও অ মৌখিক জ্ঞাপন এর মধ্যে পার্থক্য উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করুন।

২. অ মৌখিক ও মৌখিক জ্ঞাপন এর মধ্যে কি কোনো বিরোধ আছে? যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করুন।

১.২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১) Mass Communication Theory and Practice: Uma Narula

২) Communication Theory Today - Edited by David Cowley and Devid Michel

৩) গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী (অনুবাদ): মেলদিন এল কি ফ্ল্যার, সন্দ্রাবল বকানো (বাংলা একাডেমি ঢাকা)

৪) জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম- ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

একক-৩ ◘ গণজ্ঞাপনের কাজ এবং উপাদান

গঠন

১.৩.১ উদ্দেশ্য

১.৩.২ গণজ্ঞাপনের কাজ

১.৩.৩ গণজ্ঞাপনের উপাদান

১.৩.৪ সারাংশ

১.৩.৫ অনুশীলনী

১.৩.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১.৩.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ার পরে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন

- গণজ্ঞাপনের কাজ
- গণজ্ঞাপনের উপাদান

১.৩.২ গণজ্ঞাপনের কাজ

গণজ্ঞাপন এর মূল কাজ তিনটি—তথ্য সরবরাহ করা, শিক্ষিত করা এবং বিনোদনের উপকরণ যোগানো। তথ্য সরবরাহের মধ্যে নিহিত আছে পরিবেশের প্রতি সজাগ দৃষ্টি (surveillance of the environment)। শুধুমাত্র তথ্য সরবরাহ করলেই হয় না, তথ্যকে ব্যাখ্যা করাও গণমাধ্যমের কাজ। গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা বলেন তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও আচরণের নির্দেশ এর মধ্যে দিয়ে শিক্ষিত করার প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হয়। আধুনিক গণমাধ্যম সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হচ্ছে বিনোদনের ওপরে। রেডিও-টেলিভিশন, ভিডিও চলচ্চিত্রের প্রধান উদ্দেশ্যই হলো বিনোদনের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করা। গণমাধ্যমের কার্যধারার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে বিনোদনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আধুনিক গণজ্ঞাপনের কার্যধারা আরো বেশী জটিল হয়ে উঠেছে। কার্য বিন্যাসের রূপরেখা আরও বিস্তৃত হচ্ছে এবং সামাজিক প্রেক্ষিত অনুযায়ী গণজ্ঞাপন এর কার্য ধারাতেও বৈচিত্র আসছে। বর্তমানে গণজ্ঞাপন এর কার্য গুলি কে এই ভাবে বর্ণনা করা যায় :

তথ্য (Information) :

এটা গণজ্ঞাপন এর প্রাথমিক কাজ। গণমাধ্যম প্রতিনিয়ত আমাদের বিপুল তথ্য সরবরাহ করছে। সংবাদের বিভিন্ন রচনায় ও প্রবন্ধে, রেডিও কথিকা, টেলিভিশন সংবাদ ও সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন তথ্য থাকে। তথ্য বিবিধ বিষয়ে আমাদের অবহিত করে এবং বিষয়ের সারমর্ম বুঝতে সাহায্য করে। বর্তমান পরিস্থিতি ও সামাজিক পরিমণ্ডল বুঝতে তথ্য ছাড়া

গতি নেই। রাজনীতি, অর্থনীতি সমাজ, সংস্কৃতি, খেলাধুলা প্রভৃতি যে কোনো বিষয়ে জানতে সর্বদাই তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়।

ব্যাখ্যা (Interpretation) :

গণমাধ্যম তথ্য পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা করে। একটি বিষয়কে তথ্য দিয়ে জানা যায়। তবে সঠিক ব্যাখ্যা বিষয়টিকে বুঝতে সাহায্য করে। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠার ফলে ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের আর্থিক নীতিতে যদি কোন পরিবর্তন হয় তাহলে শুধুমাত্র তথ্য দিয়ে তা বোঝা যায় না। তথ্যের সঙ্গে ব্যাখ্যা থাকলে এই নীতির গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝতে পাঠকের সুবিধা হয়। শুধুমাত্র সংবাদপত্র নয়, রেডিও, টেলিভশনও যথাসম্ভব ব্যাখ্যা সহ তথ্য সরবরাহ করার চেষ্টা করে। পরিবেশ সম্পর্কে, স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে মানুষকে সঠিক ভাবে অবহিত করার ক্ষেত্রে ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

বিনোদন (Entertainment):

গণজ্ঞাপন এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হলো বিনোদন। বর্তমানে বৈদ্যুতিন মাধ্যম বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বেশি প্রচার করে। রেডিওতে গান শুনে, নাটক শুনে মানুষের চিত্ত বিনোদন হয়। আর টেলিভিশনের প্রতি মানুষের যে দুর্নিবার আকর্ষণ তার মূলে আছে বিনোদন। সিরিয়াল, নাচ-গানের অনুষ্ঠান, চলচ্চিত্র দেখে মানুষ আনন্দ পায় উপভোগ করে। চলচ্চিত্রের প্রধান উদ্দেশ্যই হল মানুষকে বিনোদন উপহার দেওয়া। হলিউডের ছবি মূলত বিনোদনমূলক ছবি। বোম্বাইতে তৈরি হিন্দি ছবি বিনোদনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়।

ঐতিহ্যের হস্তান্তর (Transmission of heritage) :

গণজ্ঞাপন এর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হলো সামাজিক ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে পৌঁছে দেওয়া। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র তাদের নিজ নিজ উপস্থাপনা দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। যে শিল্পভাবনা সমাজ-দর্শন এবং মূল্যবোধ প্রতিফলিত হচ্ছে গণমাধ্যমের বিষয়বস্তুতে তা ঐতিহ্যের হস্তান্তর করতে সাহায্য করে।

ঐক্যমত স্থাপন (Consensus) :

তথ্য দিয়ে, গণমাধ্যম মানুষের মধ্যে ঐক্যমত স্থাপনে চেষ্টা করে। সংবাদপত্র, রেডিওতে, টেলিভিশনে বিভিন্ন মতামত, ব্যাখ্যাসহ আলোচনা পড়ে, শুনে এবং দেখে মানুষ নিজেদের মতামত তৈরী করে। যেমন পরিবেশ সচেতনতা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নারীদের অধিকার রক্ষা বিষয়ে ঐক্যমতে করতে পারে। গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা এই ঐক্যমতের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। কোন বিষয়ে ঐক্যমত স্থাপন জনমত গঠনের প্রাথমিক পর্যায় বলে অভিহিত হয়। বিভিন্ন মানুষের মতামতে ঐক্য না আসলে জনমত গঠিত হতে পারে না।

বিজ্ঞাপন (Advertisement):

আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অপরিহার্য অঙ্গ হল বিজ্ঞাপন। চাহিদা সৃষ্টি করতে, বাজার তৈরি করতে বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় গণমাধ্যমের মাধ্যমে। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন বিপুল পরিমাণ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করছে। বিজ্ঞাপনদাতারা বিজ্ঞাপন বার্তাকে মানুষের কাছে দ্রুত সফলভাবে পৌঁছে দেওয়ার

জন্য সুনিশ্চিত ভাবে মাধ্যম নির্বাচন করছে। এর জন্য তারা খরচও করছে প্রচুর। প্রকৃতপক্ষে গনমাধ্যমের অস্তিত্ব অনেকটাই নির্ভর করছে বিজ্ঞাপনের ওপরে। বিজ্ঞাপন থেকে যে আয় হয় সেটাই হল গণমাধ্যম এর প্রধান আয়। সুতরাং বিজ্ঞাপন প্রকাশ করার জন্যই সকল গণমাধ্যমে উৎসাহী। বলা যেতে পারে এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য গণমাধ্যম সর্বদাই নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করছে। কে বেশি বিজ্ঞাপন প্রচার করবে সেটাই প্রধান বিবেচ্য। বিজ্ঞাপন মানেই বাণিজ্যিক সফলতা।

উন্নয়ন (Development) :

উন্নয়নের সঙ্গে গণমাধ্যমের যোগ রয়েছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গণমাধ্যম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। উন্নয়নশীল দেশে গণমাধ্যমকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হচ্ছে। পরিকল্পনার মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হবার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এই কাজে গণজ্ঞাপন সাহায্য করতে পারে। এশিয়া আফ্রিকার বহু দেশেই গণমাধ্যমের সাহায্য নেওয়া হয়েছে উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। মানুষকে উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণোদিত করছে সংবাদপত্র, রেডিও টেলিভিশন। পরিবার পরিকল্পনা, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব মানুষকে বোঝাতে গণমাধ্যম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছে। উন্নয়নের কাজে গণমাধ্যম এর উপযোগিতা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে জ্ঞাপনবিদ্যায় একটি নতুন শাখার উদ্ভব ঘটেছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে উন্নয়ন জ্ঞাপন (development communication)।

১.৩.৩ গণজ্ঞাপনের উপাদান

১. গণজ্ঞাপন এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো যন্ত্র নির্ভরতা। এখানে জ্ঞাপন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে। সংবাদপত্র হলো একটি গণমাধ্যম। এই মাধ্যম এর জন্য প্রয়োজন ছাপাখানা যেটি সম্পূর্ণভাবে যন্ত্রনির্ভর। বেতার এবং টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র আরো অনেক বেশি যন্ত্রনির্ভর।

২. দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল বার্তার নৈর্ব্যক্তিকতা। গণজ্ঞাপনে যাদের উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠানো হচ্ছে তাদের পরিচয় জানা থাকে না, তাই বার্তার চরিত্র হয় নৈর্ব্যক্তিক। Gary Gumpert এবং Robert Catchcart বলেছেন গণজ্ঞাপন এর বার্তার লক্ষ্য হল "to whom it may concern" যাদের উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠানো হচ্ছে তারা এটা গ্রহণ করবেন এটা ভেবে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কারা শুনছেন, দেখছেন তা জানা যায় না। যাদের আগ্রহ আছে তারাই দেখবেন।

৩. প্রতিবার্তা তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায় না। চিঠিপত্রের মাধ্যমে প্রতিবার্তা পেতে সময় লাগে। বর্তমানে রেডিও এবং টিভিতে সরাসরি প্রতিবার্তা পাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু লাইন না পাবার জন্য সামান্য দেরি হচ্ছে।

৪. গণমাধ্যমের শ্রোতারা অসংগঠিত। একই বার্তা বিপুল শ্রোতা মন্ডলী পড়ছে বা দেখছে কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই। একে অন্যকে চেনে না। যেমন একই সংবাদ টেলিভিশনে বহু মানুষ দেখছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোনরকম যোগাযোগ তৈরি হচ্ছে না। এই অভিনব দিকটির কথা উল্লেখ করেছেন Herbert Blumer, তিনি বলেছেন গণমাধ্যমের শ্রোতৃ মন্ডলী কেউ পরস্পরকে চেনেনা, কিন্তু পছন্দের ব্যাপারে তাদের

মধ্যে মিল আছে। গণজ্ঞাপন প্রক্রিয়া শ্রোতৃ মন্ডলী কে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রভাবিত করতে চায়। এই প্রভাবের প্রধান উদ্দেশ্যই হলো বাণিজ্যিক সফলতা। সকল গণমাধ্যম চায় এমন বিষয় পরিবেশন করতে যাতে শ্রোতৃ মন্ডলীর মন দ্রুত জয় করতে পারে। রুপা মারডক, টেড টার্নার, ক্যারি পাকারের মত মিডিয়া মালিকদের হাতে একাধিক সংবাদপত্র, সাময়িক পর্ব বেতার ও টেলিভিশন চ্যানেল ও মিডিয়া কেন্দ্রীভূত মালিকানা মালিকানাকে আরো শক্তিশালী করেছিল। মালিকানার এ কেন্দ্র প্রবণতা গণজ্ঞাপন প্রক্রিয়াকে কেবলমাত্র বাণিজ্যিক স্বার্থে পরিচালিত করার চেষ্টা করে। এই প্রক্রিয়ার পেছনে অনেক সময় রাষ্ট্রের মদত থাকে।

১.৩.৪ সারাংশ

জ্ঞাপন গড়ে ওঠে কয়েকটি উপাদানকে আশ্রয় করে। যেমন প্রেরক, গ্রাহক, মাধ্যম ও বার্তা। গণজ্ঞাপন-এর বর্তমানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গণজ্ঞাপন-এর বেশ কিছু উপাদান আছে। গণজ্ঞাপন-এর আছে নির্দিষ্ট কিছু কাজ। এই কাজগুলি দিয়ে বোঝা যায় গণজ্ঞাপনের সামাজিক গুরুত্ব ও প্রভাব।

১.৩.৫ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. গণজ্ঞাপন এর উপাদান গুলি সংক্ষেপে লিখুন।

২. পারস্পারিক জ্ঞাপন এবং গণজ্ঞাপন এর পার্থক্য লিখুন?

বড় প্রশ্ন

১. গণজ্ঞাপন এর সংজ্ঞা দিন। গণজ্ঞাপণ গণমাধ্যমের ভূমিকা কি?

২. গণমাধ্যম এর কাজগুলি আলোচনা করুন।

১.৩.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১) Theories of Mass Communication : M. L. DeFleur S. J. Ball Rokeach

২) Mass Communication in India : Keval J. Kumar

৩) Mass Communication Theory and Practice : Uma Narula

৪) Communication Theory Today - Edited by David Cowley and Devid Michel

৫) জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম- ডক্টর বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

৬) গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি - ডক্টর বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা)

একক ৪ ◘ গণজ্ঞাপনের প্রভাব-গণজ্ঞাপন এর বিভিন্ন মাধ্যম এবং তাদের বৈশিষ্ট্য

গঠন

১.৪.১ উদ্দেশ্য

১.৪.২ গণজ্ঞাপনের প্রভাব

১.৪.৩ গণজ্ঞাপনের বিভিন্ন মাধ্যম এবং তাদের বৈশিষ্ট্য

১.৪.৪ সারাংশ

১.৪.৫ অনুশীলনী

১.৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১.৪.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ার পরে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন

- গণজ্ঞাপনের প্রভাব
- গণজ্ঞাপনের বিভিন্ন মাধ্যম এবং তাদের বৈশিষ্ট্য

১.৪.২ গণজ্ঞাপনের প্রভাব

ত্রিশের দশকের প্রথম দিকে হিটলারের বক্তৃতা শুনে জার্মানরা হতবাক হয়ে গিয়েছিল। সুভাষচন্দ্র বসুর বেতার বার্তা ভারতীয়দের নতুন আশায় উদ্দীপ্ত করেছিল। গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা বিষয়টি নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। গণমাধ্যম যে মানুষের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এই বিষয়ে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। গণমাধ্যম এর ক্ষমতার উৎস লুকিয়ে আছে এই প্রভাব তৈরীর ক্ষমতার মধ্যে। প্রভাব নির্ধারিত হয় কোন মাধ্যমের ক্ষমতা বেশি তার ওপর।

১৯৪০ সালে গণমাধ্যমের প্রভাবের বিষয়টি গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞদের চোখে পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে কাজ শুরু হয়। পল লাজারফেল্ড (Paul Lazarsfeld) এবং বার্নার্ড বেরেলশন (Bernard Berelson) মানুষের উপরে গণমাধ্যমের প্রভাব অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেন মানুষের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণমাধ্যমের প্রভাব খুবই সামান্য। তারা দেখেন মানুষের রাজনৈতিক আচরণের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব খুবই সামান্য কারণ আগে থেকেই মানুষের মনের মধ্যে যে ধারণা রয়েছে গণমাধ্যম তাকেই পরিস্ফুট করছে, বদল করতে পারছে না। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির রাজনৈতিক ধারণা যা ছিল তাই থাকছে। যদি কোন ব্যক্তি কোন রাজনৈতিক ধারনার প্রতি বিরূপ থাকে গণমাধ্যমটি ওই বিরূপতা কে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। বিষয়টিকে তারা minimal effects বলে অভিহিত করেছিলেন। তারা বলেছিলেন গণমাধ্যমের মধ্যে দিয়ে যে জ্ঞাপন হচ্ছে সেখানে আছে দুটি স্তর।

গণমাধ্যম থেকে বার্তা যাচ্ছে প্রথমে ওপিনিয়ন লিডারদের কাছে. তারপর সেখান থেকে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে। ওপিনিয়ন লিডাররা গণমাধ্যম থেকে পাওয়া বার্তাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন।

প্রভাব

বিনোদন

টেলিভিশন হলো বিনোদন মাধ্যম। টেলিভিশন দেখে মানুষ আনন্দ পায় এবং অবহিত হয়। বিভিন্ন কথায়, ছবিতে, সংগীতে বর্ণময় অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষ এই বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি :

গণমাধ্যম সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে। টেলিভিশন আসার ফলে গণমাধ্যমের প্রভাব আরও বেড়েছে। ১৯৭০ সালে একজন গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ টেলিভিশনকে ''The new parent'' বলে অভিহিত করেছিলেন। শিশুকে মানুষ করতে বাবা-মার যে ভূমিকা, টেলিভিশন তা নিয়ে নিয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মূল্যবোধের যোগ রয়েছে। বাবা-মা, আগের প্রজন্মের মানুষ জন, শিক্ষকের কাছ থেকে মানুষ মূল্যবোধের শিক্ষা পায়। এক কথায় আজ মানুষের মূল্যবোধকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে গণমাধ্যম।

চিত্র সৌজন্যে -Media Entertainment Png & Free Media Entertainment.png Transparent ... pngio.com

শিক্ষা

গণমাধ্যম এর মধ্যে দিয়ে মানুষ শিক্ষার পাঠ নেয় । যেকোনো শিক্ষার জন্যই তথ্য পাওয়া, যুক্তি-তর্ক বোঝাটা জরুরি। গণমাধ্যমের পরিবেশিত তথ্য দিয়ে মানুষ জানছে। আলোচনার মাধ্যমে আরও বেশি শিক্ষিত হয়ে উঠছে।

টেলিভিশনের সামাজিক প্রভাব

গণমাধ্যম যতবেশি আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে উঠেছে তার প্রভাব তত বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষকে নিয়েই সমাজ। গণমাধ্যম পরিবারের সবচেয়ে আধুনিক ও প্রভাবশালী মাধ্যম হলো টেলিভিশন। সাধারণ মানুষের কাছে এর বিপুল জনপ্রিয়তা। তারা সংবাদপত্র পড়ে আর্থসামাজিক পরিস্থিতিকে জানা ও বোঝার জন্য। কিন্তু টেলিভিশন দেখে আনন্দ পাবার জন্য। সিনেমা সিরিয়াল এবং নাচ-গানের অনুষ্ঠান দেখে উপভোগ করে। টেলিভিশন এর আবেদন আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে খুবই গ্রহণীয়।

দেখতে দেখতে আমরা আনন্দে মশগুল হয়ে যাই এবং দুঃখ ও হতাশায় কষ্ট পাই আবার উজ্জীবিত হই। এখানেই টেলিভিশন অনেক এগিয়ে আছে। টেলিভিশনের প্রভাব কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্শাল ম্যাকলুহান বলেছেন "medium is the message"। টেলিভিশন মাধ্যমের এটাই মূল বিশিষ্টতা।

টেলিভিশনের মাধ্যমে মানুষকে আটকে রাখা হয়েছে কনজিউমারইজম এর মধ্যে। Ben Bagdikian বলেছেন টেলিভিশন সবচেয়ে ন্যুনতম খরচে সবচেয়ে বেশি পণ্য বিক্রি করতে চায়। (T.V is designed primarily to sell the maximum amount of merchandise at minimum cost)। একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন টিভি আমাদের বেচে দিচ্ছে বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে।

১.৪.৩ গণজ্ঞাপনের বিভিন্ন মাধ্যম এবং তাদের বৈশিষ্ট্য

গণ জ্ঞাপনের মধ্যে যে মাধ্যমগুলি রয়েছে সেগুলি হল সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র এবং সাম্প্রতিকালের নিউ মিডিয়া, এদের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলেই মাধ্যমগুলির পরিচয় পাওয়া যাবে।

সংবাদপত্র : Everyman's Encyclopedia সংবাদপত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছে "Newspapers are the published sheets containing news and features of general interest, usually printed and distributed regularly." সংবাদপত্রে সংবাদ থাকবে, ফিচার থাকবে এবং মুদ্রিত সংবাদপত্রটি নিয়মিত মানুষের মধ্যে বন্টিত হবে। গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ Edwin Emery বলেছেন যে সংবাদপত্রকে শুধুমাত্র মুদ্রিত ও নিয়মিত প্রকাশিত হলেই চলবে না অর্থের বিনিময়ে তাকে ক্রয়যোগ্য হতে হবে। সামান্য অর্থের বিনিময়ে মানুষ তা কিনতে পারবে। আনন্দবাজার, টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, বর্তমান হল সংবাদপত্র যা মুদ্রিত, বন্টিত হয় অর্থের বিনিময়ে। গণমাধ্যমের মধ্যে সংবাদপত্র হল সবচেয়ে পুরনো মাধ্যম। ১৬২২ সালে লন্ডনে Nathaniel Butter প্রথম Weekly News প্রকাশ করেন। ১৬৯০ সালে আমেরিকাতে প্রকাশিত হয় Boston Public Occurence, both Foreign and Domestic. ভারতে প্রথম সংবাদপত্র বেরোয় কলকাতা থেকে ১৭৮০ সালে। James Augustas Hickey-র Bengal Gazette, ১৮১৮ সালে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বার করেন শ্রীরামপুরের মিশনারীরা। পত্রিকার নাম ছিল সমাচার দর্পণ, ভারতীয়দের উদ্যোগে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেন রাজা রামমোহন রায়, ১৮২২ সালে প্রকাশ করেন ফারসী কাগজ মীরাৎ-উল-আকবর, এর আগের বছর ১৮২১-শে প্রকাশ করেন সংবাদ কৌমুদী।

আধুনিক সংবাদপত্র দু ধরনের হয়—ব্রডশীট এবং ট্যবলয়েড। সকালবেলায় যে কাগজগুলি পাই, যেমন আনন্দবাজার, প্রতিদিন, বর্তমান, টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, এগুলি ব্রডশীট পত্রিকা। দৈর্ঘে ৫২ থেকে ৫৩ সেন্টিমিটার, প্রস্থে আট কলাম। ট্যাবলয়েড হল ব্রডশীটের অর্ধেক মাপের কাগজ। ব্রড শীটকে ভাজ করলে ট্যাবলয়েডের মাপ পাওয়া যাবে। বিদেশে

ট্যাবলয়েড খুব জনপ্রিয় কাগজ, লন্ডনের সান, ডেইলি মিরর, আমেরিকার ইউস এস এ টুডে হল ট্যাবলয়েড কাগজ। এদের প্রচার সংখ্যা অনেক বেশি।

আজও সংবাদপত্রকে মনে করা হয় গণমাধ্যম পরিবারের বিগ ব্রাদার, সাধারণ মানুষের ওপরে তার প্রভাব বিপুল। বেতার : সংবাদপত্রের পর যে মাধ্যমটি সাধারণ মানুষের কাছে বিপুলভাবে জনপ্রিয় হয়েছে তা হল বেতার। মুহূর্তের মধ্যে যে কোন বার্তাকে কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে, গণজ্ঞাপনে এমন গতি আগে কেউ কল্পনাও করেনি। বেতার আসার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে মনে করেছিলেন সংবাদপত্রের দিন শেষ। বাস্তবে অবশ্য তা হয়নি। সংবাদপত্রের বিকাশ অব্যাহতই থেকেছে। বাস্তবে যেটা ঘটেছে তা হল সংবাদপত্রের পাশাপাশি বেতারের জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

বেতার : বেতার কথা-গানের তাজমহল। এ যেন কথায় কথায় রাত হয়ে যাওয়া দিনের কাহিনী। সংবাদ, সমীক্ষা, গানবাজনা, নাটক দিনরাত হয়ে চলেছে। বেতার তরঙ্গে দিবারাত্র শব্দাশ্রয়ী বার্তা ছড়িয়ে যাচ্ছে। বেতার সেটে সাধারণ মানুষ মন দিয়ে অন্তরঙ্গভাবে সে সব শুনছে। সংবাদ পাঠ শুনে তার জানার পরিধি বাড়ছে, গান, নাটক শুনে তার চিত্তে ঢেউ তুলে যায় আনন্দ। বেতার লাইভ অনুষ্ঠানের মাধ্যম। যা এখুনি ঘটছে তা আমরা শুনতে পারি। আগে বেতারে শুধুমাত্র লাইভ অনুষ্ঠানই হত। গান বাজনা এমনকি মহালয়ার দিনে মহিষাসুরমর্দিনী। এখন সংবাদ, সমীক্ষা ছাড়া সবই রেকর্ডেড অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। বেতার আমাদের জানায়, শিক্ষিত করে এবং আনন্দ দান করে (inform, educate and enturtain)। বেতার হল মানুষের অন্তরঙ্গ মাধ্যম।

বেতার হল instant medium, এই মুহূর্তে যা ঘটেছে তা সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে জানায়। ক্রিকেট খেলার ধারা বিবরণীর জন্য শ্রোতা উন্মুখ হয়ে থাকে।

বেতার সেট খুব অল্প দামে কেনা যায়। ট্রানজিসটর সেট আসার পর খুব নাম মাত্র দামে বেতার সেট কেনা যেত। এটা একটা বিপ্লব বলা যেতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা খুব সামান্য এ্যানার্জিতে সেট চলে। মাত্র দুটো, তিনটে ব্যাটারির সাহায্যে প্রায় একমাস চলে যায়। গ্রামের একজন কৃষকও সহজে একটি সেট কিনে ব্যবহার করতে পারে।

সংবাদপত্র একজনই পড়তে পারে, কিন্তু বেতার সেট বেশ কয়েকজন মিলে শুনতে পারে। আট দশ জন মানুষ একটি সেট থেকে বেতার অনুষ্ঠান উপভোগ করে শিক্ষিত হয়, আনন্দ পায়।

বেতার সেট সহজে বহনযোগ্য। ছোট ট্রানজিসটর রেডিও হাতে নিয়ে সেখানে খুশী যাওয়া যায়। এখানে তার মিল সংবাদপত্রের সঙ্গে। মানুষ খুব সহজে বেতার সেট হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে।

খুব অল্প খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় বেতারে। জিঙ্গলস ব্যবহার করে শ্রোতাদের মনে জয় করা যায়। বেতারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বেতার মাধ্যম নিরক্ষরতার বাধা অতিক্রম করে একেবারে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। ভারতের মতো দেশে যেখানে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা বিপুল, বিদ্যুৎহীন গ্রামাঞ্চলের সীমানা অনেক বিস্তৃত এবং দারিদ্র বেশি যেখানে উন্নয়নের বার্তা বয়ে নিয়ে যেতে বেতারের গুরুত্ব অনেক বেশি। একটা ছোট ট্রানজিসটর সেট থেকে বেশ কিছু মানুষ বেতার অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারে। গ্রামীণ ভারতে বেতারের প্রভাব বেশি।

টেলিভিশন : গণমাধ্যম পরিবারে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হল টেলিভিশন। সংবাদপত্র মানুষের বৌদ্ধিক চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছিল, বেতার দূরকে নিকট করলো। আর টেলিভিশন হৃদয়ে মননে আলোড়ন তুলে মানুষের সামগ্রিক অভিজ্ঞতাটাই পাল্টে দিল। চিন্তায়, অভিজ্ঞতায় যোগ করলো নতুন মাত্রা। সাধারণ মানুষের জীবন দর্শনটাই বদলে গেল।

কোন গণমাধ্যমই এর আগে সমাজ জীবনকে এমন গভীরভাবে প্রভাবিত করেনি।

টেলিভিশনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এটি দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম। প্রবাদে আছে একটি ছবি দশ হাজার শব্দের সমান। টেলিভিশনের পর্দায় যে ছবি আসে তা চলমান। চলমান ছবি আরও বেশি বাঙ্ময়, জীবন যে রকম তাই পাওয়া যায় হাঁটার, চলায়, বলায়, দ্রভঙ্গীতে। শব্দ চলমান ছবিকে আরও অর্থপূর্ণ করে তোলে। টিভির জাদুতে আটকে পড়ে মানুষ। দেখতে দেখতে মোহিত হয়ে যায় বর্ণময় চলমান ছবিতে। টেলিভিশন মাধ্যম হিসেবে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যে মাধ্যমই হয়ে ওঠে বার্তা, মাধ্যমের জাদুতে আটকে পড়ে মানুষ। মার্শাল ম্যাকলুহান এজন্যই বলেছেন 'medium is the message, মানুষের আবেগের কাছে তার আবেদন সবচেয়ে বেশি, এটাই তার বৈশিষ্ট্যের অনন্যতা।

টেলিভিশন সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য মাধ্যম। যে কোন ঘটনাকে মানুষ সরাসরি দেখতে পায়। দেখে শুনে যে অভিজ্ঞতা পায় তার বিশ্বাসযোগ্যতা যে বেশি হবে তা বলাই বাহুল্য। একই সঙ্গে টেলিভিশন বন্ধুর মতো অন্তরঙ্গ, সিরিয়ালের, রিয়েলিটি শো-র কাণ্ডকারখানা দেখতে দেখতে টেলিভিশনের জাদুতে মুগ্ধ হয় মানুষ। দৃশ্যের ম্যাজিক তার হৃদয়ে আবেগের অনুরণন তুলে যায়। একেবারে বেড রুমে হাজির হয়েছে টেলিভিশন। বিজ্ঞাপনদাতারা তাদের বার্তা নিয়ে বেডরুমে হাজির। অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে ছুটে আসে কর্মাশিয়াল ব্রেক, শুধু বিজ্ঞাপনের জন্য। টেলিভিশনে বিজ্ঞাপনের পরিসর অনেক বড়, বিশেষ করে ভোগ্যপণ্যের বিজ্ঞাপন। পুরো মাধ্যমটাই দাঁড়িয়ে আছে বিজ্ঞাপনের ওপরে, সেই সিরিয়ালই বেশি দিন চলবে যার দর্শক টানার ক্ষমতা বেশি, বেশি দর্শক মানেই অনেক ক্রেতা, তাই বিজ্ঞাপন পাবার সম্ভাবনাও বেশি।

বেতারের মতো টেলিভিশনও অন্তরঙ্গ মাধ্যম। অনুষ্ঠান দেখার সময়, বিশেষ করে সিরিয়াল ও রিয়ালিটি শো-র ক্ষেত্রে দর্শক পর্দায় যা দেখানো হচ্ছে তার অংশীদার হয়ে ওঠে। যে বা যারা দেখছে সবাই হন টেলিভিশনের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

টেলিভিশনের সামাজিক প্রভাব বিপুল। ভোগ্যপণ্যের জন্য মানুষের যে চাহিদা দ্রুত বাড়ছে, তার অন্যতম কারণ টেলিভিশন কনটেন্ট। বর্ণময় অনুষ্ঠান এবং বিজ্ঞাপন মানুষের মনস্তত্বে গভীর প্রভাব ফেলছে। ভীষণ কল্পনাপ্রবণ ও আত্মসুখী হয়ে উঠেছে মানুষ। টেলিভিশনে যে উজ্জ্বল গ্ল্যামারের ছবি ফুটে ওঠে তাই আলোড়ন তুলে যায় সাধারণ মানুষের মনে।

বাচ্চাদের মনেও প্রভাব ফেলে টেলিভিশন। কমিক্স, ভায়োলেন্স তাদের সুকুমার মনকে চঞ্চল করে তোলে। একাগ্রতা কমে যায়। ফলে মন সংযোগে ব্যাঘাত ঘটে।

চলচ্চিত্র : গণমাধ্যমের একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হল চলচ্চিত্র বা সিনেমা। যে কোন বিষয়কে এই মাধ্যমের সাহায্যে বিশেষ আবেদনসহ প্রকাশ করা যায়। শিল্পবোধ যুক্ত হয় প্রকাশভঙ্গীতে। চলচ্চিত্রের আবেদন দেশকালের সীমা অতিক্রম করে যায়। ভাষার প্রাচীর ধুয়ে মুছে যায় ছবির ভাষার কাছে। চলচ্চিত্রই প্রথম বিশ্বায়নের প্রয়াস নিয়েছিল। হলিউডের ছবি বিশ্বের সমস্ত মানুষকে মোহিত করেছিল।

প্রথমে ছবিতে কথা ছিল না। নির্বাক চলচ্চিত্র শিল্পভাবনা প্রকাশে ছিল খুবই সফল। আইজেনসটাইন ও চ্যাপলিন নির্বাক ছবিকে শিল্পরূপ নির্মাণে কাজে লাগিয়েছিলেন। সম্পাদনা ও শব্দযোজনাকে কাজে লাগিয়ে দর্শকদের সামনে নিয়ে এসেছিলেন এক অপরূপ শিল্প নির্মাণ।

চলচ্চিত্রকে দু শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) কাহিনী চিত্র (Feature film), (২) তথ্যচিত্র (Documentary film)।

কাহিনী চিত্রের তিনটি মূল বৈশিষ্ট্য থাকে। প্রথমত ছবিতে একটি গল্প থাকবে এবং ঐ গল্পকে কেন্দ্র করে পরিচালক তার

ভাবনা ধীরে ধীরে মেলে ধরবেন। দ্বিতীয়ত ছবি তোলার কাজে ক্যামেরা, লাইটের প্রয়োজন। দরকার সাউন্ডের প্রয়োগ। তারপর ছবির সম্পাদনা একটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়, যেখানে তৈরি হয় একটা গোটা ছবি।

দ্বিতীয়ত, ছবির একটি ব্যবসায়িক দিক রয়েছে। কাহিনী চিত্র তৈরি করতে প্রচুর অর্থ লাগে। ঐ টাকা উশুল না হলে ছবি ফ্লপ করবে। কাহিনী চিত্র নির্মাণের ব্যাপারটা একটা শিল্পের মতো, ব্যবসায়িক সম্ভাবনার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয়ত, কাহিনীচিত্রের মধ্যে রয়েছে অভিনয়, মেক্-আপ, চিত্রনাট্য, সংগীত, ক্যামেরা, শিল্প নির্দেশনা ও সম্পাদনার মতন বিষয়। প্রতিটি বিষয় ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। বহু শিল্পের সার্থক সমন্বয়ে তৈরি হয় বাইসেকল বিভস্, পথের পাঁচালী, সাউন্ড অফ মিউজিক, রশোমনের মতো উল্লেখযোগ্য কাহিনী চিত্র। দেড় থেকে দু ঘন্টার মধ্যে শেষ হয়ে যায় কাহিনী চিত্র।

তথ্যচিত্র তথ্য প্রধান হয়। পরিচালক একটি বিষয়কে পরিবেশন করেন তথ্যের ওপর ভিত্তি করে। সেখানে গল্প খুব সামান্য। কিন্তু ইতিহাস অনেক। পরিচালক হাঁটেন একেবারে গবেষকের মতো। তাঁর লক্ষ্য অনুসন্ধান চালিয়ে সত্যকে তুলে ধরা। তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গী, শিল্পবোধ বিষয়টিকে নতুন তাৎপর্য দেবে। ফ্লাহার্তির নানক অফ দা নর্থ, সত্যজিৎ রায়ের রবীন্দ্রনাথ হল সত্যানুসন্ধানী তথ্য চিত্র।

তথ্য চিত্রে স্থির চিত্র ও চলমান চিত্র দুইই থাকতে পারে। তথ্য চিত্রের অনিবার্য অনুষঙ্গ হল ধারাবিবরণী। ভাষ্যকার পরিবেশিত চিত্রগুলিকে অর্থবহ করে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ, ইনার আই তথ্যচিত্রে সত্যজিৎ রায় নিজেই ধারাভাষ্য দিয়েছিলেন।

চলচ্চিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল মন্তাজ। মন্তাজের অর্থ হল একত্রীকরণ। এটা হল আক্ষরিক অর্থ। প্রকৃত অর্থে মন্তাজ ছবির গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে দৃশ্যভাবনাকে সার্থকভাবে মেলে ধরে। সৃষ্টি হয় চলচ্চিত্রের চিত্রভাষা। পরিচালক তাঁর সৃজনশীল ভাবনাকে চিত্র ভাষার মাধ্যমেই গড়ে গেলেন। চারুলতায় চারুর একাকিত্ব, অপরাজিতয় অপুর এগিয়ে চলা, মেঘে ঢাকা তারায় সীতার বেঁচে থাকার আর্তি চিত্র ভাষার মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ে মননে অনুরণন তুলে যায়।

নিউমিডিয়া : ডিজিটাল মিডিয়াই হল নিউমিডিয়া বা নতুন মাধ্যম। এখনও পর্যন্ত এই মাধ্যমটিই হল নতুন, তাই একে বলা হচ্ছে নতুন মাধ্যম। এর ভিত্তি হল কম্পিউটার প্রযুক্তি।

প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে সংখ্যা নির্ভর। শূন্য আর এক তৈরি করে বাইনারি ব্যবস্থা বা যে কোন তথ্যকে ধরে রাখতে পারে, প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে পারে। আবার ছড়িয়েও দিতে পারে।

নিউমিডিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিভিন্ন দিক। সৃজন, উপভোগ, বন্টন, রূপান্তর এবং সরক্ষণ করার সুযোগ রয়েছে। ব্লগ লিখে, টুইট করে, হোয়াটসআপে, ফেসবুকে নিজের ভাবনাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। ইউটিউব, বিভিন্ন ওয়েবসাইট, সোসাল মিডিয়া হল নিউ মিডিয়ার অথবা ডিজিটাল মিডিয়ার উদাহরণ।

নিউ মিডিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল কপি রাইটের প্রভাব খর্ব হওয়া। যদিও ইনটেলেকচুয়াল প্রপর্টি রাইটস্-এর প্রভাব কিছুটা থাকলেও নিউ মিডিয়ার দরজা অনেক প্রশস্ত। প্রকৃতপক্ষে নিউ মিডিয়া ওপেন কনটেন্ট মুভমেন্টের সূচনা করেছে। গুগল, ইয়াহুর মাধ্যমে আমরা প্রচুর ওয়েব সাইটের সন্ধান পাই।

সমস্ত গণমাধ্যমকেই ডিজিটাল মাধ্যমের সঙ্গে সমঝোতা করতে হচ্ছে। সংবাদপত্র, বেতার এবং টেলিভিশনের ওয়েবসাইট আছে। সাধারণ মানুষ ইচ্ছেমতো নেট পরিষেবার মাধ্যমে এইসব ওয়েবসাইটে ঢুকতে পারেন।

নিউমিডিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল কনভারজেন্স। একই ফর্মাটে অনেকগুলো ফর্মাট এসে মিশছে। লিখিত টেক্সট্, অডিও, ভিডিও, গ্রাফিক্স ইচ্ছেমতো নিয়ে আসা যায় কমপিউটারের পর্দায়, ল্যাপটপে, এমনকি মুঠোফোন অর্থাৎ

মোবাইলে। এর নাম কনভারজেশনস। অনেক ঝর্ণা এসে মিশছে এক জলাশয়ে। কনভারজেন্সের তুলনা নেই।

নিউ মিডিয়ার অঙ্গ সোশ্যাল সাইট নেটওয়ার্কিং গণমাধ্যমের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। ডিজিটাল যুগ মানুষের অভ্যাসটাই বদলে দিচ্ছে। বই, সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র পাঠের সময় কমছে। কারণ ফেসবুক, হোয়াট্সঅ্যাপ, টুইটার করতে গিয়ে অনেকটা সময় চলে যাচ্ছে। নিউ মিডিয়ার হাতেই রয়েছে আগামী দিনের গণমাধ্যমের ভবিষ্যৎ।

১.৪.৪ সারাংশ

গণজ্ঞাপন এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তার সামাজিক প্রভাব। মানুষের চিন্তা ও আচরণে সেই প্রভাব পরিস্ফুট হয়, যা দিয়ে গণজ্ঞাপন এর সামাজিক প্রভাব বাড়ে। বিভিন্ন গণমাধ্যম এর মধ্যে দিয়ে গণজ্ঞাপন কার্যকারী হয়ে থাকে। যেমন সংবাদপত্র, বেতার টেলিভিশন চলচ্চিত্র এবং সাম্প্রতিক কালের নিউ মিডিয়া। গণমাধ্যম এর পরিচয় জানতে গেলে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি জানা প্রয়োজন। এক একটি মাধ্যমের বৈশিষ্ট্য এক এক রকম হয়।

১.৪.৫ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. গণজ্ঞাপন এর কি কি মাধ্যম থাকে আলোচনা করুন।

২. এর মধ্যে কোনটি অমৌখিক জ্ঞাপন এর মধ্যে পড়ে?

বড় প্রশ্ন

১. গণজ্ঞাপন এর প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।

২. গণজ্ঞাপন এর বৈশিষ্ট্য গুলি আলোচনা করুন।

৩. গণমাধ্যমের বিভিন্ন মাধ্যমগুলি নিয়ে আলোচনা করুন।

৪. ডিজিটাল মাধ্যম কি গণমাধ্যমের চরিত্র পাল্টে দিচ্ছে? ব্যাখ্যা করুন।

১.৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১) Mass Communication Theory and Practice - Uma Narula

২) Communication Theory Today - Edited by David Cowley and Devid Michel

৩) গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী (অনুবাদ): মেলদিন এল কি ফ্ল্যার, সন্দ্রাবল রোকেশ (বাংলা একাডেমি ঢাকা)

৪) জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম- ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

নোটস্	নোটস্

নোটস্	নোটস্

মডিউল-২ জ্ঞাপন তত্ত্ব-১ (Communication Theory-I)

একক ১ ◻ জ্ঞাপন তত্ত্বের গুরুত্ব, দ্বি-স্তর ও বহুস্তর প্রবাহ তত্ত্ব, জ্ঞাপন পৃথক পার্থক্য তত্ত্ব

গঠন

২.১.১ উদ্দেশ্য

২.১.২ প্রস্তাবনা

২.১.৩ জ্ঞাপন তত্ত্বের গুরুত্ব

২.১.৪ দ্বি-স্তর ও বহুস্তর প্রবাহ তত্ত্ব

২.১.৫ জ্ঞাপন এ পৃথক পার্থক্য তত্ত্ব

২.১.৬ সারাংশ

২.১.৭ অনুশীলনী

২.১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

২.১.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ার পরে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন

- জ্ঞাপন তত্ত্বের গুরুত্ব
- দ্বি-স্তর ও বহুস্তর প্রবাহ তত্ত্ব
- জ্ঞাপন পৃথক পার্থক্য তত্ত্ব

২.১.২ প্রস্তাবনা

জ্ঞাপন তত্ত্বের বিচিত্র রূপ তুলে ধরা হবে এখানে। গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে আলোচনা করছেন জ্ঞাপনের কার্যধারা এবং তার প্রভাব সম্পর্কে। তাত্ত্বিক আলোচনা আমাদের সাহায্য করবে জ্ঞাপন এর প্রকৃত পরিচয় জানতে এবং বুঝতে।

২.১.৩ জ্ঞাপন তত্ত্বের গুরুত্ব

যেকোনো বিষয় জানতে গেলে তত্ত্বের আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন। তত্ত্ব আমাদের সাহায্য করে জ্ঞাপন এর চরিত্রকে বুঝতে। গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞাপনকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। Bernard Berelson এবং Leonard Berkowitz বলেছেন জ্ঞাপন হলো প্রতীকের সাহায্যে তথ্য, আবেগ, ভাবনা ও দক্ষতার প্রেরণ। (Communication is transmission of information– ideas– emotions and skills etc. by symbols)।

Den. F. Faules এবং Denis. C Alexander জ্ঞাপন কে প্রতিকী আচরণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাদের মূল বক্তব্য হলো জ্ঞাপন ক্রিয়া সর্বদাই প্রতীকের সাহায্য সংগঠিত হয়। প্রেরক ও গ্রাহক দু'জনকেই দুজনের অর্থ বুঝতে হবে, এটা সম্ভব হলেই বুঝতে হবে জ্ঞাপন সফল হচ্ছে।

John C Merril এবং Ralph L Lowenstein বলেছেন জ্ঞাপন হলো দ্বিমুখী রাস্তা। প্রেরক পাঠাচ্ছে এবং গ্রাহক তা গ্রহণ করছে। বার্তা দুই রাস্তা ধরেই চলাফেরা করছে।

গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ Colin Cherry বলেছেন জ্ঞাপন হলো উদ্দীপনা প্রেরণ ও প্রতুত্তর তৈরীর প্রক্রিয়া। (transmission of stimuli and the evocation of response)। শুধুমাত্র বার্তা বিনিময় দিয়ে জ্ঞাপন হয় না। বার্তা গ্রাহকের কাছে যাচ্ছে তা অবশ্যই উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে। উদ্দীপিত হলেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে, তৈরি হবে প্রতুত্তর। আসলে Colin Cherry যেটা বলতে চেয়েছেন তা হলো "উদ্দীপনা ও প্রত্যুত্তর" এর মধ্যে যে মানবিক উপাদান রয়েছে সেটাই জ্ঞাপনকে সার্থক করে তোলে।

জ্ঞাপন এর চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে George Gerbner বলেছেন জ্ঞাপন হলো বার্তার মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন। (Communication is social interaction through messages)। বার্তা বিনিময় হয় প্রতীকের মাধ্যমে। এই প্রতীক সর্বদাই অর্থবহ। প্রেরক যে প্রতীক ব্যবহার করেছেন গ্রহীতা সেই প্রতীকের অর্থ বুঝে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করছেন। এভাবেই বার্তার আদান-প্রদান ঘটছে এবং তা অর্থবহ হয়ে উঠছে। সমাজে সর্বদাই এরকম অসংখ্য আদান-প্রদান ঘটছে এবং তার মধ্যে দিয়ে ঘটছে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া। মানুষ, প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, সরকার বার্তার আদান-প্রদান এর মধ্যে দিয়ে সামাজিক আন্তঃসম্পর্ক নির্মাণ করছে।

বিংশ শতকের বিখ্যাত গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ হলেন Wilbur Schramm, উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। জ্ঞাপন-এর ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন আমরা যখন কাউকে কিছু জ্ঞাপন করি তখন তার সঙ্গে তথ্য, ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করে নিতে চেষ্টা করি। দুজনের মধ্যে তৈরি হয় একটা সম্পর্ক যাকে Schramm বলেছেন Commonness, বাংলায় একে বলা যেতে পারে সাধারণ গ্রাহ্যতা। Schramm বলেন "When we communicate, we are trying to establish a commonness with someone, That is we are trying to share information, an idea or attitude". জ্ঞাপন এর ধারণার মূল সুরটি এখানে পাওয়া যায়। যে-কোনো বিষয়কে সমানভাবে ভাগ করতে পারলে জ্ঞাপন সার্থক হয়ে ওঠে।

দেখা যাচ্ছে জ্ঞাপনে বার্তা বিনিময় একটি অনিবার্য ঘটনা। বার্তা বিনিময় তখনই সফল হবে যখন বার্তার অর্থ উদ্ধার করা যাবে। কার কাছে কোন বার্তা কিভাবে পৌছবে তার ওপর জ্ঞাপন এর সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। প্রাথমিকভাবে বার্তার অর্থকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি হলো সাধারণ অর্থসূচক (denotative) এবং অপরটি হলো গুণবাচক (Connotative)। অনেক সময়ই দেখা যায় একটি শব্দ দুটি অর্থ প্রকাশ করে। একটি অর্থ সাধারণভাবে সবাই যেটা বোঝে। অন্যটি একেক জন একেক রকম ভাবে বোঝে। প্রথমটি সাধারণ অর্থসূচক, দ্বিতীয়টি গুণবাচক। যেমন ধনী শব্দটি শোনা মাত্র সকলে বোঝে সম্পদশালী। যার সম্পত্তি আছে টাকা আছে। কিন্তু গুণবাচক অর্থে একেক জন একেক রকম বুঝবেন। যেমন একজন ভিখারির কাছে নিম্নআয়ের মানুষও ধনী, মধ্যবিত্তের

কাছে কোটিপতি হলো ধনী। আবার কোটিপতির কাছে হাজার কোটির শিল্পপতি ধনী বলে বিবেচিত হতে পারে। একটি শব্দের অর্থ ভিন্ন হতে পারে পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী, আবার সংস্কৃতিক পরিমণ্ডলর অনুযায়ী শব্দের অর্থ ভিন্ন হয়।

জ্ঞাপন বুঝতে গেলে তাত্ত্বিক রূপরেখা জানা অত্যন্ত জরুরী। বিভিন্ন তাত্ত্বিকরা তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞাপন চরিত্রকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। এইসব তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ এর মধ্য দিয়ে আমরা জ্ঞাপনকে বোঝার চেষ্টা করি। প্রত্যেকটি পর্যবেক্ষণের মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে। বুঝতে পারলে জ্ঞাপন ধারণাকে বোঝা অনেক সহজ হয়।

২.১.৪ দ্বি-স্তর ও বহুস্তর প্রবাহ তত্ত্ব (Two step flow theory and the multistep flow theory)

দ্বি-স্তর প্রবাহ তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছিল ১৯৪০ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্র একেবারে পাল্টে শুরু হয় দ্বিমেরু রাজনীতি অথবা বাইপোলার পলিটিক্স। আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমী দেশগুলির জোট বাঁধে। রাশিয়া নেতৃত্বেই পূর্ব ইউরোপের দেশ গুলি নিয়ে তৈরি হয় সমাজতান্ত্রিক শিবির। শুরু হয় ঠান্ডা যুদ্ধ। যার ভিত্তি হলো মতাদর্শের লড়াই। সাম্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরোধ গোটা দেশের রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই জটিল অবস্থায় গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা জনগণের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব ও গভীরভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। মানুষের জনমত বোঝার জন্য Paul Lazarsfeld– Bernerd Berelson এবং Hazel Gaudet গবেষণা শুরু করেন। এই প্রচেষ্টার ফলেই তৈরি হয় দ্বি-স্তর প্রবাহ তত্ত্ব (Two step flow theory)। Elihu Katz এর সঙ্গে যৌথ গবেষণায় গণমাধ্যমের প্রভাব কে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। বুলেট তত্ত্ব কে অস্বীকার করে তৈরি করেন দ্বি-স্তর তত্ত্ব। বুলেট তত্ত্বের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যা মিডিয়া বলবে তাই মানুষের মনে বুলেটের মতো গেঁথে যাবে। Lazarsfeld রা দেখলেন গণমাধ্যমের বার্তা সরাসরি বুলেটের মতো জনগণের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। গণমাধ্যমের বার্তা প্রথমে যাচ্ছে ওপিনিয়ন লিডারদের কাছে। তারপর তা যাচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে অর্থাৎ গণমাধ্যমের বার্তা দুটি স্তর পেরিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে যাচ্ছে ওপিনিয়ন লিডারদের কাছে। যেমন শিক্ষক ডাক্তার উকিলরা গণমাধ্যমের বার্তাকে ব্যাখ্যা করছেন সাধারণ মানুষের কাছে। এই ব্যাখ্যার যথেষ্ট প্রভাব পড়ছে সাধারণ মানুষের উপরে। নির্বাচনের সময় বিষয়টি আরও ভালোভাবে বোঝা যায়। ওপিনিয়ন লিডাররা সাধারণ ভোটারদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেন। এখানে সাধারণ জনগণ Passive হয়ে যায়। ওপিনিয়ন লিডাররা যা বলেন তার দ্বারা প্রভাবিত হন। তবে এই বিষয়টি কিন্তু সমালোচনার উর্ধে নয়।

Deutschman G Danielson বলেছেন যে দ্বি-স্তর তত্ত্ব কিন্তু শেষ কথা হতে পারে না। প্রাথমিক পর্যায়ে তার কিছুটা গুরুত্ব থাকলেও মানুষের আচরণকে পুরোপুরি প্রভাবিত করতে পারে না। সবসময়ই গণমাধ্যম-এর তথ্য ওপিনিয়ন লিডারদের মারফত হয় না। অনেক সময় সরাসরিও পৌঁছে যায়।

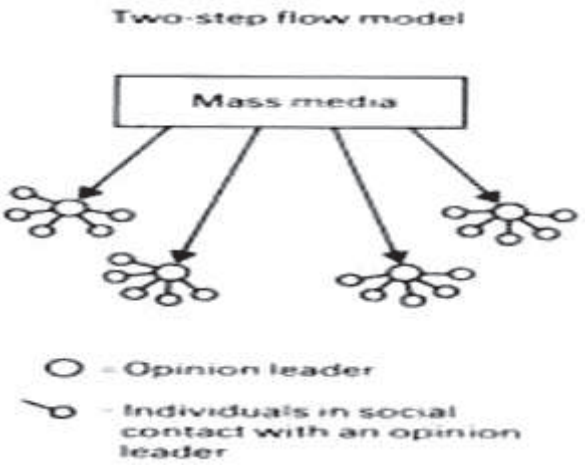

বহু স্তর প্রবাহ তত্ত্ব (Multi-Step Flow Theory)

দ্বি-স্তর প্রবাহ তত্ত্বের উন্নত রূপ হলো বহুস্তর প্রবাহ তত্ত্ব। গণমাধ্যমের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে ওপিনিয়ন লিডারদের মাধ্যমে। দ্বিস্তরের এই রূপটি বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে যখন ওপিনিয়ন লিডাররা সমাজের বিভিন্ন প্রভাব এর অধীনে কাজ করে। রাজনৈতিক দল, ব্যবসায়িক গোষ্ঠী, সমাজ সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল, প্রযুক্তি গভীর প্রভাব ফেলে ওপিনিয়ন লিডারদের ওপরে। যে কোনো বার্তা পরস্পরবিরোধী মতামতের মধ্যে দিয়ে পথ করে নেয়। বার্তার রূপান্তর প্রতিনিয়ত ঘটতে থাকে। ওপিনিয়ন লিডাররা যাদের কাছে গণমাধ্যমের বার্তাকে ব্যাখ্যা করবেন তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, প্রতিক্রিয়াও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। ওপিনিয়ন লিডারদের সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া ও মনস্তত্ত্বকে বিবেচনা করে এগোতে হয়। এভাবেই আসে বহুস্তর, বহু বিন্যাস যাকে বলা হচ্ছে বহুস্তর প্রবাহ তত্ত্ব।

২.১.৫ জ্ঞাপন-এ পৃথক পার্থক্য তত্ত্ব (Individual Difference Theory)

গণমাধ্যম এর বার্তা একভাবে পৌঁছয় না। একেক জন মানুষ একেক ভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। প্রত্যেক মানুষের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন। ব্যক্তির মানসিক গঠন, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি এই প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। গণমাধ্যমের

সঙ্গে ব্যক্তির স্বতন্ত্র আন্তঃসম্পর্ককেই পৃথক পার্থক্য তত্ত্ব বা Individual Difference Theory বলে অভিহিত করা হয়।

সাধারণ মানুষ যে গণমাধ্যমের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিক্রিয়া জানায় তার অন্যতম কারণ হলো তার নিজের প্রয়োজন। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় টেলিভিশনে একজন দর্শক তার রুচি পছন্দ অনুযায়ী অনুষ্ঠান দেখবে। তার যদি সিরিয়াল দেখতে পছন্দ হয় সে সিরিয়াল দেখবে। খেলার অনুষ্ঠান দেখতে পছন্দ হলে সে সেটাই দেখবে। কেউ বেছে নিতে পারে সংবাদ-ধর্মী অনুষ্ঠান। এই পৃথক তত্ত্ব বেশি গুরুত্ব দেয় ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক চাহিদার উপরে।

মানুষ গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে নিজের প্রয়োজনে। তার নিজের চাহিদা অনুযায়ী গণমাধ্যম এর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করার মতো ,একই তথ্যকে মানুষ কিন্তু ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করতে পারে। যেমন একটি রাজনৈতিক সংবাদকে বিভিন্ন মানুষ তাদের দৃষ্টিকোণ থেকেই বিভিন্ন ভাবে দেখতে পারে। এর প্রধান কারণ হলো মানুষের মস্তিষ্ক ফাঁকা নয় আগে থাকতেই তার মাথায় কিছু ধারণা, মতামত ও মূল্যবোধ থাকে। সেগুলো দিয়েই সে একটি তথ্যকে গ্রহণ করে। আবার গ্রহণ নাও করতে পারে।

এখানেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে সিলেক্টিভ এক্সপোজার থিওরি (Selective Exposure Theory), যা বলে, মানুষের মধ্যে যে বিশ্বাস মতামত ও ধারণা থাকে তা দিয়েই নির্বাচন করে কোন বিষয়টি সে গ্রহণ করবে আর কোনটি গ্রহণ করবে না। মানুষ শুধু নিজের পছন্দের বিষয়টি গ্রহণ করে না বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত দৃষ্টিভঙ্গিও কেও সে বিচার করে। তার মতামত মূল্যবোধ সাংস্কৃতিক চেতনার কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেয় বিষয়টিকে সে কিভাবে গ্রহণ করবে। গণমাধ্যম কিছু বললেই সে গ্রহণ করে না। নিজের বিচার বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে নেয়। প্রয়োজন হলে নাও গ্রহণ করতে পারে।

২.১.৬ সারাংশ

জ্ঞাপন তত্ত্বের গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে। তত্ত্বের উল্লেখযোগ্য দিকগুলির ওপর উদাহরণ সহযোগে আলোকপাত করা হয়েছে। যেকোনো বিষয়ের মতো জ্ঞাপন তত্ত্বের রূপরেখা সম্পর্কে বিশদ জানা থাকলে জ্ঞাপন এর চরিত্র ভালোভাবে বোঝা যাবে। তাত্ত্বিক দিকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দ্বিস্তর প্রবাহ ও বহুস্তর প্রবাহ তত্ত্ব, পৃথক পার্থক্য তত্ত্ব অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স থিওরি।

২.১.৭ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জ্ঞান তত্ত্বের গুরুত্ব কি?

২. দ্বি-স্তর প্রবাহ তত্ত্ব কি?

বড় প্রশ্ন

১. জ্ঞাপন তত্ত্বের গুরুত্ব বিষয়ে উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

২. বহুস্তর প্রবাহ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৩. জ্ঞাপনের পৃথক দৃষ্টি পার্থক্য তত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করুন।

২.১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১) Mass Communication Theory and Practice- Uma Narula

২) Communication Theory Today - Edited by David Cowley and Devid Michel

৩) গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী (অনুবাদ) : মেলদিন এল কি ফ্ল্যার, সন্দ্রাবল বকানো (বাংলা একাডেমি ঢাকা)

৪) জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম- ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা)

৫) গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি - ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য। (লিপিকা)

একক - ২ ◘ বিষয় নির্বাচন ও দ্বার-রক্ষার তত্ত্ব, উদ্ভাবন মিথস্ক্রিয়া তত্ত্ব, ব্যক্তি প্রভাব তত্ত্ব

গঠন

২.২.১ উদ্দেশ্য

২.২.২ বিষয় নির্বাচন ও দ্বার-রক্ষার তত্ত্ব

২.২.৩ উদ্ভাবন মিথস্ক্রিয়া তত্ত্ব

২.২.৪ ব্যক্তি প্রভাব তথ্য

২.২.৫ সারাংশ

২.২.৬ অনুশীলনী

২.২.৭ গ্রন্থপঞ্জি

২.২.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ার পরে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন

- বিষয় নির্বাচন ও দ্বার-রক্ষার তত্ত্ব
- উদ্ভাবন মিথস্ক্রিয়া তত্ত্ব
- ব্যক্তি প্রভাব তত্ত্ব

২.২.২ বিষয় নির্বাচন ও দ্বার রক্ষার তত্ত্ব

গণমাধ্যম চর্চায় দ্বার-রক্ষার তত্ত্ব (Gate Keeping) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এত গুরুত্বপূর্ণ যে তার জন্য তৈরি হয়েছে এক তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত, যুক্তিসিদ্ধ তথ্য প্রয়োগে প্রমাণ করতে হয়েছে তার গুরুত্ব। বর্তমানে যে কোন গণমাধ্যমে দ্বার-রক্ষার বিষয়টি ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

গণমাধ্যম এর বিষয় নির্বাচন হলো দ্বার রক্ষার কাজ। গণমাধ্যমের পরিচালন স্তরে এমন কিছু মানুষ থাকেন যারা ঠিক করেন কি পরিবেশিত হবে। বিষয় নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা হলেন দ্বাররক্ষী (Gate Keepers)। প্রতিটি গণমাধ্যমেই যেমন সংবাদপত্র, বেতার-টেলিভিশনে, পেশাদার ব্যক্তিরাই দ্বাররক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকেন। তারা ঠিক করেন বিষয়বস্তুর বিপুল প্রবাহ থেকে কোন বিষয়গুলি গণমাধ্যমে পরিবেশিত হবে। বিষয় নির্বাচনে দ্বার-রক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

গণমাধ্যম পরিবেশনার জন্য প্রচুর সংবাদ নানা প্রান্ত থেকে এসে নিউজডেস্কে পৌঁছায়। এত সংবাদকে কোন অবস্থাতেই পুরোপুরি জায়গা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই প্রশ্ন উঠে নির্বাচনের। অভিজ্ঞ সাংবাদিকরা ঠিক করেন কোন কোন সংবাদ জায়গা করে নেবে পরিবেশনের জন্য। খবরের কাগজ বেতার-টেলিভিশনে প্রতিটি মাধ্যমেই সংবাদ

নির্বাচনের প্রয়োজন হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় দ্বার-রক্ষা। আর যারা নির্বাচন করেন তারা হলেন দ্বাররক্ষী।

কুর্ট লিউইনের (Kurt Lewin) গবেষণার মধ্যে নিহিত আছে দ্বার রক্ষার ধারণাটি। লিউইন ছিলেন একজন সমাজ মনস্তাত্ত্বিদ। ১৯৪৭ সালের আয়াওয়া শহরের গৃহকর্তীদের খাদ্য সামগ্রী কেনার বিষয় নিয়ে গবেষণা চালিয়েছিলেন। বাজারে পরিবারের গিন্নি গেছেন জিনিস কিনতে। কী কিনবেন তিনি? লেউইনের পর্যবেক্ষণ বলছে তিনি একটি নির্দিষ্ট নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবেন। খাদ্যজ সামগ্রী কেনার সময় গিন্নি বিভিন্ন বিষয়ে খতিয়ে দেখেন। ভেবে দেখেন কী কিনলে পরিবারের সদস্যদের পছন্দ হবে, স্বাদের পক্ষে উপকারী হবে ইত্যাদি। বিভিন্ন তথ্য যুক্ত থাকে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে। তথ্য বিশ্লেষণ করে ঠিক হয় কী কেনা হবে আর কী কেনা হবে না। যে পর্যায়ে এই নির্বাচনের কাজটি হয় লেউইন তাকে দ্বার-অঞ্চল বলে বর্ণনা করেছেন। লেউইনের এই গবেষণা পরবর্তীকালে গণমাধ্যম চর্চাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে।

১৯৫০ সালে ডেভিড মেনিং হোয়াইট (David Manning White) গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান কীভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে তা আলোচনা করেন। সাংবাদিকতার অধ্যাপক হোয়াইট আঞ্চলিক কাগজের সম্পাদকের সংবাদ নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর গবেষণা চালান। তিনি দেখেন সম্পাদকের টেবিলে বিশাল সংবাদ প্রবাহ এসে জমা হচ্ছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে সংবাদ আসছে, নিজস্ব সংবাদদাতা, সরকারি প্রেস রিলিজ, সংবাদ-সংস্থার পাঠানো কপি। সিটি এডিটররা এই বিপুল সংবাদ প্রবাহ থেকে অল্প কিছু বেছে নিচ্ছেন। আর বেশির ভাগটাই ফেলে দিচ্ছেন। হোয়াইট চেনা কিছু আঞ্চলিক কাগজের সংবাদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করে দেখলেন সম্পাদকরা সেই সমস্ত সংবাদই বেছে নিচ্ছেন যেগুলি কাগজের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। পাঠকের চাহিদা ও সম্পাদকের পছন্দ কে কেন্দ্র করেই তৈরি হয় এই প্রয়োজন। তিনি দেখলেন সম্পাদকের বিচারে মানবিক আগ্রহমূলক সংবাদি বেশি। হোয়াইট সম্পাদকদের "মিস্টার গেট" বলে অভিহিত করেছিলেন। সম্পাদকরা তাকে এক বাক্যে জানিয়েছিলেন "We, go for human interest stories in a big way". হোয়াইট জানিয়েছেন তার এই গবেষণায় লিউইনের গবেষণা সাহায্য করেছিল।

সুইডার(Suider) নামের এক গবেষক ১৯৬৭ সালে একই বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন বিষয়টি আগের মতই আছে অর্থাৎ সম্পাদকরা পাঠকদের রুচি পছন্দ ও কাগজের নীতির দ্বারাই প্রভাবিত হচ্ছেন। এরপরে গবেষকরা সংবাদ নির্বাচনে শুধুমাত্র সম্পাদকের ভূমিকার মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেননি। স্যাম্পলিং পদ্ধতি ব্যবহার করে দ্বার-রক্ষার কাজে আরো বহু ব্যক্তিকে যুক্ত করেছেন। যেমন নির্বাহী সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, বিভাগীয় সম্পাদক প্রভৃতি নির্বাচকরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে সংবাদ নির্বাচন প্রক্রিয়া হল এক দলীয় কার্যক্রম।

শুমেকার এবং রিজ (Shoemaker and Reise) বলেছেন দ্বার-রক্ষার কাজ কতগুলি নির্দিষ্ট বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাদের বক্তব্য হলো পাঠকদের চাহিদা ও বিচারকদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে গড়ে ওঠা সহমত দ্বার-রক্ষার কাজ কে পরিচালিত করে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল কে তারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন। নির্বাচকরা যে সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে গড়ে ওঠেন তার প্রভাব তাদের সিদ্ধান্তের ওপর পড়ে।

Shoemaker এবং Reise দ্বার-রক্ষার তত্ত্বে মূল্যবোধকে যুক্ত করেছেন। পাঠকদের চাহিদা, পছন্দের সঙ্গেও মূল্যবোধের যোগ রয়েছে। যে সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে পাঠকরা গড়ে ওঠেন তার প্রভাব তাদের

চাহিদার ওপরেও পড়ে। নির্বাচকরা সবসময়ই চাইবেন পাঠকদের চাহিদা মাফিক চলতে। অর্থাৎ পাঠকদের রুচি, পছন্দ, মূল্যবোধকে বিবেচনা করে তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ভারতের পাঠকদের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাঠকের চাহিদা অবশ্যই আলাদা হবে।

গালটাঙ এবং রুজ (Galtung and Ruge) দ্বার-রক্ষা নিয়ে গবেষণা চালাতে গিয়ে দেখেছেন সাংগঠনিক ও আবেগগত বিষয়ক সংবাদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। নরওয়ের সংবাদপত্রে বিদেশি সংবাদ কীভাবে নির্বাচিত হয় তা অনুসন্ধান করার সময় এই দুই গবেষক লক্ষ্য করেন নির্বাচকরা সংবাদমূল্য দিয়েই সংবাদ বাছছেন। যে সংবাদ মূল্য নির্বাচকদের নিজস্ব পছন্দের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ সেই সংবাদকে তারা গ্রহণ করেন। সাংগঠনিক নীতি ও আদর্শগত অবস্থান নির্বাচকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণ হিসেবে তারা পশ্চিমী কাগজে, পশ্চিমী মূল্যবোধের কথা উল্লেখ করেছেন।

ফিসম্যান (Fishman) বলেছেন সংবাদ এর মধ্যে যে বাস্তবতা রয়েছে তা নির্বাচকদের বাস্তব আন্তরিকতার সঙ্গে কতটা খাপ খাচ্ছে সেটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদমাধ্যমের কাছে যে সংবাদ আসছে, নির্বাচকদের ওপরে কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে সেটা খতিয়ে দেখা দরকার। Fishman এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো নির্বাচকদের চাহিদা, অপছন্দ সংবাদ নির্বাচনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। প্রয়োজন হলে সংবাদমাধ্যম উদ্যোগ নিয়ে সংবাদ তৈরি করতেও এগিয়ে আসে (at times it also has to be internally manufactured or constructed)।

সংবাদ নির্বাচনের সময় যে বিষয়গুলি সাধারণভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, সেগুলি হল মানুষ (people), স্থান (Place) এবং সময় (time)।

২.২.৩ উদ্ভাবন মিথস্ক্রিয়া তত্ত্ব (Diffusion of Innovation Theory)

গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ জর্জ গার্বনার (George Gerbner) জ্ঞাপন কে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বলে বর্ণনা করেছেন। সামাজিক আন্তঃসম্পর্ক বিন্যাস-এর উৎস হল জ্ঞাপন। পারস্পারিক, দলগত এবং গণজ্ঞাপন প্রভৃতি সকল কাজের মধ্যে সর্বদাই সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ঘটে চলেছে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে জ্ঞাপন এর মধ্যে দিয়ে। দলগত পর্যায়ে সম্পর্কের বিন্যাস ঘটছে জ্ঞাপন এর ওপর নির্ভর করে। এমনকি যন্ত্রনির্ভর গণজ্ঞাপন এর সামাজিক আন্তঃসম্পর্ক নির্ধারণ ঘটেই চলেছে। তৈরি হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কের নতুন আধার। ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নতুন নতুন রূপ ধারণ করছে।

সামাজিক সম্পর্কের কেন্দ্রে জ্ঞাপন এর অবস্থান। অ্যারিস্টটল বলেছেন মানুষ প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী সামাজিক জীব। মানুষ একা থাকতে পারে না। পাশের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে চায়। এই সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে জ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে। নিজের কথা মানুষ জানাতে চায় অন্যকে। আবার অন্যের কথাও জানতে চায়। প্রত্যেকেই চাইছে একে অন্যের ভাবনার অংশীদার হতে। সহমর্মী হয়ে ওঠার জন্য চেষ্টা করছে। এর ফলে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে তৈরি হচ্ছে এক সমজাতীয় মনোভাব। তৈরি হচ্ছে সামাজিক সম্পর্ক। মানুষ এভাবে একটা কমন আইডেন্টিটি খুঁজতে চাইছে।

Gerbner বলেছেন জ্ঞাপন ক্রিয়ার অন্যতম উপাদান হল বার্তা। এই বার্তাই ঠিক করে দেয় জ্ঞাপনের গতি, জ্ঞাপন এর বিষয়বস্তু বা তার মধ্যে যা যা থাকে সব কিছুই। প্রেরক গ্রাহকের কাছে বার্তা পাঠায়। এটি একটি জ্ঞাপন। বার্তা তৈরি করেন প্রেরক। বার্তার বিষয় ঠিক করার সময় বহু বিষয় বিবেচনার মধ্যে রাখতে হয়। গ্রাহক কেমন তা জানা দরকার। ঠিক তেমনি বার্তার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে তারও একটা আন্দাজ থাকা দরকার।

বার্তা হলো কিছু প্রতীকের সমষ্টি। মুখের কথা, লেখার ভাষা, টিভির ছবি সব নির্মিত হয় প্রতীকের সমন্বয়ে। প্রেরক ও গ্রাহক দুজনেই এই প্রতীকের অর্থ বোঝেন। পারস্পারিক এই বোঝাপড়া মিথষ্ক্রিয়া ঘটায়। এক বিশেষ সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে এই মিথস্ক্রিয়া ঘটে।

প্রত্যেক জ্ঞাপন এর নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রেরক জ্ঞাপনের মাধ্যমে গ্রাহকের কাছে পৌঁছতে চায়। পৌঁছতে পারলে তৈরি হবে প্রতিক্রিয়া। যার ওপর ভিত্তি করে পাওয়া যাবে প্রতিবার্তা। সেটা কেমন হবে তার একটা আন্দাজ থাকবে প্রেরকের কাছে। সেটা বুঝেই তিনি বার্তা তৈরি করবেন। এইভাবে চক্রাকারে জ্ঞাপন ক্রিয়া চলে। বার্তা যেমন ছুটে যায় প্রেরক থেকে গ্রাহকের কাছে ঠিক তেমনই প্রতিবার্তা ছুটে আসে গ্রাহক থেকে প্রেরকের কাছে। তাই জ্ঞাপন কে বলা হয় দ্বিমুখী রাস্তা।

দুটি পথ দিয়ে জ্ঞাপন ক্রিয়া চলে। গায়ক গাইছেন, শ্রোতা শুনছেন, শ্রোতার প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করছেন গায়ক। এভাবেই গায়ক এর সঙ্গে শ্রোতার মিথষ্ক্রিয়া ঘটছে।

Gerbner যে মডেল দিয়েছেন তাতে উৎস, মাধ্যম, প্রেক্ষাপট, বিষয়বস্তু ও জ্ঞানের পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন। যেকোনো জ্ঞাপনেই প্রতিক্রিয়া তৈরি হবে। Gerbner এই প্রতিক্রিয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রতিক্রিয়াই পারস্পরিক বোঝাপড়ার বাতাবরণ তৈরি করে। প্রতিদিন সমাজে বিভিন্ন জ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে সর্বক্ষণই তথ্যের আদান প্রদান বোঝাপড়া হয়ে চলেছে। আর তার মধ্যেই নিহিত আছে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া। যাকে জ্ঞাপনবিদরা বলেছেন উদ্ভাবন মিথস্ক্রিয়া তত্ত্ব।

২.২.৪ ব্যক্তি প্রভাব তথ্য (Personal Influence Theory)

গণমাধ্যম-এর পরিবেশিত বিষয়ের প্রতি সব মানুষ একই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে না। একজন এককভাবে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। খুনের ঘটনার সংবাদে কেউ আঁতকে ওঠে, কেউ খুনের শাস্তির দাবি করে, কেউ আবার মৃত্যদণ্ড চায়। আবার কেউ শাস্তি চায়, তবে তা কখনোই মৃত্যুদণ্ড নয়। এখানেই তৈরি হয় পার্থক্য, তত্ত্বের রূপ রেখার পার্থক্য। বসন্ত এসেছে, গাছে পলাশ চারিদিক রঙে রঙে ভরে উঠেছে, কেউ বলছে স্বাগত বসন্ত, আবার কেউ ভয় পাচ্ছে বসন্তের পরিণামে যে কোনো সময় ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে।

২.২.৫ সারাংশ

এই পর্যায়ে যে তাত্ত্বিক রূপরেখাগুলি আলোচিত হয়েছে তারমধ্যে উল্ল্যেখযোগ্য হল ঃ দ্বার-রক্ষার, তত্ত্ব উদ্ভাবন ও মিথস্ক্রিয়া তত্ত্ব এবং ব্যক্তি প্রভাব তত্ত্ব। প্রতিটি তত্ত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক প্রেক্ষিত। জ্ঞাপন এর সঙ্গে সমাজে যোগাযোগের মাত্রাগুলি অনুধাবন করা যাবে এই তাত্ত্বিক আলোচনা থেকে।

২.২.৬ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. দ্বার-রক্ষার তত্ত্ব কী?

২. উদ্ভাবন মিথস্ক্রিয়া কী?

বড় প্রশ্ন

১. নির্বাচন এবং দ্বার রক্ষার তত্ত্ব উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

২. উদ্ভাবনী মিথস্ক্রিয়া তত্ত্ব বিশদে ব্যাখ্যা করুন।

২.২.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১) Mass Communication Theory and Practice: Uma Narula

২) Communication Theory Today : Edited by David Cowley and Devid Michel

৩) গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী (অনুবাদ): মেলদিন এল কি ফ্ল্যার, সন্দ্রাবল রোকেশ (বাংলা একাডেমি ঢাকা)

৪) জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম- ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা)

৫) গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি - ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা)

৬) আধুনিক গণমাধ্যম : ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা)

একক ৩ ◘ বিভিন্ন তত্ত্ব : কর্তৃত্ববাদী, উদারবাদী, সাম্যবাদী গণমাধ্যম, সামাজিক দায়বদ্ধতা

গঠন

২.৩.১ উদ্দেশ্য

২.৩.২ কর্তৃত্ববাদী তত্ত্ব

২.৩.৩ উদারনীতিক তত্ত্ব

২.৩.৪ সাম্যবাদী গণমাধ্যম তত্ত্ব

২.৩.৫ সামাজিক দায়বদ্ধতা তত্ত্ব

২.৩.৬ সারাংশ

২.৩.৭ অনুশীলনী

২.৩.৮ গ্রন্থপঞ্জি

২.৩.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ার পরে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন

- কর্তৃত্ববাদী তত্ত্ব (Authoritarian Theory)
- উদারনীতিক তত্ত্ব (Libertarian Theory)
- সাম্যবাদী গণমাধ্যম তত্ত্ব (Communist Media Theory)
- সামাজিক দায়বদ্ধতা তত্ত্ব (Social Responsibility Theory)

২.৩.২ কর্তৃত্ববাদী তত্ত্ব (Anthoritarian Theory)

সংবাদপত্র কীভাবে কাজ করবে তা নির্ভর করে দেশের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপরে। শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে রাজনৈতিক দর্শনের উপর ভিত্তি করে। ইউরোপের বহু দেশেই একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কর্তৃত্ববাদী দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। কর্তৃত্ববাদীরা মনে করতেন দেশের ভালো-মন্দ একজন একনায়কের হাতে ন্যস্ত থাকবে। এবং এক অর্থে সেই এগিয়ে নিয়ে যাবে দেশকে, কোনরকম বিরোধিতা ও সমালোচনার জায়গা থাকবে না। সংবাদপত্রকেও এই কর্তৃত্ব মেনে চলতে হবে। হিটলার ও মুসোলিনির আমলে যথাক্রমে জার্মানি ও ইতালিতে কর্তৃত্ববাদী ধারণার বিকাশ হয়েছিল, স্পেনে ফ্রাঙ্কোর আমলেও কর্তৃত্ববাদীদের ধারণার ওপর ভিত্তি করে শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এই ব্যবস্থায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকে না, শাসনক্ষমতার কোনরূপ সমালোচনার সুযোগ এখানে নেই। একনায়ক এর কর্তৃত্বকে সমর্থন করাই গণমাধ্যমের একমাত্র কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

২.৩.৩ উদারনীতিক তত্ত্ব (Libertarian Theory)

গণতন্ত্রের কথা ধ্বনিত হয় উদারনৈতিক তত্ত্বে। সংবাদপত্র স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। শাসক-বিরোধী ও সমালোচনাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিরোধিতা ও সমালোচনাকে গণতন্ত্রের অপরিহার্য শর্ত বলে ধরা হয়। মানুষ স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করবে এবং সেইমতো অবস্থান করবে এটাই উদারনৈতিক দর্শনের মূল কথা। গণমাধ্যমের সাফল্য এই দর্শনের ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে। গণমাধ্যম এর কাজে কোন রকম হস্তক্ষেপ হবে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই উদারনীতিক তত্ত্বের দ্বারা গণমাধ্যম পরিচালিত হয়। স্বাধীনতা ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে এই তত্ত্ব। মুক্তচিন্তার বিকাশ-এ সরকারি নিয়ন্ত্রণ বাধা সৃষ্টি করে, এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে বেসরকারি উদ্যোগের নেতিবাচক আচরণের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। মুনাফার লোভে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমাজের ক্ষতি করতে পারে এই দিকটা উপেক্ষিত থেকেছে।

২.৩.৪ সাম্যবাদী গণমাধ্যম তত্ত্ব (Communist Media Theory)

সাম্যবাদী দেশে গণমাধ্যম সাম্যবাদী ভাবধারার আলোকে পরিচালিত হয়। মার্ক্সবাদী দর্শন হলো গণমাধ্যমের অনুপ্রেরণা। মার্কসীয় তত্ত্ব বলে শ্রেণীহীন সমাজে রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকবে না। শোষণহীন সমাজের সর্বক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এই লক্ষ্যে যাবার পথে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন হবে। এবং এই রাষ্ট্রের সামাজিক উপকরণের মালিকানা থাকবে রাষ্ট্রের হাতে। কোনরকম ব্যক্তি মালিকানার অস্তিত্ব থাকবে না। ব্যক্তির অধিকারের চেয়ে সামাজিক অধিকারকে বেশি মান্যতা দেওয়া হবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। গণমাধ্যম এই ব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করবে, মুনাফার জন্য নয়, সমষ্টিগতভাবে সামাজিক স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা কবে। সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র এর উদ্দেশ্যই হল অর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। পূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নে গণমাধ্যম কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ মেনে পরিচালিত হতো। কোন গণমাধ্যমই বেসরকারি মালিকানার অধীনে ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা ছিল 'প্রাভদা' আর সরকারের কাগজ ছিল 'ইজভেসতিয়া'। বর্তমানে চিনেও গণমাধ্যম সরকারের পরিচালনাধীন। 'পিপলস ডেইলি' চালায় চীনের কমিউনিস্ট পার্টি।

২.৩.৫ সামাজিক দায়বদ্ধতা তত্ত্ব (Social Responsibility Theory)

বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এ সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণা গড়ে ওঠে। উদারনৈতিক তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা কে সংশোধন করার চেষ্টা করে সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণা। সংবাদপত্র শুধুমাত্র সরকার নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং তাতেই সামাজিক মঙ্গল হবে, এই ধারণা ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসে। সামাজিক স্বার্থে সংবাদপত্রকেও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। সামাজিক মঙ্গল কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তা ভাবতে হবে। এই হলো সামাজিক দায়বদ্ধতা। ব্যক্তিমালিকানাধীন সংবাদপত্র যদি শুধু নিজের মুনাফার কথা ভাবে তাতে সংবাদপত্র ও প্রতিষ্ঠান আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটলেও সাংবাদিকতার মান উন্নত হয় না। সাংবাদিকতার নীতি ও উদ্দেশ্য যদি বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তৈরি হয় তাহলেই সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ১৯৪৯ সালে Hutchins Commision আমেরিকাতে মিডিয়ার কার্যকলাপ পর্যালোচনা করে যে রিপোর্ট দিয়েছিল তার মধ্যেই নিহিত ছিল

সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা। কমিশন বলেছিল গণমাধ্যমকে দায়িত্বশীল হতে হবে। তখন অবশ্য গণমাধ্যম বলতে প্রধানত সংবাদপত্রকে বোঝাত। অবশ্য সেই সময় বেতার জনপ্রিয় হতে শুরু করেছিল। পরবর্তীকালে Wilbur Schramm সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণাকে আরও সমৃদ্ধ করেন। এই গবেষণায় সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি বড় হয়ে উঠেছিল।

২.৩.৬ সারাংশ

এখানে যে তাত্ত্বিক রূপরেখাগুলি আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো কর্তৃত্ববাদী তত্ত্ব। উদারনৈতিক তত্ত্ব, সাম্যবাদী তত্ত্ব এবং গণমাধ্যম ও সামাজিক দায়বদ্ধতার তত্ত্ব। প্রতিটি তাত্ত্বিক রূপরেখা গড়ে উঠেছে বিভিন্ন দার্শনিক বিচারবোধকে আশ্রয় করে। ঐতিহাসিকভাবে বিভিন্ন সময়ে সমাজকে প্রভাবিত করেছিল যে দার্শনিক প্রত্যয়গুলি তার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন তত্ত্ব। তার পরিচয় এখানে রয়েছে।

২.৩.৭ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কতৃত্ববাদী তত্ত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

২. সাম্যবাদী গণমাধ্যম এর উদ্দেশ্য কী?

বড় প্রশ্ন

১. গণতন্ত্রে কৃতিত্ববাদী তত্ত্বের ভূমিকা কী? এ বিষয়ে আপনার মত কী ব্যাখ্যা করুন।

২. সামাজিক দায়বদ্ধতা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।

২.৩.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১) Mass Communication Theory and Practice : Uma Narula

২) Communication Theory Today : Edited by David Cowley and Devid Michel

৩) গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী (অনুবাদ) : মেলভিন এল দি ফ্ল্যার, সন্দ্রাবল রোকেশ (বাংলা একাডেমি ঢাকা)

৪) জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম- ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

একক ৪ ◘ উন্নয়ন গণমাধ্যম তত্ত্ব, গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ তত্ত্ব, কনভারজেন্স

গঠন

২.৪.১ উদ্দেশ্য

২.৪.২ উন্নয়ন গণমাধ্যম তত্ত্ব

২.৪.৩ গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ তত্ত্ব

২.৪.৪ কনভারজেন্স

২.৪.৫ সারাংশ

২.৪.৬ অনুশীলনী

২.৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

২.৪.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ার পরে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন

- উন্নয়ন গণমাধ্যম তত্ত্ব
- গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ তত্ত্ব
- কনভারজেন্স

২.৪.২ উন্নয়ন গণমাধ্যম তত্ত্ব (Development Theory)

গণমাধ্যম দেশকালের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ভাবে কাজ করে। উদারনৈতিক ব্যবস্থার এক ভাবে কাজ করে। আবার সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষায় অন্য ভাবে কাজ করে। বিশেষ করে দেশকালের প্রেক্ষিতে সামাজিক চাহিদার তারতম্যের ফলে গণমাধ্যম কার্যধারায় পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় এবং তাদের সীমাবদ্ধতাও প্রকট হয়ে ওঠে। এইসব সীমাবদ্ধতার কথা ভেবেই কয়েকজন গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ নতুন একটি তত্ত্বের রূপরেখা দিয়েছেন। এর নাম উন্নয়ন গণমাধ্যম তত্ত্ব (Development Media Theory)।

গত শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে এশিয়া-আফ্রিকার বহু দেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে শুরু করে। তাদের চাহিদা ও প্রয়োজন ছিল অন্যরকম। উন্নত দেশগুলির চাহিদা দিয়ে তাদের অবস্থা একেবারেই বোঝা যায় না। এই দেশগুলির বেশিরভাগই ছিল খুব গরিব।। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করাই ছিল তাদের কাছে প্রধান লক্ষ্য। উন্নয়ন তো চাইলেই পাওয়া যায় না তার জন্য প্রয়োজন বিপুল বিনিয়োগ ও পর্যাপ্ত মূলধন। এইসব তাদের কিছুই ছিল না। তাই পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। McQuail– Altschull এবং Hachten বলেছেন এই পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য সে সমস্ত দেশের গণমাধ্যমগুলোকে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে। গণমাধ্যমগুলির

উন্নয়নের সহায়ক পরিবেশ তৈরি করার উদ্যোগ নেবে। দ্রুত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানোর সবচেয়ে প্রয়োজনী। সাধারণ মানুষের কাছে উন্নয়নের বার্তা নিয়ে যেতে হবে। দ্রুত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানোর সবচেয়ে প্রয়োজনী কোন অঞ্চলে কী রকম সেটা খতিয়ে দেখবে গণমাধ্যম।। গণমাধ্যম যদি সমস্যা গুলিকে চিহ্নিত করে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে সরকারের নীতিনির্ধারকরা এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেষ্টা করতে পারে। এতে উন্নয়ন দ্রুত বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। এই উন্নয়ন তত্ত্ব থেকেই উদ্ভূত হয় উন্নয়ন সাংবাদিকতা। সাংবাদিকরাও নিজেদের উন্নয়ন যজ্ঞে সামিল করবেন। সাংবাদিক হবে প্রশিক্ষিত, আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলিকে দ্রুত চিহ্নিত করতে শিখবেন। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নাইজেরিয়া, তানজানিয়া প্রভৃতি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে উন্নয়ন তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

বর্তমানে উন্নয়নের প্রসঙ্গে আরেকটি মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এর নাম টেকসই উন্নয়ন (Sustainable Development)। দ্রুত উন্নয়ন করতে গেলে অনেক সময় হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনা থাকে। যেমন কৃষিতে দ্রুত উন্নয়ন করতে গেলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার বাড়বে, কীটনাশক ব্যবহার করে ফসল রক্ষার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। পাম্প ব্যবহার করে খেতে জল দেওয়া হবে। এতে তাৎক্ষণিকভাবে বেশি ফসল পাওয়া সম্ভব হলেও ভবিষ্যতে তার খারাপ প্রভাব পড়বে। যেমন রাসায়নিক সার মাটির উর্বরা শক্তি নষ্ট করে। কীটনাশকের ব্যবহারে স্বাস্থ্যহানি ঘটবে আর পাম্পের ব্যবহারে জলস্তর নেমে যাবে। আগামী দিনে ঘনিয়ে আসবে গভীর সংকট। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে ভারতে দেখা দিয়েছিল তীব্র খাদ্য সংকট। ষাটের মাঝামাঝি বেশ কয়েকটি রাজ্যে তীব্র খরার ফলে শস্য উৎপাদন কমে গিয়েছিল। এই সমস্যা মোকাবিলা করতে পাঞ্জাব, হারিয়ানায় সবুজ বিপ্লবের স্লোগান তোলা হয়েছিল। উচ্চ ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও মাটির তলা থেকে প্রচুর জল তুলে ফসল বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হয়েছিল। ভালো ফল পাওয়া গিয়েছিল। গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার হয়েছিল সবুজ বিপ্লবের। কিন্তু এর দীর্ঘমেয়াদী ফল ভালো হয়নি। মাটির উর্বরতা শক্তি কমেছে। জলস্তর কমে গেছে এবং স্বাস্থ্যের হানি হয়েছে। এ অবস্থায় টেকসই উন্নয়নের বা (Sustainable Development) এর গুরুত্ব বেড়েছে। জৈব সারের ব্যবহার করে উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন। এই উপলব্ধি মানুষের হয়েছে। রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার কমেছে। মাটির থেকে যথেচ্ছ জল না তুলে সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসার করে কৃষিকাজের উন্নয়ন ঘটানো জরুরী বলে মনে করা হচ্ছে। আজকের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো পরিবেশ রক্ষা করা। জীব বৈচিত্র কে যদি রক্ষা করা যায়, বাতাসে কার্বন এর উৎস যদি কমানো যায় তাহলে পরিবেশ রক্ষা পাবে। উন্নয়ন হবে টেকসই। লাগামহীন উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে।

২.৪.৩ গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ তত্ত্ব (Democratic Participation Theory)

গণতন্ত্র সফল হয় মানুষের অংশগ্রহণে। গণতন্ত্রের মূল কথাই হলো মানুষ। প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র তখনই সফল হয় যখন মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে। রুশো (Rousseau) থেকে জন স্টুয়ার্ট মিল এই গণতন্ত্রের কথাই বলেছেন।

বর্তমানে গণজ্ঞাপন চর্চায় গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ তত্ত্বের নতুন এক রূপরেখা পাওয়া যাচ্ছে। উদারনৈতিক তত্ত্ব ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তত্ত্বের সীমাবদ্ধতার জন্য বর্তমানে সমস্ত গণমাধ্যম বিজ্ঞাপন নির্ভর হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞাপন আসে প্রধানত পণ্যদ্রব্য নির্মাতাদের কাছ থেকে। ভোগ্য পণ্যের বাজারে গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষের জায়গা নেই। শুধু

শহরাঞ্চলের ধনী বাজারে এটি সীমাবদ্ধ। তাই সমস্ত বিজ্ঞাপনের চেহারা আরবান (Urban)। মুষ্টিমেয় ধনী উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের বাজার নিয়ে বিজ্ঞাপনের কাজ কারবার। অন্যদিকে চাষী ক্ষেতমজুর শ্রমিকের জন্য বিজ্ঞাপনের কোনো মাথাব্যথা নেই। বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে সাধারণ গরিব মানুষের কোন স্থান নেই। এইসবই প্রান্তিক মানুষের প্রতি রয়েছে বাজারের অবহেলা।

সবচেয়ে লক্ষ্য করার বিষয় হলো গণতন্ত্রের মূল পরিকাঠামো কিন্তু এইসব প্রান্তিক মানুষের হাতে থাকে। এইসব মানুষকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ দেওয়া দরকার। কিন্তু জাতপাতের সমস্যার জন্য উচ্চবর্ণের চাপে ও কৌশলে নিম্ন বর্ণের মানুষ ভোট দিতে পারে না। আমাদের দেশে এরকম উদাহরণ আছে। আমরা এসব জেনেছি গণমাধ্যম মারফত। উদ্বেগের বিষয়টি হলো এই পরিস্থিতি। দীর্ঘমেয়াদী অনুসন্ধানমূলক খবরের ছিটেফোটাও পাওয়া যায় না। ফলে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রয়োজন চাহিদা কিছুই জানা যায় না। গণমাধ্যম এর নীতি ওপর থেকেই চালিত হয়।

সাধারণ মানুষের জনজীবনকে বুঝতে গেলে জনসংস্কৃতি কে বুঝতে হবে। এটা তখনই সম্ভব যখন বিচিত্র লোকসংস্কৃতি কে তুলে ধরা সম্ভব। আজ প্রান্তিক মানুষ এবং সংস্কৃতি বিপন্ন। যদিও বৃহৎ গণমাধ্যমে তা নিয়ে কোন চিন্তা নেই। জনজীবন বেঁচেথাকে সংস্কৃতির মধ্যে। ভাষা সংস্কৃতি যদি বিপন্ন হয় তাহলে বুঝতে হবে জনজীবন বিপন্ন।

বহুতত্ত্ববাদী ধারণাকে পুষ্ট করে ভাষা। সংস্কৃতির বৈচিত্রকে বজায় রেখে চললে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে। মানুষ যদি নিজের অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারে তাহলেই গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ সাফল্যমন্ডিত হতে পারে। শুধুমাত্র বাণিজ্যনির্ভর গণমাধ্যম দিয়ে এ কাজ হবে না।

২.৪.৪ কনভারজেন্স

বহুমাধ্যম একত্রিত হয়ে তৈরি করে কনভারজেন্স। এর প্রধান উৎস হলো ডিজিটাল মিডিয়া। পাওয়ারপয়েন্ট পরিবেশনায় কনভারজেন্স কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। একইভাবে যেকোনো সৃজনশীল কাজকে আরো অর্থবহ করে তুলতে পারে। গণ মাধ্যমের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো মাধ্যম হলো মুদ্রণ মাধ্যম। সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র, বই বিপুল প্রভাব ফেলেছিল সমাজে। মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে মুদ্রণ মাধ্যম তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। দীর্ঘদিন এই মাধ্যমটি রাজ্যপাট চালিয়েছে। সময়টা অনেক, প্রায় চার শতাব্দি। সপ্তদশ থেকে বিশ শতক, বিশ শতকেও তার দাপট যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। তবে এই শতকে মুদ্রণের পাশাপাশি চলে এলো বেতার, টেলিভিশন ও সিনেমা। সিনেমার ম্যাজিক গভীর প্রভাব ফেলেছিল সমাজে।

টেলিভিশনের প্রভাব ছিল বিপুল। দৃশ্য এবং শ্রাব্য মাধ্যম হিসেবে দ্রুত মানুষের মন জয় করেছিল টেলিভিশন। গণমাধ্যম হয়ে উঠল অনেক বিশ্বাসযোগ্য। যেমনটি ঘটছে তেমনটাই দেখা সম্ভব করলো টেলিভিশন। টেলিভিশন শুরুতেই হয়ে উঠল গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট। এরপর এলো ভিডিও যা প্রাথমিক পর্বে ছিল অ্যানালগ। পরে হল ডিজিটাল। ছবির গুণগতমানের অভাবনীয় উন্নতি হল। দেখা ব্যাপারটাই অন্য মাত্রা পেল।

কম্পিউটার ও ইন্টারনেট প্রযুক্তি আসার সঙ্গে সঙ্গেই গণমাধ্যমের চরিত্রটাই পাল্টে গেল। ইন্টারনেট নিয়ে এলো তথ্য বিপ্লব। আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল বিপুল তথ্য ভান্ডার। আগে তথ্য জানার জন্য লাইব্রেরী বা অন্যত্র ঢুঁ মারার

প্রয়োজন ছিল। এখন তথ্য হাতের সামনে। কম্পিউটার বা মোবাইলে একটা ক্লিক করলেই হল। চাহিদামতো তথ্য হাজির ঘরে বসেই। এক কথায় বিশ্ব গ্রামের বাসিন্দা হয়ে উঠল গোটা সমাজ।

আমরা এখন ডিজিটাল যুগে বসবাস করছি। এ যুগের সবচেয়ে আকর্ষণের বিষয় হলো কনভারজেন্স। একই ফরম্যাটে অনেকগুলো ফরম্যাট এসে মিশেছে। ইচ্ছে এবং প্রয়োজনমতো আমরা ভিডিও অডিও টেক্সট নিয়ে এসে যাচ্ছি ল্যাপটপের সামনে কখনো বা আইপ্যাডের পর্দায়। চাইলে এমনকি মোবাইলেও। শুধু এখানেই শেষ নয়, বর্তমানে সাময়িকপত্র, সংবাদপত্র এবং বইও এসে গেছে মোবাইল ফোনের পর্দায়। একই পর্দায় বহুমাধ্যম। এটি হলো কনভারজেন্স। অনেক নদী এসে মিলছে এক অপূর্ব জলাশয়ে। প্রয়োজন এবং পাশাপাশি বিনোদন সবকিছুই মিটছে কনভারজেন্স এ।

বৈদ্যুতিন জ্ঞাপন ব্যবস্থার ওপর ডিজিটাল কনভারজেন্স এর বিপুল প্রভাব। জ্ঞাপন ব্যবস্থার চরিত্রটাই পাল্টে গেছে। জ্ঞাপন এর সঙ্গে সর্বদাই যুক্ত হয়ে আছে মাধ্যম, বিশেষ করে গণমাধ্যম। গত কয়েক দশকে গণমাধ্যম কনভারজেন্সের প্রভাবে অনেক বর্ণময় হয়ে উঠেছে। বহু রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে গেছে। একজন গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞের কোথায় 'It has completely converged'.

সকালে চায়ের কাপ নিয়ে কাগজ পড়া মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন রুটিন। কিন্তু এখন এই রুটিন থাকলেও তার সীমানা বিস্তৃত হয়েছে। এখন আমরা মুদ্রিত সংবাদপত্র অনলাইনে পড়তে পারি। আগে যে সঙ্গীতানুষ্ঠান সিডিতে শুনতাম এখন তা যেকোনো সময়ে থ্রিডিতে রূপান্তরিত করে শুনতে পারি। ইউটিউবে গান শোনা নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা এক কথায় কনভারজেন্সের দৌলতে মিডিয়া আমার অনুগত। ইচ্ছে মতো তাকে ব্যবহার করা যায়।

যত দিন যাচ্ছে জ্ঞাপন স্ট্র্যাটেজির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। কনভারজেন্স মিডিয়া ব্যবহারকে সম্প্রসারিত করেছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির আবির্ভাবে গণমাধ্যম-এর সমস্ত শাখাই বৈপ্লবিক রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার ফলে জ্ঞাপন এর সামগ্রিক চিত্রটা পুরোপুরি পাল্টে গেছে। এই অবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে স্ট্র্যাটেজি। কনভারজেন্স এই স্ট্রাটেজি নির্ধারণ বিষয়টিকে বর্ণময় করে তুলেছে। অনলাইনে লেখা, ছবি, মিউজিক, ভিডিও সমস্ত রকম তথ্যই প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। শুধুমাত্র যুক্তিযুক্ত নির্বাচনে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে।

২.৪.৫ সারাংশ

একটা সময় গণমাধ্যম কার্যধারার উন্নয়ন হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জ্ঞাপন এ উন্নয়ন কিভাবে সাহায্য করতে পারে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উন্নয়ন গণমাধ্যম সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নে খুবই প্রাসঙ্গিক ও জরুরি বিষয় হয়ে উঠেছে।

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের বিষয়টি। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে যে তথ্য গড়ে উঠেছে তা একেবারে তৃণমূল স্তরে গিয়ে কাজ করে, তুলে ধরে প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর। শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিবেদন দিয়ে কাজ হয়না। একেবারেই প্রান্ত নিবাসী মানুষের কাছে পৌঁছে খবর করতে হয়। উপর থেকে নিচ দেখার পরিবর্তে নিচ থেকে ওপরের দিকে দেখতে হয়।

বর্তমানে আমরা ডিজিটাল যুগে বসবাস করছি এই সময় গণমাধ্যমের চালচিত্র একেবারে পাল্টে গেছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে ঘটেছে কনভারজেন্স। বহুমাধ্যম এসে মিলেছে একটি ফরম্যাটে। একটা মোবাইল ফোনের মধ্যে পাওয়া

যাচ্ছে বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, সংগীত আরো কত কী। ইচ্ছেমতো ব্যবহার করলেই হল। একেই বিপ্লব বলে অভিহিত করা যায়।

২.৪.৬ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা কী?

২. কনভারজেন্স কী?

৩. কনভারজেন্স কি গণমাধ্যমের মানচিত্র পাল্টে দিয়েছে? যুক্তি দিয়ে আলোচনা করুন।

২.৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১) Mass Communication Theory and Practice : Uma Narula

২) Communication Theory Today : Edited by David Cowley and Devid Michel

৩) গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী (অনুবাদ) : মেলদিন এল কি ফ্ল্যার, সন্দ্রাবল রোকেশ (বাংলা একাডেমি ঢাকা)

৪) জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম - ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা)

৫) গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি - ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা)

নোটস্	নোটস্

মডিউল-৩ : জ্ঞাপন তত্ত্ব-২ ◘ (Communication Theory-II)

একক ১ ◘ জ্ঞাপন মডেল ধারণা, লিনিয়ার এবং নন-লিনিয়ার মডেল। (রৈখিক এবং অরৈখিক মডেল) মৌখিক মডেল, আইকনিক মডেল, অ্যানালগ মডেল।

গঠন

৩.১.১ উদ্দেশ্য

৩.১.২ জ্ঞাপন মডেল ধারণা

৩.১.৩ লিনিয়ার এবং নন-লিনিয়ার মডেল

৩.১.৪ মৌখিক মডেল

৩.১.৫ আইকনিক মডেল

৩.১.৬ অ্যানালগ মডেল

৩.১.৭ সারাংশ

৩.১.৮ অনুশীলনী

৩.১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৩.১.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ার পরে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন

- জ্ঞাপন মডেল ধারণা
- লিনিয়ার এবং নন-লিনিয়ার মডেল
- মৌখিক মডেল
- আইকনিক মডেল
- অ্যানালগ মডেল

৩.১.২ জ্ঞাপন মডেল ধারণা

মডেল কোনো ধারণা কে সঠিকভাবে বুঝতে সাহায্য করে। জ্যামিতিক ভাবে উপস্থিত করা হয় ধারণাকে। লাইন - টু- লাইন ব্যাখ্যা বিষয়কে সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেয়।

৩.১.৩ লিনিয়ার এবং নন-লিনিয়ার মডেল

একরৈখিক (Linear Model)

লিনিয়ার মডেল হলো এক রৈখিক মডেল। একটি রেখা সমান্তরাল গতিতে চলে। রেখা এক প্রান্ত থেকে সরাসরি অন্য প্রান্তে যায়। অ্যারিস্টটল মডেল মূলত এক রৈখিক মডেল।

দুই প্রান্তের মধ্যেই জ্ঞাপন সীমাবদ্ধ। বার্তা চলে সরলরেখার গতিতে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। গ্রিসের সেই সময়ে জ্ঞাপন সীমাবদ্ধ ছিল আলোচনা সভার মধ্যে। একজন মানুষ বলতেন এবং সবাই শুনতো। এক রৈখিক মডেলের প্রতিবার্তা পাওয়া যায় না। প্রেরক বার্তা পাঠাচ্ছেন কিন্তু গ্রাহক কোন প্রতুত্তর পাঠাচ্ছেন না। জ্ঞাপন প্রক্রিয়ার মধ্যে বাধা সবসময় থাকছে। বেতার এবং টেলিভিশন এর ক্ষেত্রে যে জ্ঞাপন ঘটে তা এক রৈখিক। তাৎক্ষণিক প্রতিবার্তা পাওয়া যায় না।

এক রৈখিক জ্ঞাপন এ দেখা যায় রাস্তা একমুখী। প্রেরক বার্তা পাঠাচ্ছেন গ্রাহক তা গ্রহণ করছেন। সংবাদপত্র বেতার-টেলিভিশনে এমন একমুখী জ্ঞাপন দেখা যায়। যেখানে তাৎক্ষণিক প্রতিবার্তা পাওয়া যায় না। আজকাল ফোন-ইন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকলেও সেখানেও লাইন পেতে অনেক সময় লাগে।

সমান্তরাল চলে এই জ্ঞাপন। কোন জটিলতা নেই একেবারেই সহজ সরল। বিপণনে এবং জনসংযোগের এই পদ্ধতি খুবই কার্যকরী। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সর্বদা বার্তা এসে মানুষের কাছে পৌঁছেছে। মানুষ দেখছে বিজ্ঞাপন, নিজের প্রয়োজন মতো তা ব্যবহার করছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে না।

ই-ব্যবস্থায় এই ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ই- মেল খুললেই আমরা অজস্র বিজ্ঞাপন পাই। অমুক জিনিস কিনুন, এই পরিষেবা নিন, এ রকম হাজারো বিজ্ঞাপন আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। তখন আমরা ঠিক করি কোনটা নেব।

বিজ্ঞাপন ব্যাপারটাই পুরোপুরি একমুখী জ্ঞাপন। বিপণনের জন্য অজস্র কথা বলে যাচ্ছে। সব আমরা কিন্তু শুনছি না। বেশিরভাগটাই ফেলে দিচ্ছি। যেটা আমার প্রয়োজন শুধু সেটাই গ্রহণ করছি।

এই মডেলের প্রেরক, মাধ্যম এবং গ্রাহক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রেরক বার্তা তৈরি করছে, বার্তার মধ্যে থাকছে প্রেরকের ভাবনা ও চিন্তা এবং তথ্য। তারপর এই বার্তা কোন একটি বিশেষ মাধ্যমের সাহায্যে গ্রাহকের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় বার্তা একটি নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করছে। যেমন কথা, গান, লিখিত ভাষা, অ্যানিমেশন, গ্রাফিক্স ইত্যাদি। গ্রাহকই বার্তা বুঝতে পারে।

মডেলটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো নয়েজ বা বাধা থাকার সম্ভাবনা বেশি। নয়েজ সাধারণত জ্ঞাপনে বিঘ্ন ঘটায়। এর ফলে বার্তা বুঝতে অসুবিধা হয়। নয়েজ টেকনিক্যাল হতে পারে আবার সাইকোলজিক্যালও হতে পারে। বেতার ও টিভির সম্প্রচার এ লিংক চলে গেলে হবে টেকনিক্যাল নয়েজ। অন্যদিকে ভাষার ও ছবির দুর্বোধ্যতা সাইকোলজিকাল নয়েজ তৈরি করতে পারে।

এই মডেলটি বিজনেস কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে বেশি উপযোগী। আজকাল ই-মেলে অজস্র বিজ্ঞাপন এসে হাজির হয়। অধিকাংশ বিজ্ঞাপন আমরা দেখেও দেখিনা। অতি সামান্য বিজ্ঞাপন দেখি নিজের প্রয়োজনে। চেনা কিছু উল্লেখযোগ্য মডেলকে একরৈখিক মডেলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এগুলি হল লাসওয়েল মডেল, শ্যানন উইভার মডেল এবং

বারলো মডেল।

এই মডেলের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। প্রথমটি হল প্রতিবার্তার অনুপস্থিতি। প্রতিবার্তা ছাড়া জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হয় না। এক্ষেত্রে নয়েজের সম্ভাবনা বেশি। এতে জ্ঞাপনে বিঘ্ন ঘটে।

অ-রৈখিক মডেল মডেল (Non-Linear Model)

অরৈখিক জ্ঞাপন মডেলে রেখার আধিপত্য থাকেনা। এখানে মানসিক গঠনের প্রাধান্য অনেক বেশি। যে-কোনো বিষয় মস্তিষ্কে কি প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে তার ভূমিকা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

এই মডেল হলো সেই প্রক্রিয়া যেখানে দ্বিমুখী প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে তার হদিশ পাওয়া যায়। একে বলে সার্কুলার মডেল। আন্তঃসম্পর্কের সন্ধান এখানে পাওয়া যায়। মনস্তত্ত্বের সঙ্গে এই মডেলের যোগ নিবিড়। মূল্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা অনুধাবন করতে পারলে জ্ঞাপন ক্রিয়া ভালোভাবে বোঝা যায়।

মডেলটির ভিত্তি হলো মস্তিষ্ক। এখানে কাজ চলে অনেক টানাপড়েনের মধ্যে দিয়ে। বেশ জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। লিনিয়ার বা রৈখিক মডেলের মত সরলরেখায় তাকে পাওয়া যাবে না। নিরন্তর প্রতিবার্তা পাওয়ার ফলে জ্ঞাপন ক্রিয়ায় আসে জটিলতা। যেখানে রেখা চক্রাকারে অথবা বিভিন্ন গতিতে এগুতে থাকে। কারণ প্রতিবার্তা প্রেক্ষাপটে নতুন মাত্রা যোগ করে। পরবর্তীকালে পরিপ্রেক্ষিত পাল্টে গেলে বার্তার ধরণও বদলায় এবং এই পরিবর্তনের প্রভাব গোটা জ্ঞাপন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। মনস্তাত্ত্বিক দিকটি বেশি প্রাধান্য পায় অরৈখিক জ্ঞাপন এ। এই ধরনের জ্ঞাপনে সৃজনশীলতার গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ এই জ্ঞানের উৎস থাকে মস্তিষ্কে। কখনো তা অসংলগ্ন হতে পারে যেমন স্বপ্ন, সার্থকতা পুনর্নির্মাণ ইত্যাদি।

৩.১.৪ মৌখিক মডেল (Verbal Model)

কথাই মাধ্যম। শব্দ নির্ভর কথা দিয়েই জ্ঞাপন হয়। কথায় আছে 'কথা কইতে পারলে হয় কথা শতধারায় বয়'। কথা দিয়েই অনেক কিছুই জানানো যায়। শুধুমাত্র ব্যবহারিক নয়, শিল্পরুপও তৈরি করা যায়। মৌখিক মডেল এর সংক্ষিপ্ত রূপ হল "A Verbal Model is a word equalisation that represents a real situation", এর অর্থ হল শব্দ কথা নির্মাণ করে বাস্তব অবস্থা তুলে ধরতে পারে। তাই তৈরি হল মৌখিক মডেল। মৌখিক মডেলে পদ, সংখ্যার ব্যবহার হয়। এতে অত্যাধিক ব্যথা, যন্ত্রণা, কল্পনা সবই কথায় প্রকাশ করা যায়। উইল ডুরান্ট (Will Durant) বলেছেন মানুষ প্রথম আদিম যুগে কথা বলতে শিখেছিল। প্রথমে তার মুখে এসেছিল বিশেষ্য পদ। যেমন আগুন, বাড়ি, আকাশ, ঝরণা, নদী, পাহাড় ইত্যাদি।

মুখের কথার কোন সার্বজনীন রূপ নেই। কথার নির্মাণ হয় আঞ্চলিকতার প্রেক্ষায়। তাই কয়েক মাইল অন্তর মুখের ভাষা পাল্টে যায়। হুমায়ুন কবির দুই বাংলার মুখের ভাষা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন আঞ্চলিক প্রকৃতি মুখের ভাষার তারসাম্য আনে। জীবনযাপনেও তার প্রভাব পড়ে। সাংস্কৃতিক ভাবনা ও মূল্যবোধের পার্থক্য ঘটে। পূর্ববঙ্গের মুখের ভাষা আর পশ্চিমবঙ্গের কথ্য, ভাষার মধ্যে পার্থক্য বিপুল। দুই বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান আলাদা। পূর্ব বাংলার বন্যা, ঝড় অনেক বেশি হয়। মানুষকে সর্বদাই জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত থাকতে হয়। ঘর ভাঙ্গলে

আবার নতুন করে ঘর বাঁধতে হয়। তাই তার আঞ্চলিক গান এ ভাটিয়ালির সুর বাজে। তার সব গানই হয় জীবন কেন্দ্রিক। আর পশ্চিম বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত শান্ত। তাই সেখানে বাউল দরবেশী ফকির গানের প্রাধান্য লক্ষণীয়।

মৌখিক মডেল ভাষাতত্ত্বের চর্চায় খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। ভাষাতাত্ত্বিকরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই মডেলটিকে মূল্যায়ন করেছেন। Wenstop Yanger (১৯৭৮) এবং Tong (১৯৮০) বিভিন্ন ভাষাতত্ত্বের মূল্যের এবং পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন। এই আলোচনা ভাষাতত্ত্বের নিরিখে মডেলের গুরুত্ব বাড়িয়েছে। গার্বনারের মডেলও মৌখিক মডেলের কথা বলে। এই মডেল এক রৈখিক বা লিনিয়ার।

৩.১.৫ আইকনিক মডেল (Iconic Model)

আইকনিক মডেল হল ডিজিটাল এজের মডেল। আইকন হচ্ছে ভাষার প্রতীক এবং অত্যন্ত আধুনিক। যা আন্তর্জাতিক স্তরে সকলেই বুঝতে পারে। প্রতীকের মধ্যে ভাষা সংযোগ পাওয়া যায়। প্রতীকের মধ্যে থাকবে ছবি যার অর্থ আন্তর্জাতিক স্তরে সকলেই বুঝতে পারবে। যেমন মোটর দুর্ঘটনা ব্যাখ্যা, ঝড়, আগুন ইত্যাদি এইসব দুর্যোগ পরিস্থিতি ছবির মধ্যে ধরা থাকবে। ছবির আইকনগুলো দেখেই বিশ্বজুড়ে সবাই বুঝতে পারবে বিপদের সংকেত।

আন্তর্জাতিক জ্ঞাপনে আইকনিক মডেলের গুরুত্ব অপরিসীম। খুব দ্রুত যে কোন বিষয়কে বোঝাতে এই জ্ঞাপন নতুন দিশা দেখায়। খুব সংক্ষিপ্ত সাধারণগ্রাহ্য প্রতীকের মাধ্যমে যে কোন বিষয়কে তুলে ধরা যায়। ছবি বা প্রতীক দেখেই আমরা বিষয়ের আন্দাজ পাই। এককথায় যেখানে ভাষা পৌঁছয় না সেখানে প্রতীক ভাষা খুব দ্রুত পৌছে যায়। এখানেই আইকনিক মডেলের সাফল্য। বিপর্যয়ের সময়ে এই মডেল বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। একেবারে যথাযথভাবে ফিজিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন পাওয়া যায় এই মডেলে। অতিরিক্ত কোনো কিছুর সংযোজনের সম্ভাবনা নেই। প্রতীক দেখামাত্র জ্ঞাপন ঘটে। মডেলের প্রতীক ছবি দেখে বিপদ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। আজকাল ইমেজি দিয়ে মনের ভাবনাকে সকলেই প্রকাশ করছে।

৩.১.৬ অ্যানালগ মডেল (Analog Model)

অ্যানালগ হলো প্রযুক্তিনির্ভর সম্প্রচার পদ্ধতি। ক্রমাগত প্রতীকের মাধ্যমে তথ্য প্রেরণ হয়। শব্দ ছবি ও কথা নিয়ে তৈরি হয় তথ্য। বেতার এবং টেলিভিশনে এভাবেই ঘটে তথ্য-সম্প্রচার। অ্যানালগ মডুলেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে এই সম্প্রচার সংঘটিত হয়। মডিউলেশন দুরকম হতে পারে- ফ্রিকুয়েন্সি মডিউলেশন সংক্ষেপে যাকে এফ.এম বলে অভিহিত করা হয় এবং অন্যটি হলো এমপ্লিচুড মডিউলেশন এটিকে আবার এ.এম বলে অভিহিত করা হয়। আবার কখনো সম্প্রচারে মডুলেশন নাও থাকতে পারে। বেতার সম্প্রচারের এফ.এম এবং এ.এম ব্যবহৃত হয়। খুব ছোট জায়গার জন্য এফ.এম সম্প্রচার প্রভূত সাফল্য পেয়েছে। ফ্রিকুয়েন্সি মাত্রা ভালো হওয়ার জন্য এফএম সম্প্রচারে নয়েজের সম্ভাবনা কম হয় এবং অনেক ভালো শোনা যায়।

সম্প্রচার যখন বিস্তৃত জায়গার জন্য হয় তখন A.M. সম্প্রচারের সাহায্য নেওয়া হয়। এখানে নয়েজ এর সম্ভাবনা

বেশি থাকে। বেতার এবং টেলিভিশন সম্প্রচার এবং টেলিফোনে কথাবার্তা ছিল অ্যানালগ পদ্ধতি নির্ভর। পরে তারা ডিজিটাল পদ্ধতি নির্ভর হয়ে ওঠে। অন্যান্য মডেল যে পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয় তা অনেক সময় এবং একই সাথে কম খরচ সাপেক্ষ। এই অ্যানালগ মডেলের অনেকগুলি রূপ পাওয়া যায়। যা প্রধানত এর ভিত্তি রূপকে উপস্থাপিত করে। সম্প্রচার ক্রিয়ার উৎস খুঁজে পাওয়া যায় এখানে।

অ্যানালগ মডেলসমূহ উপস্থিত করে একটি 'Physical Process' কে। এই প্রসেস এর মধ্যে যে উপাদান গুলো ব্যবহৃত হয় তা অ্যানালগ অর্থাৎ অনুরূপ। প্রক্রিয়ার মধ্যে এই অনুরূপ উপাদানগুলিকে পাওয়া যায়। ভালো অ্যানালগ মডেলসমূহ সিস্টেম মডেলস-এর চেয়ে নিচু স্বরে প্রকৃত ব্যবস্থাকে নিখুঁতভাবে উপস্থিত করতে পারে। যেমন ধরা যাক শক্তির এনার্জি ব্যবহার অনুরূপ উপাদান গুলির মধ্যে দেখা যায়। তবে এদের মধ্যে যে আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে তা কিন্তু মডেলের বহিরঙ্গে সহজে ধরা যায় না।

A.V. Hill ১৯৩০ সালে এই মডেল সম্পর্কিত একটি রূপ রেখার সন্ধান দেন। মানবদেহের গঠনের ভিত্তি হলো কতগুলি হাড় সমৃদ্ধ কঙ্কাল। এর ওপরে তৈরি হয়েছে মানব দেহ, মাংসপেশির সমন্বয়ে খুঁজে পাওয়া যাবে এক শক্তির উৎস। শক্তি মাসেলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়। দেহের সঞ্চালনকে কার্যকারী করে এই শক্তি। দেহের পেশী সমূহের কার্যকারীতাকে যদি বোঝা যায় তাহলে অনুরূপ উপাদানগুলিকেও খুঁজে পাওয়া যাবে। সমস্ত উপাদান গুলির সমন্বয়ে জড়ো হয় এক অখণ্ড শক্তি যা দেহকে সাফল্যের সঙ্গে চালনা করে।

সম্প্রচার ব্যবস্থাকে নিখুঁতভাবে বুঝতে অ্যানালগ মডেলের অবদান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পেশির সঞ্চালনার মতন সম্প্রচার ব্যাবস্থাও গড়ে ওঠে আন্তঃসম্পর্কের উপর ভিত্তি করে।

৩.১.৭ সারাংশ

জ্ঞাপন এর চরিত্র ভালোভাবে বোঝার জন্য মডেল তৈরি হয়েছে। মডেলের ধারণা তিনটি আলাদা আলাদা অধ্যায়ে বিস্তারিত রূপে আলোচিত হয়েছে।

জ্ঞাপন-এর প্রাথমিক রূপ হলো রৈখিক এবং অরৈখিক, এবং মৌখিক অমৌখিক এছাড়াও আইকনিক এবং অ্যানালগ মডেল বিশ্লেষিত হয়েছে। মডেলের সঙ্গে যোগ রয়েছে চিত্রের, যার সাহায্যে জ্ঞাপন কাজকে যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়েছে এখানে। যেমন রৈখিক মডেলের লাইনের গুরুত্ব দেখতে পাওয়া যায়। জ্ঞাপন যেখানে সরলরেখাকে অনুসরণ করে যেমন এস এম আর সি মডেল। এভাবেই আলোচিত হয় অরৈখিক যা বক্রতাকে তুলে ধরে। তারপর অন্য দুটি মডেল যথাক্রমে আইকনিক ও অ্যানালগ আলোচিত হয়েছে।

৩.১.৮ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জ্ঞাপন মডেল কী?

২. রৈখিক মডেল কী?

৩. অরৈখিক মডেল কী?

বড় প্রশ্ন

১. জ্ঞাপন এর ধারণা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২. মৌখিক মডেল ব্যাখ্যা করুন।

৩. আইকনিক মডেল আলোচনা করুন।

৪. অ্যানালগ মডেল ব্যাখ্যা করুন।

৩.১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১) *Mass Communication Theory and Practice* : Uma Narula

২) *Communication Theory Today* : Edited by David Cowley and Devid Michel

৩) *গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী (অনুবাদ)* : মেলভিন এল কি ফ্ল্যার, সন্দ্রাবল রোকেশ (বাংলা একাডেমি, ঢাকা)

৪) *জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম*- ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

৫) *গণজ্ঞাপন* : ড: পার্থ চট্টোপাধ্যায়

একক ২ ◘ অ্যারিস্টোটল মডেল, লাসওয়েল মডেল, ওসগুড মডেল, স্ক্রাম মডেল, গাবর্নর মডেল

গঠন

৩.২.১ উদ্দেশ্য

৩.২.২ অ্যারিস্টটল মডেল

৩.২.৩ লাসওয়েল্ মডেল

৩.২.৪ ওসগুড্ মডেল

৩.২.৫ স্ক্রাম মডেল

৩.২.৬ গাবর্নর মডেল

৩.২.৭ সারাংশ

৩.২.৮ অনুশীলনী

৩.২.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৩.২.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ার পরে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন

- অ্যারিস্টটল মডেল
- লাসওয়েল্ মডেল
- ওসগুড্ মডেল
- স্ক্রাম মডেল
- গাবর্নার মডেল

৩.২.২ অ্যারিস্টটল মডেল

সবচেয়ে প্রাচীন জ্ঞাপন মডেল হল অ্যারিস্টটল মডেল। প্রায় ২৩০০ বছর আগে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল তার 'Rhetoric' গ্রন্থে এই মডেলটি উল্লেখ করেছিলেন। এই মডেলে তিনি পাঁচটি উপাদান এর কথা বলেছিলেন। এগুলি হল যথাক্রমে বক্তা, বক্তৃতা, শ্রোতা, প্রভাব এবং উপলক্ষ্য।

প্রাচীন গ্রিসের জ্ঞাপনচর্চা সীমাবদ্ধ ছিল আলোচনার মধ্যে। যাকে বলা যায় ডিসকোর্স। অ্যারিস্টটল আলোচনা সভার প্রেক্ষিতেই তার মডেল তৈরি করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল বক্তাকে পরিস্থিতি বিবেচনা করে বক্তৃতা তৈরি করতে সাহায্য করা। শ্রোতার ওপর তার প্রভাব কী হবে তা বিবেচনা করেই বক্তা বার্তা তৈরি করবেন। এই প্রভাব

কার্যকারী হবে একটি বিশেষ উপলক্ষকে কেন্দ্র করে। আলোচনা সভার মধ্যেই রয়েছে এই মডেলের প্রাসঙ্গিকতা। আধুনিক জটিল জ্ঞাপন ক্রিয়াকে বোঝা যাবে না এই সরলরৈখিক মডেল দিয়ে।

বক্তা - বক্তৃতা - শ্রোতা - প্রভাব - উপলক্ষ

এই পাঁচটি উপাদানে তৈরি করছে একরৈখিক মডেলকে।

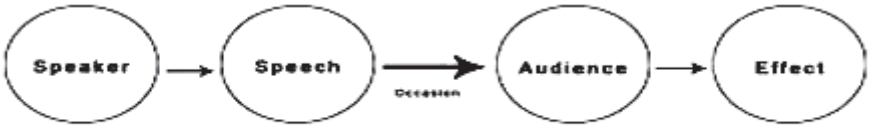

ARISTOTLE'S MODEL OF COMMUNICATION

৩.২.৩ লাসওয়েল মডেল (Harold Lasswell Model)

হারল্ড লাসওয়েল এই মডেলটির অবতারণা করেছিলেন ১৯৪৮ সালে। এই মডেলের মূল বিষয়টি ছিল কে, কাকে, কী মাধ্যমে, কী বললো, এবং তার ফলে কী প্রতিক্রিয়া হলো।

(Who, said what, by what channel, to whom, and with what effect)

এই মডেল তথ্য প্রবাহকে বহুমুখী সমাজের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি মতামত ও ভাবনা প্রভাবিত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমের সাহায্যে। তথ্যের আদান প্রদানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বিভিন্ন ধরনের শ্রোতৃ মন্ডলী। বহুমুখী সমাজের প্রেক্ষাপটে জ্ঞাপন এর বিচিত্র কার্যধারা বুঝতে এই মডেল সাহায্য করে।

মডেল অনুসারে প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হবে 'কে' এর প্রতি। চিনতে হবে কে বার্তা পাঠাচ্ছে। বার্তাকে নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়টিকে কে হাতে রেখেছে। কোন অবস্থানের সঙ্গে বার্তার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কযুক্ত। 'কী' দিয়ে বোঝা যাবে বার্তার চরিত্র। আলোচনার মধ্যে দিয়ে বোঝা যাবে কোন ধরনের বার্তা পাঠানো হচ্ছে। বার্তার বিষয় অনুধাবনের দিকটিকে গবেষণার ভাষায় বলা হয় কনটেন্ট অ্যানালাইসিস। বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে জানা যায় বিষয়বস্তুর তাৎপর্য। এরপর আসবে মাধ্যম। দেখতে হবে কোন মাধ্যমে বার্তা পাঠানো হচ্ছে। জ্ঞাপন ক্রিয়ায় মাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানব চরিত্রের বিশ্লেষণ করলে জ্ঞাপন বিষয়টি আরো পরিস্কার হবে। কাকে বলা হচ্ছে সেটাও খুব জরুরী। বার্তাটি সবার

কাছে গিয়ে পৌঁছেছে এবং তাদের পরিচয় জানতে সাহায্য করছে। গ্রহীতার পছন্দ, চাহিদা, অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি সবকিছুই যা তাদের চরিত্রকে ব্যাখ্যা করবে সেটি হল প্রতিক্রিয়া। বার্তা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রহীতার একটি প্রতিক্রিয়া হবে। এই প্রতিক্রিয়া টা জানা গেলে জ্ঞাপন পদ্ধতির সামগ্রিক রূপটি পরিষ্কার হবে। জ্ঞাপন ক্রিয়া বুঝতে এই প্রতিক্রিয়া উপাদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

লাসওয়েল যখন এই তত্ত্বের অবতারণা করেন তখন তিনি রেখাচিত্রের সাহায্য নেন নি। পরবর্তীকালে মাইকেল বুলার রেখাচিত্রের মাধ্যমে মডেল মাটিকে আরো উন্নত করেন। রেখাচিত্রটি প্রত্যেকটি উপাদানকে যথাযথভাবে উপস্থিত করে।

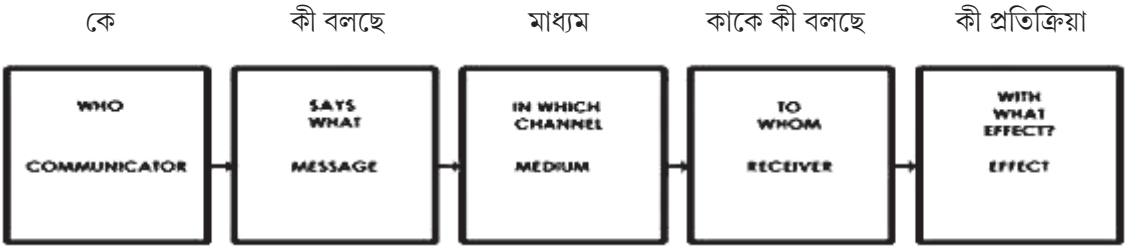

আচরণবাদী তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে তিনি এই মডেলের উপস্থাপনা করেন। নৈতিক পরিস্থিতিকে বুঝতে সাধারণ মানুষের আচরণও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে লাসওয়েল রাষ্ট্র নেতাদের বক্তৃতা সাধারণ মানুষের মনে কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে তা অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে রুজভেল্ট, চার্চিল, হিটলারের বক্তৃতা মানুষের কাছে কি বার্তা বয়ে এনেছিল তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লাসওয়েল এই জ্ঞাপন প্রক্রিয়ার সন্ধান পান। প্রাথমিকভাবে যা ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা পরে তাই হয়ে ওঠে জ্ঞাপনচর্চার অপরিহার্য অঙ্গ।

৩.২.৪ ওসগুড্ মডেল (Osgood Model)

এই মডেল জ্ঞাপনের ধারণাকে আরো সুসংহত করে। কতগুলি বক্স এবং তার চিহ্ন ব্যবহার করে ডান্স প্রবর্তিত চক্রাকার মডেলের অনুকরণে তিনি নয়েজ এবং ব্যক্তিত্বের প্রভাব কে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। ওসগুড মডেল এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো বিরামহীন ক্রমশ নয়েজের পরিমাণ কমতে থাকা এবং ব্যক্তিত্বের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়া। পরস্পরের জানার যত সুযোগ বাড়বে পরস্পরের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার তাগিদে বাড়বে। এর ফলে প্রেরক ও গ্রহীতার মধ্যে দূরত্ব কমে আসবে। একজন আরেকজনকে যত ভালোভাবে বুঝবে ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব তত বৃদ্ধি পাবে। চক্রাকারে জ্ঞাপন ক্রিয়া যত নিচের দিকে নামবে ব্যক্তিত্বের বক্স তত বড় হবে এবং নয়জের ছোট হবে।

দু দিকে ব্যক্তিত্ব অথবা পার্সোনালিটি, একজন ব্যক্তি প্রেরক ও অন্যজন গ্রহীতা। প্রথমে এনকোডিং তারপর ইন্টারপ্রিটেশন শেষে ডিকোডিং। এরপর তৈরি হলো মেসেজ। যা আমরা পাচ্ছি দ্বিতীয় পর্যায়ের বৃত্তে। তারপর মেসেজ যায় গ্রহীতার কাছে। যেখানে অর্থাৎ পরের বৃত্তে প্রথমে decoding তারপর interpretation, এরপর গ্রহীতা ওই মেসেজ সম্পর্কে

তার প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন। সেটা আবার তিনি এনকোড করছেন। তৈরী হচ্ছে তার মেসেজ যা আমরা শেষ বৃত্তে পাচ্ছি। বার্তা বা মেসেজ ক্রমশ নিচের দিকে নামছে। যত যোগাযোগ বাড়বে মাধ্যখানের নয়েস বক্স ততো ছোট হবে। ছোট বৃত্তের মাধ্যমে সেটি বোঝানো হয়েছে।

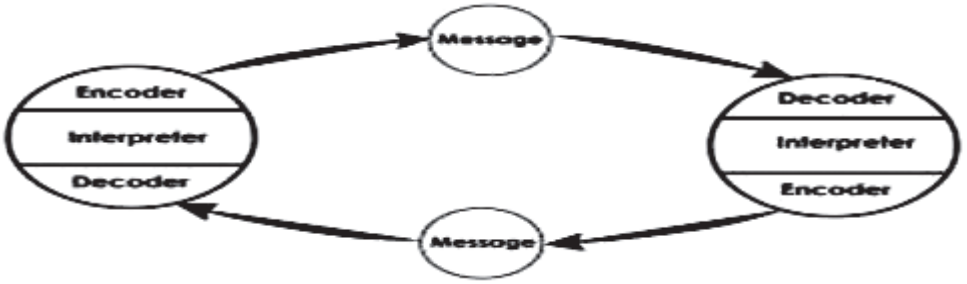

৩.২.৫ স্ক্রাম মডেল (Schramm Model)

উইলবার স্ক্রাম ১৯৫৪ সালে এই মডেলটির অবতারণা করেন। এটি হলো দ্বিমুখী চক্রাকার জ্ঞাপন (two way circular communication), এখানে জ্ঞাপন ঘটে প্রেরক ও গ্রহীতার মধ্যে। স্ক্রাম মূলত এনকোডিং এবং ডিকোডিং এর ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই এনকোডিং এবং ডিকোডিং এর ব্যাপারটি জ্ঞাপনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। একজন ব্যক্তি কীভাবে এনকোড করছে এবং অন্য একজন কীভাবে ডিকোড করছে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এনকোডিং বার্তা তৈরি করে আর ডিকোডিং এ বার্তার পুনর্নির্মাণ ঘটে অর্থাৎ বার্তা নির্মাণ পূর্ণতা পায়। সোজা কথায় এর অর্থ হল একজন বলছে এবং অন্যজন শুনছে। একজন যদি বলে আগুন আর অন্যজন যদি আগুনের তাৎপর্য বুঝতে পারে তাহলেই জ্ঞাপন সফল হবে।

স্ক্রাম বলেছেন বার্তার (message) অর্থ denotative এবং connotative দুই হতে পারে। Denotative এর অর্থ হলো যে বিষয়টি গঠিত হচ্ছে তা যেন সবাই বোঝে এবং গ্রহণ করে। Cannotative এর অর্থ হলো বিষয়টি সম্পর্কে এক ব্যক্তির অনুধাবন অন্য ব্যক্তির অনুধাবনের থেকে আলাদা হতে পারে।

এই মডেল জ্ঞাপনকে বিরামহীন প্রক্রিয়া বলে ঘোষণা করে। বিরামহীন এর অর্থ হল চলতেই থাকে, শেষ হয় না। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে জ্ঞাপন ক্রিয়া কিন্তু চলতেই থাকে, ফলে ঘটতে থাকে, অন্তহীন সামাজিক মিথস্ক্রিয়া। পারস্পারিক, দলগত এবং গণজ্ঞাপন এক বিরামহীন প্রক্রিয়ার মধ্যে চলতে থাকে এবং সমাজের মূল চালিকা শক্তি হয়ে দাঁড়ায় জ্ঞাপন। তথ্যকে শব্দে রূপান্তরিত না করলে এবং তা একজন আরেকজনকে না বললে অথবা অন্য কোনভাবে না জানালে তথ্যের অস্তিত্বের কোন অর্থই হয় না। একজন আরেকজনকে জানাচ্ছে মানেই সেখানে প্রথমে আসে এনকোডিং আর তারপর আসে ডিকোডিং। প্রথমে এনকোডিং এরপর বার্তা ডিকোডিং এর মাধ্যমে তা গৃহীত হচ্ছে। শুধুমাত্র গ্রহণ করলে হবে না, বুঝতে হবে প্রেরক কী বলতে চাইছে। স্ক্রাম বলেছেন জ্ঞাপনে এনকোডিং এবং ডিকোডিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটি কাজ যদি ঠিকমত না হয় তাহলে জ্ঞাপন এর কোন মানেই হয়না।

স্ক্রাম অবশ্য আরো বলেছেন প্রতিবার্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যিনি বার্তা পাঠাচ্ছেন তাকে অবশ্যই পেতে হবে প্রতিবার্তা। এটা না পেলে তিনি বুঝতে পারবেন না বার্তার প্রতিক্রিয়া। ফলে জ্ঞাপন হবে অসম্পূর্ণ। উদাহরণ দিয়ে

বলা যায় একজন তার বন্ধুকে বলল চলো একটি সিনেমা দেখে আসি। বন্ধুটি যদি কোন উত্তর না দেয় তাহলে ধরে নিতে হবে জ্ঞাপন সার্থক হয়নি। স্ক্রামের মডেলের প্রধান উদ্দেশ্যই হলো ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানে মধ্যে অর্থবহ জ্ঞাপনকে প্রতিষ্ঠা করা।

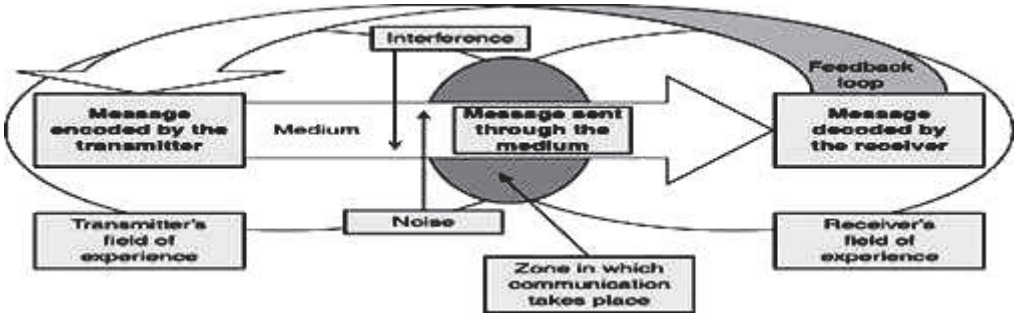

ছবি সৌজন্যে - The Schramm Model of Communication By- Jim Blyth

উপরের ছবিতে স্ক্রামের প্রবর্তিত মডেলের বিষয়বস্তু যথাযথ ভাবে উপস্থিত হয়েছে। বাঁ দিক থেকে ডান দিকে জ্ঞাপন যাচ্ছে। প্রথম খেপে মেসেজ এনকোড হচ্ছে। অর্থাৎ প্রেরক বার্তা তৈরি করছেন। তারপর তারা যাচ্ছে মাধ্যমে। দ্বিতীয় খেপে মাধ্যম মেসেজ পাঠাচ্ছে। এরপর তীর চিহ্ন এর মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে মেসেজ গিয়ে পৌঁছেছে গ্রহীতার কাছে। নিচের দিকে চারটি খোপ রয়েছে। বা দিকের দিকটি হলো প্রেরকের অভিজ্ঞতা, দ্বিতীয়টি হল বা চিহ্ন দিয়ে মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত। 'নয়েজ' কম হলে মেসেজ ভালোভাবে গিয়ে পৌঁছবে। আর নয়েস হলে জ্ঞাপনে বিঘ্ন ঘটবে। উপরে ইন্টারফারেন্স-এর একটি ছোট্ট খোপ দেখা যাচ্ছে, Noise হলে interference এর মাত্রা বাড়াতে পারে। একটি ডিমের আকৃতির ছবি দেখা যাচ্ছে যেটা ধরে রাখছে মাধ্যম দ্বারা মেসেজ পাঠানোর প্রক্রিয়াকে। এখানেও নয়েজ যুক্ত হয়ে আছে। আবার প্রেরকের যে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র তার সঙ্গেও নয়েজের যোগ থাকতে পারে। গ্রহীতা তার নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে মেসেজ গ্রহণ করছেন। এখানেও নয়েজের যোগ থাকতে পারে। রিসিভার ফিল্ড অফ এক্সপেরিয়েন্স এর যুক্ত হয়ে আছে ডিম্বাকৃতির নয়েজ এর সঙ্গে। অর্থাৎ নয়েজ প্রেরকের দিক থেকেও আসতে পারে। আবার গ্রহীতার সঙ্গেও তার যোগ থাকতে পারে। ছবিতে ফিডব্যাক লুপ দেখা যাচ্ছে। যেটা গ্রহীতা পাঠাচ্ছে প্রেরকের কাছে। একেবারে তলার দিকে একটি খোপে দেখানো হচ্ছে Zone in which Communication takes place, কীভাবে জ্ঞাপন ঘটছে তার সঙ্গেও নয়েজের যোগ থাকতে পারে।

স্ক্রাম এই মডেলে প্রতিক্রিয়ার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 'নয়েজ' যদি বেশি হয় প্রতিক্রিয়া পরিষ্কার বা স্পষ্ট হবে না। আবার নয়েজ কম হলে জ্ঞাপন সফল হবে। জ্ঞাপন ক্রিয়া বোঝার জন্য মডেলটির অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩.২.৬ গার্বনার মডেল (Gerbner Model)

জর্জ গার্বনার ১৯৫৬ সালে জ্ঞাপন ক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেন একটি মডেল এর মাধ্যমে। তিনি জ্ঞাপন ক্রিয়ার মধ্যে যে উপাদানগুলিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন সেগুলি হল উৎস (source), কোনো মাধ্যমের মধ্য

দিয়ে বিশেষ পরিস্থিতিতে উৎসের প্রতিক্রিয়া (The source reacts to the event in a situation through some channel), এক বিশেষ পরিস্থিতিতে ও প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু (Subject matter in a given situation and perspective) এবং জ্ঞাপন এর পরিণতি (Consequences of communication)।

গার্বনার জ্ঞাপন-এ বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জ্ঞাপন কেমন হবে তা অনেকাংশে নির্ভর করে এই দুটি বিষয়ের উপরে- প্রেরক বার্তা পাঠাচ্ছে এবং গ্রহীতা তা গ্রহণ করছে। এই দুটি বিষয় ঘটছে এক বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে। পরিস্থিতি তৈরি হয় একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটের আধারে। সংক্ষিপ্তকারে গার্বনার মডেলটি এই ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: কেউ একটি ঘটনাকে বুঝে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে এবং তা ঘটে একটি মাধ্যমকে আশ্রয় করে।

নিচে ছবির মাধ্যমে মডেলটি ব্যাখ্যা করা হলো :

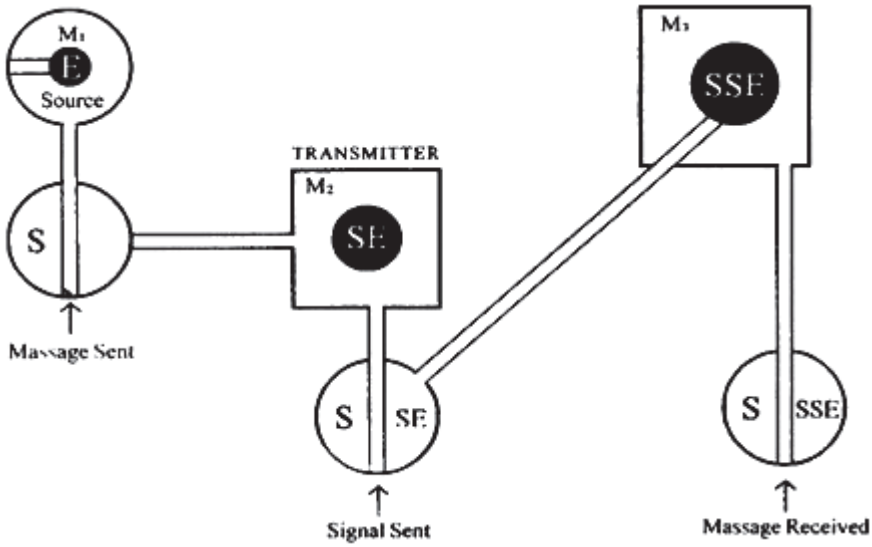

M1 হচ্ছে উৎস। M2 হল বাহক যন্ত্র আর M3 হল গ্রহীতা। E হল M এর দেখা ঘটনা। S হচ্ছে প্রেরিত সংকেত। যে এই বিবৃতি সম্পর্কে বলছে। SE হলো ঘটনা সম্পর্কে বিবৃতি। SSE হল প্রেরিত সংকেত যা বিবৃতি সম্পর্কে বলছে। SSEE হল সেই বার্তা যা গ্রহীতা উপলব্ধি করছে। এই মডেল শ্রাব্য এবং দৃশ্য, (Audio- Visual), জ্ঞাপন এর ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক। টেলিভিশনে যে অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় তা মডেল-এ উল্লেখিত প্রতিটি স্তরকেই ছুঁয়ে যায়। একটি ঘটনা সম্পর্কে যে বিবৃতি দর্শকের কাছে পৌঁছয় তা দর্শক মন দিয়ে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে। পরিস্থিতি ও প্রেক্ষিত এই দুই পরিস্থিতি জ্ঞাপনে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

৩.২.৭ সারাংশ

এখানে আলোচিত হয়েছে অ্যারিস্টটল মডেল, লাসওয়েল মডেল, ওসগুড মডেল, স্ক্রাম মডেল এবং গার্বনার মডেল। প্রত্যেক মডেলের নিজস্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। অ্যারিস্টটল মডেল সরলরৈখিক, প্রেরক ও গ্রহীতার মধ্যে

সম্পর্ক স্থাপন করে। এস এম সি আর মডেলের উৎস এখানে পাওয়া যায়। লাসওয়েল মডেলে দেখতে পাই আচরণবাদ, কীভাবে কে কাকে কী মাধ্যমে কি বলল তার পরিচয় করিয়ে দেয়, সাধারণ মানুষের উপর বক্তার কী প্রভাব। এভাবে জানা যাচ্ছে লাসওয়েল মডেল মানুষের আচরণে কীভাবে প্রভাব ফেলছে। ওসগুড মডেলে নয়েজ এবং ব্যক্তিত্বের প্রভাব কে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে জ্ঞাপন ক্রিয়ায় ব্যক্তির প্রভাব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নয়েজ কমতে থাকে।

স্ক্রাম মডেল হলো দ্বিমুখী চক্রাকার জ্ঞাপন ক্রিয়া। স্ক্রাম এনকোডিং এবং ডিকোডিং এর ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কীভাবে এনকোডিং হচ্ছে এবং তারপর কীভাবে অন্যজন ডিকোডিং করছে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্ক্রামের মতে এই জ্ঞাপন বিরামহীন অর্থাৎ চলতেই থাকে।

গার্বনার জ্ঞাপন এর মধ্যে যে উপাদানগুলোকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল উৎসের প্রতিক্রিয়া। এক বিশেষ পরিস্থিতিতে উপস্থিত হয়েছে বিষয়বস্তু এবং জ্ঞাপন এর পরিণতি। ছবি দিয়ে জ্ঞাপন প্রক্রিয়াটি বোঝানো হয়েছে।

৩.২.৮ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অ্যারিস্টটল মডেল কী?

২. এম এস আর সি কি রৈখিক মডেল?

৩. লাসওয়েল মডেল সংক্ষেপে লিখুন।

বড় প্রশ্ন

১. লাসওয়েল মডেলের সঙ্গে কি আচরণবাদের যোগ রয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।

২. ওসগুড মডেল আলোচনা করুন।

৩. স্ক্রাম মডেলটি ব্যাখ্যা করুন।

৪. জ্ঞাপন এ গার্বনার মডেলটি ব্যাখ্যা করুন এবং তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।

৩.২.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১) *Mass Communication Theory and Practice* : Uma Narula

২) *Communication Theory Today* : Edited by David Cowley and Devid Michel

৩) *গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী (অনুবাদ)* : মেলভিন এল দ্য ফ্ল্যার, সন্দ্রাবল রোকেশ (বাংলা একাডেমি ঢাকা)

৪) *জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম*, ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা)

৫) *আধুনিক গণমাধ্যম*, ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা)

একক ৩ ◘ বার্লো মডেল, শ্যানন ওয়েভার মডেল, দ্য ে ফ্ল্যর মডেল, দ্বি-স্তর প্রবাহ মডেল

গঠন

৩.৩.১ উদ্দেশ্য

৩.৩.২ বার্লো মডেল

৩.৩.৩ শ্যানন ওয়েভার মডেল

৩.৩.৪ দ্য ফ্ল্যর মডেল

৩.৩.৫ দ্বি-স্তর প্রবাহ মডেল

৩.৩.৬ সারাংশ

৩.৩.৭ অনুশীলনী

৩.৩.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৩.৩.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ার পরে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন

- বার্লো মডেল
- শ্যানন ওয়েভার মডেল
- দ্য ফ্ল্যর মডেল
- দ্বি-স্তর প্রবাহ মডেল

৩.৩.২ বার্লো মডেল (Berlo Model)

Berlo Model SMCR মডেল জ্ঞাপন পদ্ধতিকে খুব সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করে। মাত্র চারটি উপাদান পাওয়া যায় এই মডেলে। অবশ্য বিভিন্ন বিষয়ে এই উপাদানগুলি কে প্রভাবিত করে। এই মডেলের প্রধান বিষয়গুলি হল জ্ঞাপন এর সাফল্যের জন্য যেটা সবচেয়ে প্রয়োজন তাহলো প্রেরক এবং গ্রহীতা দু'জনকেই একটা সাধারণগ্রাহ্য মাত্রা বুঝতে হবে। দুঃখের কথা বললে বুঝতে হবে দুঃখ এবং আনন্দের বিষয় কে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে।

David Berlo ১৯৬০ সালে এই মডেলটির অবতারণা করেন। জ্ঞাপনে তিনি চারটি উপাদানের কথা বলেছেন। এগুলি হল উৎস (source), বার্তা (message), মাধ্যম (channel) এবং গ্রহীতা (receiver)। Berlo র মতে মাধ্যমের কাজ পাঁচটি ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্পন্ন হয়। এগুলি হল দেখা (seeing), কানে শোনা (hearing), স্পর্শ (touching), গন্ধ (smelling) এবং স্বাদ (testing)। উৎস এবং গ্রহীতার ক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাব-এর ব্যাপারে বার্লো বলেছেন বিশেষ কতগুলি বিষয় জড়িয়ে রয়েছে এক্ষেত্রে। এগুলি হল জ্ঞাপন দক্ষতা (Communication

skills), দৃষ্টিভঙ্গি (attitude), জ্ঞান (Knowledge), সামাজিক অবস্থা (Social system) এবং সংস্কৃতি (Culture)। বার্তার ক্ষেত্রেও কতগুলি বিষয় বিবেচিত হয়, এবং এগুলি আবার তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এই বিষয়গুলো হলো উপাদান (Element), গঠন (Structure), বিষয়বস্তু (content), প্রয়োগ (treatment) এবং সংকেত (code)।

মডেলটির সংরূপ হলো এই রকম :

S----------M----------C----------R

বিস্তারিতভাবে মডেলটিকে এইভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে :

উৎস----------বার্তা----------মাধ্যম----------গ্রহীতা প্রভাব

জ্ঞাপন দক্ষতা	উপাদান	দেখা	জ্ঞাপন দক্ষতা
দৃষ্টিভঙ্গি	গঠন	শোনা	দৃষ্টিভঙ্গি
জ্ঞান	বিষয়বস্তু	স্পর্শ	জ্ঞান
সামাজিক অবস্থা	প্রয়োগ	গন্ধ	সামাজিক অবস্থা
সংস্কৃতি	সংকেত	স্বাদ	সংস্কৃতি

Berlo তার মডেল এর মধ্যে দিয়ে মনস্তাত্ত্বিকও, সমাজতাত্ত্বিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। যে বার্তা পাঠাচ্ছে এবং যে গ্রহণ করছেন দুজনেরই দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক অবস্থান ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল প্রভাব বিস্তার করছে জ্ঞাপন ক্রিয়ার ওপরে। Berlo র সবচেয়ে বড় অবদান হলো প্রভাব (effect) এর পর্যালোচনা। তার বক্তব্য ছিল শ্রোতা এবং দর্শকের ওপরে প্রত্যেক কোন না কোন প্রভাব আছে। সে প্রভাব ইতিবাচক অর্থাৎ আনন্দের হতে পারে, আবার নেতিবাচক অর্থাৎ দুঃখের হতে পারে।

৩.৩.৩ শ্যানন্ ওয়েভার মডেল (Shannon Weaver Model)

১৯৫৯ সালে C.E Shannon এবং Warren Weaver জ্ঞাপন প্রক্রিয়াকে একটি মডেলের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেন। এই দুজনেই ছিলেন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। নিউইয়র্ক এর বেল ল্যাবরেটরীতে ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তারা এই মডেলটি তৈরি করেন।

এতে রয়েছে তথ্যের উৎস (Source of information), প্রেরক (transmitter), গ্রহীতা (receiver) এবং সবশেষে রয়েছে গন্তব্য স্থল (destination)। এদের মতে জ্ঞাপন ক্রিয়া চলে বাম দিক থেকে ডান দিকে। একদম বাঁদিকে থাকছে তথ্যের উৎস, তারপর থাকছে প্রেরক, তারপর গ্রহীতা এবং একেবারে ডানদিকে থাকছে গন্তব্য স্থল। প্রেরকের থেকে সংকেত যাচ্ছে গ্রহীতার কাছে তারপর তা চলে যাচ্ছে গন্তব্যস্থলে।

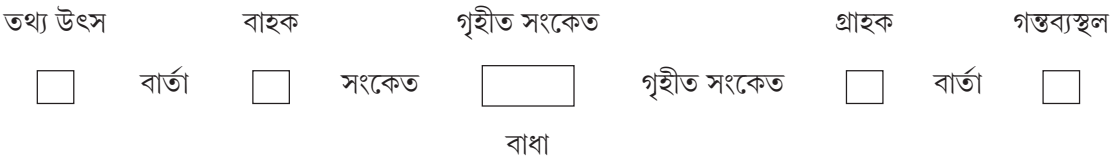

তথ্য উৎস   বাহক   গৃহীত সংকেত   গ্রাহক   গন্তব্যস্থল

☐ বার্তা ☐ সংকেত ☐ গৃহীত সংকেত ☐ বার্তা ☐

বাধা

প্রথমে তথ্যের উৎস থেকে প্রেরকের কাছে বার্তা আসছে। এরপর প্রেরক ঠিক করছেন কীভাবে সেই বার্তা প্রেরিত হবে। মাধ্যম নির্বাচন করে তিনি বার্তা পাঠাচ্ছেন। প্রেরকের মাধ্যমে বার্তা সংকেতের রূপ পাচ্ছে। সংকেত পাচ্ছেন গ্রহীতা এবং এরপর তা গন্তব্যস্থলে চলে যাচ্ছে। বার্তা পাঠাবার সময় সংকেত এর সঙ্গে যুক্ত হয় বাধা বা নয়েজ। গ্রহীতা এই নয়েজ যুক্ত সংকেত পান। এই সংকেত অনিবার্যভাবে বিকৃত হয়। প্রেরক চাইছেন না কিন্তু নয়েজ তৈরি হচ্ছে। এতে সংকেত বুঝতে অসুবিধা হয়।

প্রযুক্তিগত উন্নতির কথা বিবেচনা করেই এই মডেল তৈরি হয়েছে। প্রযুক্তি বার্তা প্রেরণের চরিত্র পাল্টে দিয়েছে। এভাবেই তৈরি হয়েছে নয়েজ। টেলিফোনে বেতারে বার্তা প্রেরণের সময় ফ্রিকোয়েন্সিতে নয়েজ তৈরি হতে পারে। যেমন ফ্রিকোয়েন্সিতে যদি কোনো তারতম্য ঘটে তাহলে তৈরি হতে পারে নয়েজ। এটা হল technical নয়েজ। আবার ঘটতে পারে Semantic নয়েজ। গ্রহীতা বার্তা বুঝতে পারছে না। কারণ ভাষা, সংস্কৃতি বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বক্তা যা বলতে চাইছেন শ্রোতা যদি না বুঝতে পারেন তাহলে ঘটে Semantic Noise। জাপানি ভাষা না জানলে একজন ভারতীয় জাপানির কথা বুঝতে পারবেন না।

অনেক সময় কথাবার্তা ও আলোচনার সময় এইরকম বাধার সৃষ্টি হয় লেখা ও ছবির ক্ষেত্র এইরকম ঘটনা ঘটতে পারে।

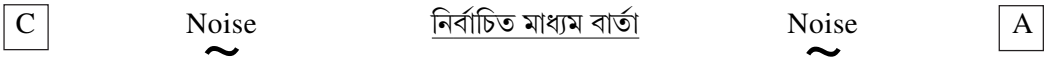

C   Noise ~   নির্বাচিত মাধ্যম বার্তা   Noise ~   A

উপরের ছবিতে C হচ্ছে প্রেরক এবং বার্তা যাচ্ছে A এর কাছে। A হচ্ছে অডিয়েন্স যে বার্তাটি গ্রহণ করছে। প্রেরকের কাছে বার্তা ছাড়ার পর নয়েজ তৈরি হচ্ছে। মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যখন বার্তা শ্রোতার কাছে পৌঁছায় তখন আবার তার মধ্যে নয়েজ থাকছে। শ্রোতার কাছে বার্তা কতটা বোধগম্য হচ্ছে তা বিবেচনা করে শ্রোতার বা অডিয়েন্সের শ্রেণী বিভাজন করা যায়। নিচের ছবিতে বিষয়টা এভাবে উপস্থিত করা যায়।

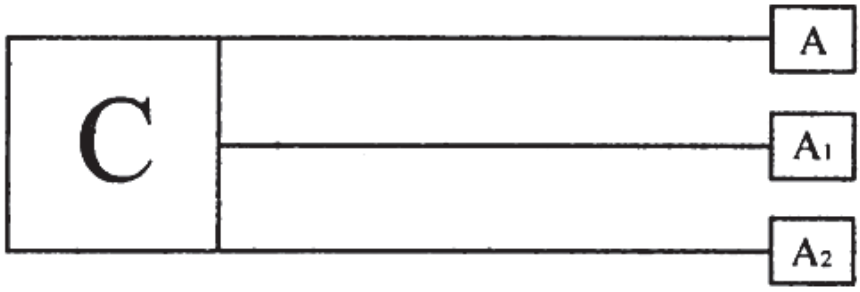

Noise মাধ্যমে

এখানে আমরা দেখাচ্ছি অডিয়েন্স বা শ্রোতা তিন ধরনের- A, A1, A2। C or communicator যে বার্তা পাঠাচ্ছ তা A পরিস্কারভাবে বোঝে। A1 কিছুটা বোঝে আর A2 কিছুই বোঝেনা। তিন শ্রেণীর শ্রোতার কাছে একই বক্তব্য তিন ভাবে উপস্থিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একটি সভায় বক্তা যা বলছেন, একশ্রেণীর শ্রোতা তা ভালোভাবে বুঝতে পারেন। কিছু শ্রোতা কিছুটা বুঝতে পারেন আবার কিছু শ্রোতার কাছে বক্তব্য একেবারে বোধগম্য নাও হতে পারে।

মাধ্যমের মধ্যে কতখানি নয়েজ আছে তার ওপর নির্ভর করছে কী রকম প্রতিক্রিয়া হবে। যে বুঝবে তার প্রতিক্রিয়া হবে এক রকম আর যে বুঝবে না তার প্রতিক্রিয়া অবশ্যই হবে অন্যরকম। প্রতিবার্তার বিষয়টি অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে প্রতিক্রিয়ার চরিত্র। কমিউনিকেটর বুঝতে পারবেন তার পাঠানো বার্তার প্রতিক্রিয়া এবং সৃষ্টির ক্ষমতা আদৌ ঠিক কতটা।

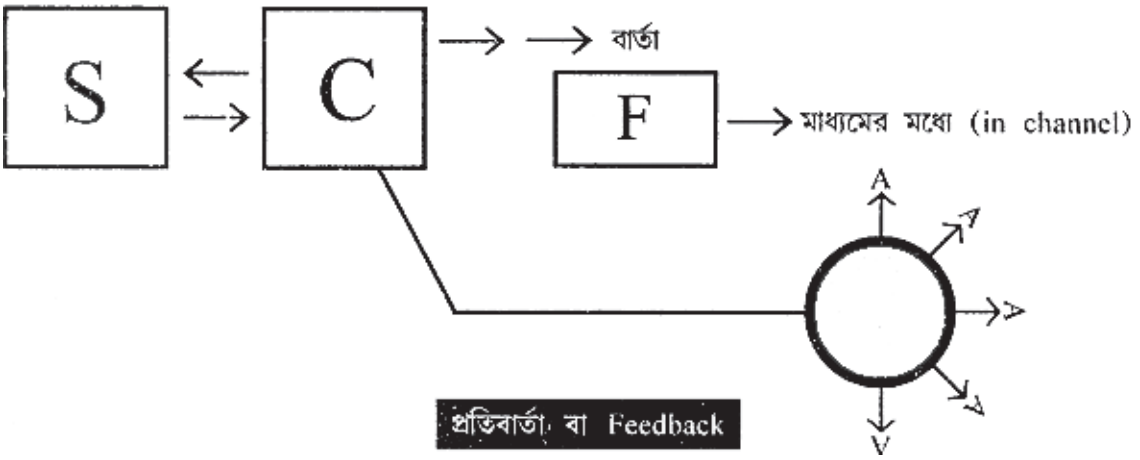

ছবিতে বিভিন্ন রকমের প্রতিবার্তা দেখানো হচ্ছে। বিভিন্ন শ্রোতার কাছে একটি বার্তা নানাভাবে উপস্থিত হচ্ছে। প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী প্রতিবার্তার তারতম্য ঘটছে। A হচ্ছে মাধ্যমের মধ্যে অপর যে কমিউনিকেটর যা জ্ঞাপন ক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে। অনেক সময় দেখা যায় এই অতিরিক্ত মাধ্যম প্রভাবের জন্য বার্তা অন্য মাত্রা পায় এবং শ্রোতার কাছে এই মাত্রা অন্যভাবে বার্তাকে উপস্থিত করে তাই একই বার্তা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শ্রোতার কাছে পৌঁছায়।

৩.৩.৪ দ্য ফ্ল্যর মডেল (DeFleur Model)

Melvin Lawrence De Fleur এই মডেলটি Shannon Weaver এবং Westley Maclean মডেলের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করেছিলেন। প্রেরক থেকে গ্রাহক এবং পুনরায় গ্রাহক থেকে প্রেরকের মধ্যে যে বৃত্তাকার জ্ঞাপন চলে তাকেই ব্যাখ্যা করে এই মডেল।

Mass media device এর কথা উল্লেখিত হয়েছে এই মডেলে। এই মডেল বৃত্তাকারভাবে চলে। প্রেরক বার্তা পাঠাচ্ছে গ্রহীতার কাছে। আর গ্রহীতা তার প্রতিক্রিয়া প্রতিবার্তার আকারে প্রেরকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। এভাবেই

চলছে বৃত্তাকার প্রক্রিয়া। এখানে আমরা পাই দ্বিমুখী প্রতিবার্তা প্রক্রিয়া (two way feedback process)। প্রেরক একটি বার্তা পাঠান সেই বার্তা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া সমন্বিত প্রতিবার্তা পাঠিয়ে দিল। এই প্রতিবার্তা পেয়ে প্রেরক আবার বার্তা পাঠাচ্ছে এভাবেই চলছে বৃত্তাকার জ্ঞাপন।

Shannon Weaver মডেল একমুখী জ্ঞাপন-এর কথা বলেছে। সেখানে নয়েজ এর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Westley এবং Maclean মডেল দ্বিমুখী জ্ঞাপন এর কথা বলেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এই মডেলের সর্বপ্রথম Linear Feedback-এর কথা উল্লেখ করা হলো। বার্তা শুধু প্রতিবার্তা তৈরি করছে না নতুন, প্রেক্ষিতে প্রেরকের কাছে ফিরে আসছে এবং তৈরি করছে আবার নতুন প্রেক্ষিত, যা বারবার তার চেহারা বদলে দিচ্ছে। বৃত্তাকারে চলছে এই জ্ঞাপন। এই মডেলের নয়েজ থাকছে কেন্দ্রে। যে কোনো পর্যায়ে নয়েজ ঘটতে পারে।

De Fleur destination কে জ্ঞাপন এর স্বতন্ত্র পর্যায় বলে বর্ণনা করেছেন।

De Fleur এর আরও একটি সুপারিশ হল জ্ঞাপন এ থাকবে ফিডব্যাক ডিভাইস, এই ডিভাইস এর লক্ষ্য শ্রোতাকে একেবারে স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করে। যে কোনো ব্যবসায়িক কার্যক্রমে লক্ষ্য শ্রোতার গুরুত্ব অপরিসীম (target audience)। সাধারণ শ্রোতার যে লক্ষ্য শ্রোতার গুরুত্ব অনেক বেশি। এই অবস্থায় সহজেই অনুমেয় লক্ষ্যশ্রোতা যে প্রতিবার্তা পাঠাবে তা জ্ঞাপন ব্যবস্থাকে আরও গভীরভাবে প্রভাবিত করবে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ফিডব্যাক এবং টার্গেট অডিয়েন্স। যে বার্তা যাচ্ছে এবং যে প্রতিবার্তা তৈরি হচ্ছে এবং সেই প্রতিবার্তা ফিরে এসে আবার পুনরায় বার্তা কে যেভাবে গড়ে তুলছে তার গুরুত্ব অপরিসীম। বিজ্ঞাপনে এই মডেলের প্রাসঙ্গিক তা বেশি।

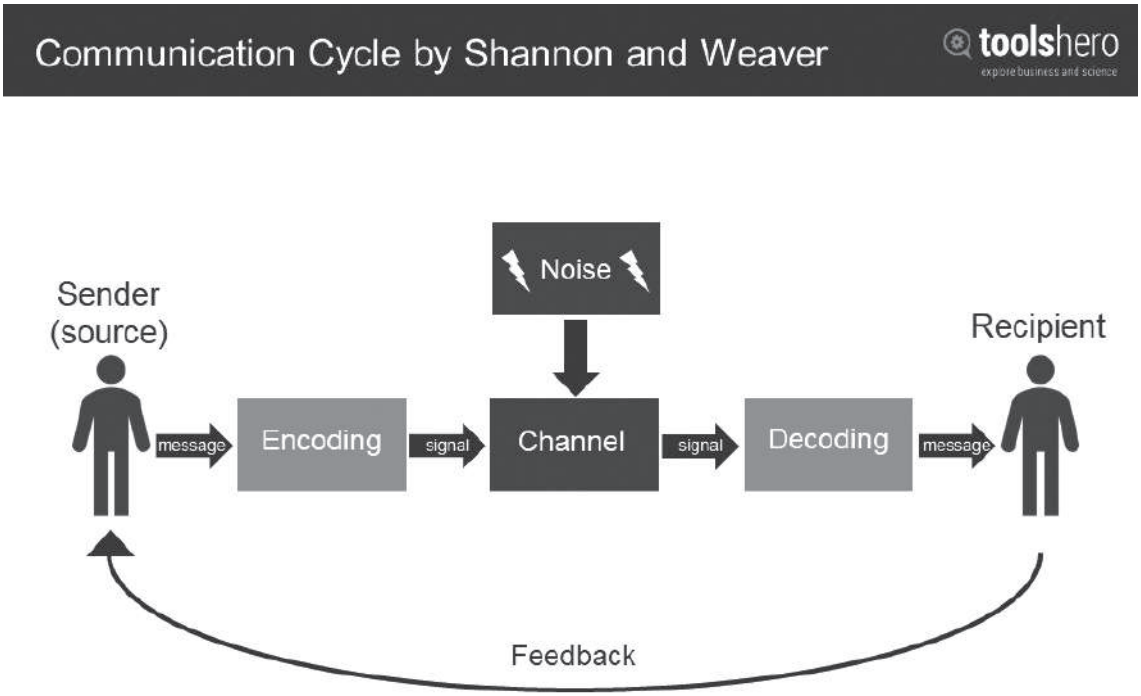

৩.৩.৫ দ্বি-স্তর প্রবাহ মডেল

দ্বি-স্তর প্রবাহ তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছিল ১৯৪০ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্র একেবারে পাল্টে যায়। শুরু হয় দ্বিমেরু রাজনীতি অথবা বাইপোলার পলিটিক্স। আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমী দেশগুলির জোট বাঁধে। রাশিয়া নেতৃত্বে ইউরোপের দেশগুলি নিয়ে তৈরি হয় সমাজতান্ত্রিক শিবির। শুরু হয় ঠান্ডা যুদ্ধ। যার ভিত্তি মতাদর্শের লড়াই। সাম্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরোধ গোটা বিশ্বের রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই জটিল অবস্থায় গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা জনগণের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব ও গভীরভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। মানুষের মতামত বোঝার জন্য Paul Lazarsfeld, Bernerd Berelson এবং Hazel Gaudet গবেষণা শুরু করেন। এই প্রচেষ্টার ফলেই তৈরি হয় দ্বি-স্তর প্রবাহ তত্ত্ব (Two step flow theory)। তাঁরা Elihu Katz এর সঙ্গে যৌথ গবেষণায় গণমাধ্যমের প্রভাবকে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। বুলেট তত্ত্বকে অস্বীকার করে তৈরি করেন দ্বি-স্তর তত্ত্ব। বুলেট তত্ত্বের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যা মিডিয়া বলবে তাই মানুষের মনে বুলেটের মতো গেঁথে যাবে। Lazarsfeld রা দেখলেন গণমাধ্যমের বার্তা সরাসরি বুলেটের মতো জনগণের কাছে পৌঁছচ্ছে না। গণমাধ্যমের বার্তা প্রথমে যাচ্ছে ওপিনিয়ন লিডারদের কাছে। তারপর তা যাচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে অর্থাৎ গণমাধ্যমের বার্তা দুটি স্তর পেরিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে যাচ্ছে ওপিনিয়ন লিডারদের কাছে। যেমন শিক্ষক ডাক্তার উকিলরা গণমাধ্যমের বার্তাকে ব্যাখ্যা করছেন সাধারণ মানুষের কাছে। এই ব্যাখ্যার যথেষ্ট প্রভাব পড়ছে সাধারণ মানুষের উপরে। নির্বাচনের সময় বিষয়টি আরও ভালোভাবে বোঝা যায়। ওপিনিয়ন লিডাররা সাধারণ ভোটারদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেন। এখানে সাধারণ জনগণ Passive হয়ে যায়। ওপিনিয়ন লিডাররা যা বলেন তার দ্বারা প্রভাবিত হন। এই তথ্য কিন্তু সমালোচনার উর্ধে নয়।

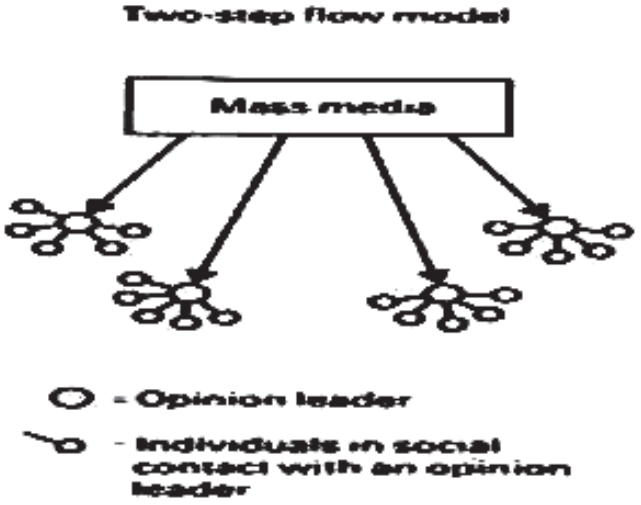

Deutschman ও Danielson বলেছেন যে দ্বি-স্তর তত্ত্ব কিন্তু শেষ কথা হতে পারে না। প্রাথমিক পর্যায়ে তার কিছুটা গুরুত্ব থাকলেও মানুষের আচরণকে পুরোপুরি প্রভাবিত করতে পারে না। সবসময়ই গণমাধ্যম এর তথ্য ওপিনিয়ন লিডারদের মারফত হয় না। অনেক সময় সরাসরিও পৌঁছে যায়।

উপরন্তু Everett Roger's এর Difusion of Innovation তত্ত্ব একটি সমীক্ষার কথা উল্লেখ করেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে দুই তৃতীয়াংশ মানুষ জানাচ্ছেন তারা গণমাধ্যমের দ্বারাই সচেতন হয়েছেন। ফেস টু ফেস জ্ঞাপন এর কোন ভূমিকাই সেখানে ছিল না।

৩.৩.৬ সারাংশ

এই পর্যায়ে যে মডেলগুলো আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বার্লো মডেল, শানোন ওয়েভার মডেল, দ্য ফ্লোর মডেল এবং কাটজ এবং লাজারফেল্ডের দ্বি-স্তর প্রবাহ তত্ত্ব। বার্লো জ্ঞাপন ক্রিয়ায় যে বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছেন সেগুলি হল জ্ঞাপন দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞান, সামাজিক অবস্থা ও সংস্কৃতি। এগুলি জ্ঞাপনে যুক্ত মানুষদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। শানোন ওয়েভার জ্ঞাপন প্রক্রিয়ায় একটি অতিরিক্ত বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বিষয়টি হলো noise, যা প্রতিনিয়ত জ্ঞাপন কে প্রভাবিত করে। এর ফলে একটি অভিনব মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এই noise এর জন্য শ্রোতারা কোন বিষয়কে একেক রকম ভাবে দেখে। কেউ বোঝে, কেউ সামান্য বোঝে, আবার কেউ কিছুই বোঝেনা।

দ ফ্লোর যে মডেলটির অবতারণা করেন তার ভিত্তি ছিল বার্লো এবং শ্যানন ওয়েভার মডেল। দ্য ফ্লোর একটি বৃত্তাকার জ্ঞাপন প্রক্রিয়ায় উল্লেখ করেছেন যা বার্তায় আসা-যাওয়া কে উল্লেখ করে। একটা দ্বিমুখী প্রতিবার্তা প্রক্রিয়া ফুটে ওঠে আমাদের সামনে। এই প্রক্রিয়ায় noise থাকছে কেন্দ্রে। সুতরাং যে কোন পর্যায়ে এই noise একটা বিঘ্ন ঘটাতে পারে।

এরপর আসে কাটজ এবং লাজারফেল্ড এর দ্বিস্তর প্রবাহ তত্ত্ব। এই দুই জ্ঞাপনবিদ মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে এই মডেলটি তৈরি করেছিলেন। এই গবেষণায়ে ওপিনিয়ন লিডাররা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন। লাজারফেল্ড-এর গবেষণার প্রধান বক্তব্য ছিল গণমাধ্যমের বার্তা সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছয় না। ওপিনিয়ন লিডাররের মাধ্যমে তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। এই হল দ্বিস্তর প্রবাহ। প্রথমে প্রবাহ আসছে ওপিনিয়ন লিডারদের কাছে। তারপর তা যাচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে। কাটজ পারস্পরিক জ্ঞাপন-এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ওপিনিয়ন লিডার এবং সাধারণ মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ দ্বিস্তর প্রবাহ তত্ত্বকে শক্তিশালী করেছিল।

৩.৩.৭ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. দ্বি-স্তর প্রবাহ কী?

২. বার্লো মডেলটি সংক্ষেপে লিখুন?

বড় প্রশ্ন

১. শ্যানন ওয়েভারের মডেলে অতিরিক্ত কী বিষয় পাই?

২. দ্য-ফ্ল্যর মডেলটি ব্যাখ্যা করুন?

৩. কার্জ এবং লাজারফেল্ডের মডেলটি আলোচনা করুন?

৩.৩.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১) *Mass Communication Theory and Practice,* Uma Narula

২) *Communication Theory Today* : Edited by David Cowley and Devid Michel

৩) *গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী* (অনুবাদ) : মেলভিন এল দা ফ্ল্যার, সন্দ্রাবল রোকেশ (বাংলা একাডেমি, ঢাকা)

৪) *জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম,* ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

৫) *গণজ্ঞাপন,* ড: পার্থ চট্টোপাধ্যায়

একক - ৪ ◘ নিউকম্ব মডেল, ওয়েসলি এবং ম্যাকলিন মডেল, ডান্স মডেল

গঠন

৩.৪.১ উদ্দেশ্য

৩.৪.২ নিউকম্ব মডেল

৩.৪.৩ ওয়েসলি এবং ম্যাকলিন মডেল

৩.৪.৪ ডান্স মডেল

৩.৪.৫ সারাংশ

৩.৪.৬ অনুশীলনী

৩.৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৩.৪.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ার পরে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন

- নিউকম্ব মডেল
- ওয়েসলি এবং ম্যাকলিন মডেল
- ডান্স মডেল

৩.৪.২ নিউকম্ব মডেল (NewComb Model)

লাসওয়েল, গার্বনার, শ্যানন ওয়েভার যে মডেলগুলির অবতারণা করেছিলেন তা ছিল প্রধানত রৈখিক মডেল। কিন্তু থিওডোর নিউকম্ব যে মডেল দিলেন তার চরিত্র আগের মডেলগুলো থেকে একেবারে আলাদা। সামাজিক প্রেক্ষায় তিনি জ্ঞাপন এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন। সামাজিক সম্পর্ক জ্ঞাপনে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এটা প্রমাণ করাই ছিল নিউকম্ব মডেল এর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। এই মডেল বলে সমাজে ভারসাম্য রাখতে জ্ঞাপন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। A এবং B হল যথাক্রমে প্রেরক ও গ্রহীতা। প্রেরক ও গ্রহীতার ভূমিকায় ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান পরিচালন গোষ্ঠী এবং জনগণও থাকতে পারে।

X হল প্রেরক এবং গ্রহীতার সামাজিক পরিবেশ। ABX হলো একটি ব্যবস্থা যার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে।

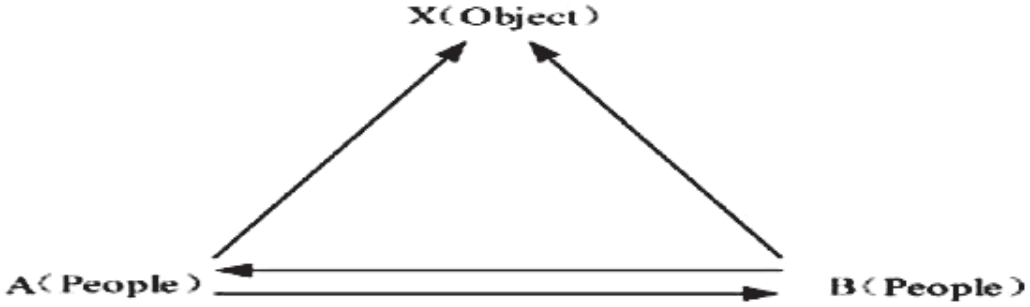

যদি A পরিবর্তিত হয় তাহলে X এবং B ও পরিবর্তিত হবে। অন্যভাবে বলা যায় এ যদি এক্স এর সঙ্গে তার সম্পর্ক বদলায়, তাহলে B ও X এর সঙ্গে সম্পর্কও বদলাতে হবে। এর অর্থ এবং দুয়ের মধ্যে রয়েছে বন্ধুত্ব যা X কে প্রভাবিত করছে। লক্ষ্য করতে হবে এর মধ্য দিয়ে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার একটা প্রচেষ্টা রয়েছে। আবার এমনও হতে পারে A কে পছন্দ করে X কিন্তু B কে করে না। এমন অবস্থায় A এবং B কি অনেক ভেবেচিন্তে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। এই যোগাযোগের অন্যতম লক্ষ্য থাকবে X এর সঙ্গে সহমত বজায় রেখে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা। X এর প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা পর্যন্ত A এবং B কে নিজেদের মধ্যে জ্ঞাপন চালাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ A হতে পারে ব্যাংক কর্মচারীদের ইউনিয়ন। B হতে পারে সরকার এবং X সরকারি নীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। যেমন ব্যাংকের বেসরকারিকরণ। যদি A এবং B পরস্পরকে পছন্দ করে তাহলে X সম্পর্কে একমত হওয়ার জন্য তারা সহজেই আলোচনা চালিয়ে সহমতে আসার চেষ্টা করবে। আবার A এবং B এর মধ্যে যদি ভালো সম্পর্ক না থাকে তাহলে X সম্পর্কে সহমত হবার জন্য A এবং B মধ্যে প্রয়াস নিতে হবে। আলোচনার মাধ্যমেই সহমতের সূত্র খুঁজে বার করার চেষ্টা করতে হবে। ভারসাম্য বজায় রাখাই হল প্রধান লক্ষ্য। নিউকম্ব মডেল এই ভারসাম্য রক্ষার ওপরে বেশি করে গুরুত্ব আরোপ করেছে।

৩.৪.৩ ওয়েসলি এবং ম্যাকলিন মডেল (Westley and MacLean Model)

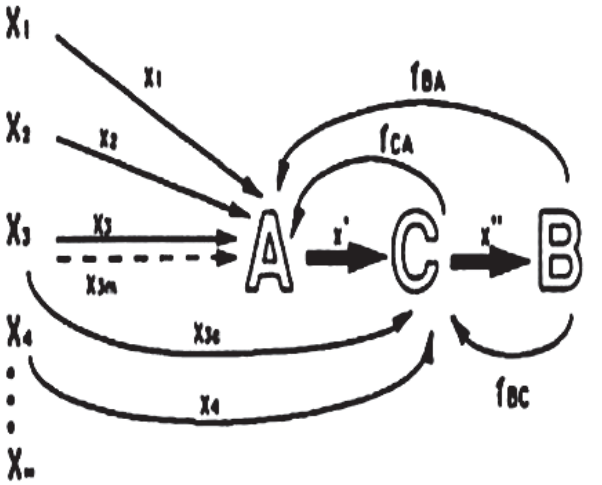

B.H. Westley এবং M.M. MacLean ১৯৫৭ সালে এই মডেলটি পরিবেশন করেছিলেন। জ্ঞাপন কী এবং তার মধ্যে যে আন্তঃ সম্পর্ক আছে তা প্রমাণ করাই ছিল এই মডেলটির উদ্দেশ্য। মডেলটিকে ABX মডেল বলে বর্ণনা করা হয়। যেখানে X হলো বিষয়, A হল প্রেরক এবং B হল গ্রহীতা।

বিভিন্ন উৎস থেকে উপকরণ নিয়ে A নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বার্তা তৈরি করছে। তারপর সেই বার্তা পাঠাচ্ছে B কে। B বার্তা গ্রহণ করে প্রতিবার্তার মাধ্যমে তার প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে। এই প্রতিবার্তা তৈরীর সময় B এর মনস্তাত্ত্বিক গঠন প্রতিবার্তাকে প্রভাবিত করছে। X বিষয়ে বিভিন্ন সূত্র থেকে উঠে আসছে উপাদান। অর্থাৎ সূত্রের ক্ষেত্র এখন অনেক বড়। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া যায় বিভিন্ন উপাদান। এই উপাদান গুলোর সাহায্যে A এক বিশেষ আর্থসামাজিক অবস্থানের মধ্যে দাঁড়িয়ে বার্তা তৈরি করে। জার্মান দার্শনিক কান্ট বলেছিলেন সমস্ত কিছুই আমরা দেখি আমাদের ধ্যান-ধারণা দিয়ে (We see everything with our own perception)। কান্টের মন্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক। A বার্তা তৈরীর সময় X1, X2, X3 এবং X4 সূত্র থেকে উপকরণ নিচ্ছে। তারপর নিজের ধ্যান ধারণা অনুযায়ী এইসব উপকরণকে বার্তা তৈরীর কাজে লাগাচ্ছে। আবার B এই বার্তা গ্রহণ করছে নিজের বিচার-বুদ্ধির প্রেক্ষিতে। A এবং B এর ধারণা ও বিচার বুদ্ধি উঠে আসছে পরিবেশ থেকে। B কতটা পরিবর্তিত হবে তা নির্ভর করছে B- এর নিজস্ব ধারণার ওপরে। XB হলো B এর নিজস্ব ধারণা সূত্র। A এর মত B আরো কিছু সূত্র রয়েছে। এই সূত্র গুলি B এর গ্রহণ ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। পরিবেশ থেকে উঠে আসা XB সূত্রগুলি নির্ধারণ করে B এর প্রতিবার্তা কী রকম হবে। এই প্রতিবার্তা A যেমন চাইছে সেরকম নাও হতে পারে। B এর কাছ থেকে যে প্রতিবার্তা আসছে তা হল FBA, এই FBA বিচার করলে বোঝা যাবে B কিভাবে A-র বার্তা গ্রহণ করছে। এবং সেই বার্তা কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে B-র মধ্যে।

পরে এই মডেলে C কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। C গেটকিপার এর ভূমিকা নেয়। জ্ঞাপনবিদ লিউইন (Lewin) C কে নিয়ে আসেন গেটকিপারের বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। গণমাধ্যমের দ্বারা যে জ্ঞাপন হচ্ছে সেখানে C এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গণমাধ্যমের প্রসার যত ঘটছে তত C এর অস্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। প্রতিবার্তা A সরাসরি যায় না। C এর কাছ থেকে তা গ্রহণ করতে হয়। B এর প্রতিবার্তা যায় C এর কাছে। তারপর তা চলে যায় A এর কাছে।

৩.৪.৪ ডান্স মডেল (Dance Model)

ফ্রাঙ্ক ডান্স (Frank Dance) ১৯৬৭ সালে এই মডেলটি উপস্থাপন করেছিলেন। ডান্স এর বক্তব্য ছিল জ্ঞাপন সর্বদাই মানবিক। জ্ঞাপন যদি মানবিক হয় তাহলে তা কখনই থামে না। চক্রাকারে চলতে থাকে। ডান্স বলেছেন এই বিরামহীন প্রক্রিয়া চলতে থাকে চক্রাকারে এক স্তর থেকে আরেক স্তরে।

এই মডেলে ডান্স দেখিয়েছেন জ্ঞাপন এর কোন নির্দিষ্ট শুরু বা শেষ নেই। চক্রাকারে জ্ঞাপন প্রক্রিয়া চলে। নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে জ্ঞাপন ক্রিয়া আবদ্ধ থাকে না। এখন যা ঘটছে তার সঙ্গে আগে ঘটে যাওয়া জ্ঞাপন এর যোগ রয়েছে। ঠিক একইভাবে বর্তমান জ্ঞাপন ক্রিয়া ভবিষ্যৎ জ্ঞাপন ক্রিয়াকে প্রভাবিত করবে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে চক্রাকারে পিছিয়ে নিচের দিকে ক্রমশ ছোট হয়ে নেমে এসেছে।

জ্ঞাপন সবসময়ই খুব সহজ সরল ব্যাপার নয়, নানান বিষয় প্রভাবিত করে জ্ঞাপনক্রিয়াকে। জ্ঞাপনের গতি এই জটিলতাকে প্রতিষ্ঠা করে। এটি প্রমাণ করে যে ক্রিয়া সর্বদাই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলছে। প্রতি স্তরে জ্ঞাপন উন্নত হচ্ছে, বিকশিত হচ্ছে। একটি জ্ঞাপন থেকে উদ্ভূত হচ্ছে অন্য একটি জ্ঞাপন এর ধারা। এভাবেই চলছে জ্ঞাপন এর ধারাবাহিকতা।

৩.৪.৫ সারাংশ

এই পর্যায়ে যে মডেলগুলো আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নিউকম্ব মডেল, ডান্স মডেল, ওয়েসলি এবং ম্যাকলিন মডেল।

৩.৪.৬ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. নিউকম্ব মডেল বলতে কী বোঝেন?

২. ডান্স মডেলটি কোন সালে পরিবেশিত হয় এবং এর উদ্দেশ্য কী?

বড় প্রশ্ন

১. ওয়েসলি এবং ম্যাকলিন মডেলটি আলোচনা করুন?

২. নিউকম্ব মডেলটি ব্যাখ্যা করুন?

৩. ডান্স মডেলটি বিশ্লেষণ করুন।

৩.৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১) *Mass Communication Theory and Practice,* Uma Narula

২) *Communication Theory Today,* Edited by David Cowley and Devid Michel

৩) *গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী (অনুবাদ)* : মেলদিন এল কি ফ্ল্যার, সন্দ্রাবল রোকেশ (বাংলা একাডেমি, ঢাকা)

৪) *জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম,* ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

৫) *গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি,* ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

৬) *Mass Communication Theory,* Denis McQuail

মডিউল-৪ ◘ জ্ঞাপন প্রভাব তত্ত্ব (Communication Effects Theory)

একক ১ ◘ ম্যাজিক বুলেট তত্ত্ব (Magic Bullet Theory), ব্যবহার এবং সন্তুষ্টি তত্ত্ব (Uses and Gratification Theory)

গঠন

৪.১.১ উদ্দেশ্য

৪.১.২ ম্যাজিক বুলেট তত্ত্ব (Magic Bullet Theory)

৪.১.৩ ব্যবহার এবং সন্তুষ্টি তত্ত্ব (Uses and Gratification Theory)

৪.১.৪ সারাংশ

৪.১.৫ অনুশীলনী

৪.১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৪.১.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ার পরে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন

- ম্যাজিক বুলেট তত্ত্ব (Magic Bullet Theory)
- ব্যবহার এবং সন্তুষ্টি তত্ত্ব (Uses and Gratification Theory)

৪.১.২ ম্যাজিক বুলেট তত্ত্ব (Magic Bullet Theory)

SR মডেল থেকে উঠে এসেছে ম্যাজিক বুলেট তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো জ্ঞাপন-এর বার্তা বুলেটের মত বিদ্ধ করে শ্রোতাদের। S অর্থাৎ সেন্ডার পাঠাচ্ছে R-কে অর্থাৎ রিসিভার-কে, এবং এই বার্তা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রহণ করছেন গ্রহীতা। এই হচ্ছে বুলেটের মতো বিদ্ধ হওয়া। হাইপোডার্মিক নিডেল মডেলের সঙ্গে এর মিল রয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই প্রোপাগান্ডা তৈরি হয়েছিল। যে-কোনো রাজনৈতিক বিষয়কে প্রচার করাই ছিল প্রপাগান্ডার উদ্দেশ্য। বিশ্বযুদ্ধের সময় অক্ষশক্তি (Axis Power) এবং মিত্র শক্তি (Alied Power) যে প্রোপাগান্ডা চালিয়ে ছিল তার মূলে ছিল এই বুলেট তত্ত্ব।

১৯৩০ সালে বিখ্যাত চিত্র নির্মাতা Orson Wells একটি ফেক নিউজ বুলেটিন তৈরি করেন। এই সংবাদ বুলেটিনে বলা হয় নিউ জার্সিতে এলিয়েনরা আক্রমণ করবে। The War of Worlds নামে একটি বেতার অনুষ্ঠানে এই ফেক নিউজ টি সম্প্রচারিত হয়। সম্ভবত মোট ১২ মিলিয়ন মানুষের কাছে খবরটি পৌঁছে ছিল। এর মধ্যে ৯ মিলিয়ন মানুষ

খবরটি বিশ্বাস করেছিল। এরপর হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল সারাদেশে। বুলেট তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে এই ঘটনাটিতে। শোনামাত্রই কিছু মানুষ বিশ্বাস করছে। মানসিক স্তরে বুলেটের মতো বিদ্ধ হয়েছে।

১৯৩৮ সালে লাজারফেল্ড এবং হার্টা হারজগ (Lazarfeld and Harta Hurzog) এই বুলেট নাটকের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে ছিলেন। ওদের সিদ্ধান্ত ছিল এই সম্প্রচার আমেরিকান মানুষের মধ্যে একটা প্যানিক নিঃসন্দেহে তৈরি করেছিল। তবে বেশিরভাগ মানুষের বিশ্বাস করেনি। অল্প কিছু মানুষ বিশ্বাস করেছিল।

১৯৪০ সালে লাজারফেল্ড 'People's Choice' নামে যে বইটি লেখেন সেখানে তিনি ম্যাজিক বুলেট তত্ত্বকে স্বীকার করেননি। বরং তিনি গণমাধ্যম বাহিত বার্তার চেয়ে পারস্পারিক জ্ঞাপন এর মধ্যে দিয়ে যে বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছয় তার ওপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

বুলেট তত্ত্বের মূল বিষয় হলো মানুষের মানসিক গঠনে সরাসরি প্রতিক্রিয়া তৈরি করা। মনস্তত্ত্বের আচরণবাদী স্কুলের ধারণা অনুযায়ী এই সম্পর্ক হলো সরলরৈখিক সম্পর্ক যা কেবলমাত্র উদ্দীপক এবং প্রত্যুত্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। গণমধ্যম বার্তার মধ্যে দিয়ে উদ্দীপনা তৈরি করছে। বার্তা পাবার পর মানুষ উদ্দীপিত হচ্ছে, এর অর্থ প্রভাবিত হচ্ছে।

সাম্প্রতিককালে এই তত্ত্বের গুরুত্ব নেই বললেই চলে। প্রথমে লাজারফেল্ড প্রমাণ করেছেন এর সীমাবদ্ধতা। তিনি গণমাধ্যম-এর চেয়ে পারস্পরিক জ্ঞাপন-এর ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এখন জ্ঞাপনে অনেক মাত্রা যোগ হয়েছে। জটিল সমাজ জীবনের প্রেক্ষাপট হয়ে উঠেছে বহুমাত্রিক। তবে বুলেটে তত্ত্ব SR সম্পর্ককে তুলে ধরে একটা নতুন মাত্রা সংযোজন করছিল সন্দেহ নেই। SR সম্পর্কে অনেক জটিলতা এসেছে, নানান বিষয় এই সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে। তবে এখনো কিন্তু এর গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েই কাজ করতে হয়।

৪.১.৩ ব্যবহার এবং সন্তুষ্টি তত্ত্ব (Uses and Gratification Theory)

ব্যবহার (Uses)

মানুষের কাছে গণমাধ্যমের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠেছে। এমনি এমনি তো কোন কিছু জনপ্রিয় হতে পারে না। নিশ্চয়ই কারণ আছে। এই কারণের মধ্যে অন্যতম হল গণমাধ্যম, যা ব্যবহার করে মানুষ উপকৃত হয়েছে এবং একই সাথে সন্তুষ্টিও পেয়েছে। এই ব্যবহার সন্তুষ্টির বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে ব্যবহার এবং সন্তুষ্টি তত্ত্ব Uses and Gratification Theory)।

সংবাদপত্র, বেতার এবং টেলিভিশন এর ব্যবহারিক গুরুত্ব আছে মানুষের কাছে। ছোটবেলা থেকেই গণমাধ্যম ব্যবহারের সঙ্গে মানুষ পরিচিত। এর মাধ্যমে জানা, শেখা উপভোগ করার মধ্যে দিয়ে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়।

গণমাধ্যম ব্যবহারের সুফল এবং কুফল দুটি দিকই আছে। গণমাধ্যম ব্যবহার করে মানুষ যখন শিক্ষিত হয়, আলোকিত হয়, তখন সেটা সুফল। আর শিশুরা যখন টেলিভিশন দেখে হিংসার প্রতি আকৃষ্ট হয় তখন সেটি হল কুফল। প্রতি ক্ষেত্রে গণমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকই থাকে।

গণমাধ্যমের ব্যবহার তিনটি স্তরে হতে পারে-

১) ব্যক্তিগত স্তরে ব্যবহার

২) পারিবারিক স্তরে ব্যবহার

৩) প্রকাশ্য স্তরে ব্যবহার

মানুষ যখন নিজের প্রয়োজনে গণমাধ্যম ব্যবহার করে তখন হলো ব্যক্তিগত স্তরে ব্যবহার। যেমন কেউ একা রেডিওতে গান শুনতে পারে। আবার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বসে বসবার ঘরে টেলিভিশনে অনুষ্ঠান দেখতে পারে। প্রথমটা ব্যক্তিগত স্তরে ব্যবহার এবং দ্বিতীয় টির ক্ষেত্রে ঘটছে পারিবারিক স্তরে ব্যবহার। আবার অনেক সময় প্রকাশ্যে ব্যবহার ঘটে। যেমন সিনেমা দেখা, অডিটোরিয়ামে গিয়ে সঙ্গীতানুষ্ঠান শোনা ইত্যাদি।

ইন্টারনেট মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মোবাইলে, আইপ্যাডে নিজের পছন্দমাফিক ব্যবহারের পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। গান শোনা, সিনেমা দেখা, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ টুইটার, ইনস্টাগ্রাম অনেক কিছুই করা যেতে পারে। বোতাম টিপে ইচ্ছেমতো ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে মানুষ।

সন্তুষ্টি বা তৃপ্তি (Gratification)

মাধ্যম ব্যবহার মানুষকে তৃপ্তি এনে দেয়। মাধ্যম ব্যবহারের মধ্যেই তৃপ্তির ব্যাপারটা রয়েছে। সংবাদপত্র সাময়িক পত্র পড়ে এবং বেতার ও টেলিভিশন দেখে মানুষ তৃপ্তি পায়। তবে মাধমে অনুযায়ী তৃপ্তির রকমফের হয়। সংবাদপত্রের পাঠকের তৃপ্তি প্রয়োজনমুখী। সংবাদপত্র পাঠ করে মানুষ জানছে, তার কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটছে। সংবাদ পাঠ করে মানুষ আরো বেশি অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। প্রয়োজন মেটানো এখানে মুখ্য, একেবারে প্রয়োজনমুখে তৃপ্তি।

সাময়িক পত্র পাঠ করে যে তৃপ্তি মানুষ পায় তার প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে উপযোগী হলেও এক ধরনের আলস্যের সম্ভাবনা সেখানে থাকে। দ্রুত তাড়াতাড়ি পাড়ার চাপ সেখানে থাকে না, ধীরে ধীরে অলস সময়ে পড়ার সুযোগ থাকে। ফিচার, কলম ও অন্যান্য সৃষ্টিশীল রচনা পাঠ করে মানুষ আনন্দ পায়। উপভোগের মাত্রা অন্যরকম হয়। এখানে তৃপ্তির চেহারাটা আলাদা।

বেতার ও টেলিভিশনে তৃপ্তির ক্ষেত্র অনেক বড়। বেতার ও টেলিভিশন এই দুই মাধ্যমে পরিবেশিত অনুষ্ঠান বেশি তৃপ্তি দেয়। গান, নাটক, সিরিয়াল দ্রুত মানুষের মন জয় করতে পারে। বেতার ও টেলিভিশন হলো প্রচলিত বিনোদন মাধ্যম। যেখানে বিনোদনের সুযোগ বেশি, সেখানে তৃপ্তি পাওয়ার সম্ভাবনাও বেশি। সিনেমা মানুষকে আনন্দ দেয়, তৃপ্তি মেটায়। গানে, কথায়, অভিনয়, গল্পের বুনোটে, ক্যামেরার অভিনব ব্যবহারে, দর্শক এক অন্য জগতের সন্ধান পায়।

Stuart Hyde গণমাধ্যম থেকে উদ্ভূত তৃপ্তির ওপর গবেষণা চালিয়ে ৩১ ধরনের তৃপ্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। এই তৃপ্তি গুলোকে তিনি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন। এগুলি হল :

১) প্রতিনিধিমূলক

২) পলায়নী প্রবৃত্তি

৩) আত্মিক ও নৈতিক

প্রতিনিধিত্বমূলক শ্রেণীর একটি উল্লেখযোগ্য তৃপ্তি হলো নিজের মনের মত নায়ক বা নায়িকা দেখা। পলায়নী প্রবৃত্তির একটি তৃপ্তি হলো নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পুরোনো দিনে ফিরে যাওয়া। আত্মিক ও নৈতিক তৃপ্তি হলো মন্দের পরাজয় এবং যা ভালো তার জয়র দেখতে চাওয়া।

তৃপ্তির উৎস রয়েছে উপভোগ করার মধ্যে। কীভাবে উপভোগ করছে মানুষ সেটা জানা গেলেই বোঝা যাবে তৃপ্তি কেমন হয়েছে। গণমাধ্যমের সঙ্গে সম্পর্ক হবার আগে মানুষের মধ্যে যে ধারণা, মূল্যবোধ থাকে তার তৃপ্তি পাবার বিষয়টিকে প্রভাবিত করে। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি উন্নত মানের রচনা বা শিল্পকর্মকে যেভাবে উপভোগ করবে একজন অল্প শিক্ষিত ব্যক্তি সেভাবে করবে না। শিক্ষা রুচির তারতম্য তৃপ্তি পাওয়ার বিষয়টিকে প্রভাবিত করবে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজের অবস্থান, শিক্ষা, স্বভাব, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তৃপ্তি পায়। মানুষের মনস্তাত্ত্বিক গঠন তৃপ্তি পাবার সম্ভাবনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কেউ উচ্চাঙ্গসংগীত শুনে আনন্দ পেতে পারে আবার অন্যজন লোকসংগীত শুনে অশেষ তৃপ্তি পায়।

আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করি। এই উপভোগ করার মধ্যেই আছে তৃপ্তির উৎস। কীভাবে, কতখানি উপভোগ করছি তাই নির্ধারণ করবে তৃপ্তির মাত্রা।

৪.১.৪ সারাংশ

এই মাধ্যমে আলোচিত হয়েছে ম্যাজিক বুলেট তত্ত্ব এবং ব্যবহার ও সন্তুষ্টি তত্ত্ব। বুলেট তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো জ্ঞাপন এর বার্তা বুলেটের মতো করে শ্রোতাদের বিদ্ধ করে। এই তথ্যকে ভিত্তি করেই প্রোপাগান্ডা তৈরি হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। তবে এই তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা আছে। বর্তমানে কেউই কোন কিছু সরল বিশ্বাসে মেনে নেয় না। মানুষের মন চলে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে। যুক্তি তর্কের মধ্যে দিয়ে মানুষ সিদ্ধান্ত নেয় কী গ্রহণ করতে হবে, আর কী বর্জন করতে হবে।

মানুষের কাছে গণমাধ্যম আজ ভীষণ জনপ্রিয়। এর মূলে আছে গণমাধ্যম এর কার্যকারিতা। মানুষ সংবাদপত্র পাঠ করছে। টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রাখছে, সেখানকার অনুষ্ঠান দেখে জানার পরিধি বাড়াচ্ছে। এটাই হলো কার্যকারীতার পরিচয়। এছাড়া গণমাধ্যমের কাছ থেকে মানুষ যা পায় তা তাকে সন্তুষ্ট করে। এই সন্তুষ্টির ব্যাপারটা আছে বলেই মানুষের কাছে গণমাধ্যম প্রয়োজনীয়। মাধ্যম ব্যবহার ও সন্তুষ্টির বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে ব্যবহার ও সন্তুষ্টি তত্ত্ব (uses and gratification theory), Sturd Hyde গবেষণা করে 31 ধরনের তৃপ্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। তার মধ্যে বেশ কয়েকটিকে তিনটি শ্রেণীতে আবার ভাগ করেছিলেন। উপভোগ করার মধ্যে রয়েছে তৃপ্তির উৎস। শিক্ষার তারতম্য অনুযায়ী তৃপ্তি পাওয়ার ব্যাপারটা আলাদা হয়। তৃপ্তি পাওয়ার বিষয়টি সঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয়ের যোগ রয়েছে।

৪.১.৫ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১. ম্যাজিক বুলেট তত্ত্ব কী?

২. সন্তুষ্টি তত্ত্ব বলতে কী বোঝেন?

বড় প্রশ্ন

১. ম্যাজিক বুলেট তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন। বর্তমানে এই তত্ত্বটি কি প্রাসঙ্গিক?

২. ব্যবহার এবং সন্তুষ্টি তত্ত্ব আলোচনা করুন?

৪.১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১) *Mass Communication Theory and Practice* : Uma Narula

২) *Communication Theory Today* : Edited by David Cowley and Devid Michel

৩) *জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম*- ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

৪) *গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি* - ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

৫) *The Mass Media and Modern Society* : William Riker, T. Paters on, J. W. Jensen

একক - ২ ◘ স্পাইরাল অফ সাইলেন্স (Spiral of Silence), জ্ঞানীয় ও অনৈক্য তত্ত্ব (Cognitive Disonnance Theory)

গঠন

৪.২.১ উদ্দেশ্য

৪.২.২ স্পাইরাল অফ সাইলেন্স (Spiral of silence)

৪.২.৩ জ্ঞানীয় ও অনৈক্য তত্ত্ব (Cognitive Disonnance Theory)

৪.২.৪ সারাংশ

৪.২.৫ অনুশীলনী

৪.২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৪.২.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ার পরে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন

- স্পাইরাল অফ সাইলেন্স (Spiral of silence)
- জ্ঞানীয় ও অনৈক্য তত্ত্ব (Cognitive Disonnance Theory)

৪.২.২ স্পাইরাল অফ সাইলেন্স (Spiral of Silence)

গণজ্ঞাপন এর একটি উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব হল স্পাইরাল অব সাইলেন্স। এই তত্ত্বটির প্রবক্তা হলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান Elisabeth Noelle Neumann, যিনি 'পাবলিক ওপিনিয়ন অরগানাইজেশন' নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন জার্মানিতে।

এই তত্ত্বের একটি মনস্তাত্ত্বিক দিক রয়েছে। যে কোন জ্ঞাপনে অডিয়েন্স পার্টিসিপেশন একটি অপরিহার্য শর্ত। মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়া জ্ঞাপন কখনোই সম্ভব হতে পারে না। Elizabeth Noelle Neumann দেখালেন জ্ঞাপন এর ক্ষেত্রে ভয় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠছে। জ্ঞাপনে মানুষ সক্রিয় থাকছে কিন্তু ভয়ে কথা বলছে না। এই মনস্তাত্ত্বিক দিকটি হলো অডিয়েন্স কখনো কখনো নিজেদের সংখ্যালঘু ভাবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের ধারণার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে চায়না, ভাবে তাহলে তারা আইসোলেশন এ চলে যাবে।

Silence এই অবস্থায় চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। Dance প্রবর্তিত মডেলের অনুরূপ ছবি এখানেও পাওয়া যায়। আলোচনার টেবিলে অনেক মানুষকে দেখে যাচ্ছে, কিন্তু কিছু মানুষ কিন্তু নিরুত্তর থেকে যাচ্ছে। তাদের ভয় সংখ্যাগরিষ্ঠের দাপট কে। সবার থেকে আলাদা হয়ে যাবার এই ভয় তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। ঐ কারণে তারা চুপ থাকে। এই ভয়ে তৈরি করে স্পাইরাল যা ক্রমশ নিচের দিকে নামতে থাকে তার মানে কথা ফুরিয়ে যায় ক্রমশ। কথাবার্তায় নেমে আসে নিস্তব্ধতা।

এ অবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠরা কথা বলেই চলে, আর সংখ্যালঘিষ্ঠরা চুপ মেরে যায় ভয়ে। আইসোলেশনে চলে

যাওয়ার রিস্ক তারা নিতে চায় না। জনমত গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা পর্যালোচনা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। ১৯৩০ সালে ওয়াল্টার লিপম্যান একটি বই প্রকাশ করেছিলেন, নাম 'পাবলিক ওপিনিয়ন'। এই বইটির যথেষ্ট প্রভাব ছিল স্পাইরাল অব সাইলেন্স তত্ত্বটির ওপর। জনমত গঠনে গণমাধ্যমের যে সক্রিয় ভূমিকার কথা বলেছিলেন লিপম্যান তার সঙ্গে জনমতের যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। গণমাধ্যম যা বলছে তার দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হচ্ছে। মানসিকভাবে যে-কোনো বিষয় সম্পর্ক গড়ে তুলছে তার সুস্পষ্ট মতামত। এখানে গেট কিপিং এর বিষয়টিও প্রাসঙ্গিকভাবে উঠছে। কোন বিষয়টি গণমাধ্যমে প্রাধান্য পাবে সেটা ঠিক হচ্ছে এই পর্যায়ে। নির্বাচিত খবরই পরিবেশিত হয় এবং এই খবর জনমত গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাবলিক স্ফিয়ারে যখন গণমাধ্যম পরিবেশিত বিষয় নিয়ে আলোচনা চলে তখন আপামর সমস্ত মানুষই কিন্তু এক মত থাকে না। মানুষের মধ্যে মতপার্থক্য থেকে যায়। পার্থক্যের বিভাজনে একদল থাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অন্য দল থাকে সংখ্যালঘিষ্ঠ। পাবলিক স্ফিয়ার সংখ্যালঘুর মত প্রকাশের ব্যাপারে সংকুচিত হয়। যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠরা আস্থা সহকারে নিজেদের মত প্রকাশ করে। সেখানেই সংখ্যালঘিষ্ঠরা চুপ করে যায়। তাদের মধ্যে এই বোধ হয় যে তারা মত প্রকাশ করলে বিচ্ছিন্ন বা আইসোলেটেড হয়ে যাবেন। সামাজিক বিচ্ছিন্নতার ভয়ে তাদের কুরে কুরে খায় এবং তারা নীরব হয়ে থাকে।

মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষায় দেখা গেছে এই সামাজিক বিচ্ছিন্নতাকে এড়িয়ে চলতে চায় মানুষ। এটা হয় ভয় থেকে। তিনি বলেছেন সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত যদি ভুল হয়, এবং তারা সেটা জানলেও, চুপচাপ থেকে একটা সম্মতির বার্তা দেন। কারণ সবার সঙ্গে তারা আছেন এই বিষয়টা তাদের স্বাচ্ছন্দ দেয়।

Ellsabets Noelle Neumann's Spiral Silence

৪.২.৩ জ্ঞানীয় ও অনৈক্য তত্ত্ব (Cognitive Disonnance Theory)

এই তথ্যটির ভিত্তি হলো মনস্তত্ত্ব বা সাইকোলজি। মানুষের মনের সমীকরণ হল এই তত্ত্বের প্রধান প্রেরণা। মানুষের জানার মধ্যে অনৈক্য Disonnance থাকে। যে সিগারেট খায় সে জানে সিগারেট খেলে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সিগারেট খেলে শারীরিক অসুস্থতার সম্মুখীন হতে পারে। তবুও সে এই কথাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। তার মনে হয় সিগারেট না খেয়েও তো অনেকে ক্যান্সারে মারা যাচ্ছে। এই যে পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠছে মনের ভেতর থেকে, এটাই হলো Dissonance বা অনৈক্য।

১৯৬০ সালে Leon Festinger নামে একজন আমেরিকান মনস্তত্ত্ববিদ এই কগনিটিভ থিওরি অফ কমিউনিকেশনের রূপরেখা দেন। তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল মানুষ অনেক সময়ই দুটি বিপরীত ধর্মী বিশ্বাস রাখে একই সময়ে, আর তখনই সংগঠিত হয় কগনিটিভ ডিসোনান্স। এর ফলে তৈরি হয় ওই ব্যক্তির মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক চাপ বা Stress।

এই চাপকে অতিক্রম করার জন্য দরকার মানসিক শক্তি। সবসময় তা অর্জন করা যায় না। এইজন্যই মানুষ ধূমপান ছাড়তে পারে না। মদিরা আসক্তিকেও দূর করতে পারেনা। যারা পারে তাদের মানসিক জোর অনেক বেশি। তারা এই অনৈক্য কে পেরিয়ে ঐক্যের দিকে এগিয়ে যায়।

বিষয়টি খুবই জটিল। যে দুটি বিপরীত ধারণা থাকে, তার মূল্য যাচাই করা প্রয়োজন। মানুষ চায়, এমন সিদ্ধান্ত নিতে যাতে সে স্বচ্ছন্দ বোধ করতে পারে।

Cognitive Dissonance এর ক্ষেত্রে চারটি তাত্ত্বিক প্যারাডাইম লক্ষ্য করা যায় এগুলি হল Believe disconfirmation, Induced compliance, Free choice এবং Effort Justification.

Forbidden behaviour paradigm, একটি নেতিবাচক পরীক্ষা মডেল। Elliot Aronson এবং J.M Carl smith অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের উপর একটি সমীক্ষা করেছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বাচ্চারা কতটা নিজেদের বিচার বুদ্ধি নিয়ে পরিচালিত হয় তা খতিয়ে দেখা। এ হচ্ছে Belive disconfirmation পর্ব।

বেশ কিছু ছোটো ছেলেমেয়েকে একটা ঘরে আটকে রাখা হলো। এই ঘরে প্রচুর খেলনা রাখা আছে। বাচ্চাদের বলে দেওয়া হল কোদাল জাতীয় খেলনা না স্পর্শ করতে। যদি তারা এই খেলনা নিয়ে খেলে তাহলে শাস্তি পাবে।

Induced Comsliance পর্বে বাচ্চাদের বলা হলো তারা যেকোন খেলনা নিয়ে খেলতে পারে। কোনো বাধা-নিষেধ নেই। এবার দেখা গেল অধিকাংশ বাচ্চাই ওই কোদালের ধারে কাছে যাচ্ছে না। আদতে বিষয়টা কিছু জনের মাথায় ঢুকে গেছে যে কোদাল ছাড়াও অনেক কিছুই খেলার জন্য আছে। শুধু শুধু এই কোদাল নিয়ে খেলার ঝামেলায় কেন যাব! এটা দিয়ে প্রমাণিত হয় যে সবাই চায় একটা সেফ বা সুরক্ষিত জায়গায় থাকতে, এবং জ্ঞাপনেও এই স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করতে চায়।

Freechoice হলো আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যা কগনিটিভ ডিসনান্স বা জ্ঞানীর অনৈক্যকে গভীরভাবে

প্রভাবিত করে। কোনটি আমার কাছে গ্রহণযোগ্য এটা ঠিক করা খুবই কঠিন, যদি আমার সামনে অসংখ্য পছন্দের সম্ভাবনা রাখা হয়। এ বিষয়ে ১৯৫৬ সালে একটি সমীক্ষা চালানো হয়। এই সমীক্ষার নাম ছিল পোস্ট ডিসিশন চেঞ্জ প্রোবাবিলিটি অ্যান্ড এবিলিটি অফ অল্টারনেটিভ। একবার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে আবার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কিছু সমস্যা তৈরি হয় সেটাই প্রমাণিত হয়েছিল এই সমীক্ষায়।

অন্য দলের সদস্যদের সঙ্গে তাদের সামান্য দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। যেটা করছি সেটা খারাপ হলেও যারা করছি তারা প্রত্যেকে আমাদের কাছের লোক। এটাই হলো এ পার্ট অফ জাসটিফিকেশন। নিজ উদ্যোগে সমর্থন প্রমাণ করার চেষ্টা করছি। Cognitive Dissonance অথবা জ্ঞাপন এর অনৈক্যের একটা বড় দৃষ্টান্ত।

আরেকটি উদাহরণ রাখা যেতে পারে। আমরা যারা মাংস খাই তারা আবার বন্যপ্রাণীর প্রতি গভীরভাবে ভালোবাসা পোষণ করি। প্রাণীকে হত্যা করেই মাংস খাচ্ছি, আবার প্রাণীদের ভালোবাসি। দুটোই সত্য কিন্তু বিপরীতধর্মী। গবেষকরা একে বলেছেন Meet Paradox. Hank Rosenberg বলেছেন এই বিপরীতধর্মী ক্রিয়া তৈরি করছে অনৈক্য। চেতনার অগ্রগতি হয় এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে।

৪.২.৪ সারাংশ

এই এককে আলোচিত হয়েছে স্পাইরাল অব সাইলেন্সে এবং জ্ঞানভিত্তিক অনৈক্য তত্ত্ব।

স্পাইরাল অব সাইলেন্সে তত্ত্বটির প্রবক্তা হলেন এলিজাবেথ নোয়েল নিউম্যান, তিনি ছিলেন একজন জার্মান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। গবেষণা করে তিনি দেখেছিলেন ভয়ে মানুষ অনেক সময় চুপ করে থাকে। সত্য জেনেও অনেক সময় তা বলতে ভয় পায়। কারণ তখন মানুষ নিজেকে সংখ্যালঘু ভাবে। তার মনে হয় সত্য কথা চললে সে হবে একা। এই ভয় তাকে নীরব রাখে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দাপটের সামনে সংখ্যালঘু মানসিকতা কণ্ঠরোধ করে আপনা আপনি। বাইরে থেকে নয় ভিতরে তাগিদেই সে চুপ করে যায়। এই ভয়ে তৈরি করে স্পাইরাল যা ক্রমশ নিচের দিকে নামতে থাকে।

Cognitive Dissonance তত্ত্ব যাকে বাংলায় বলা হয়েছে জ্ঞানীয় (জ্ঞানভিত্তিক) অনৈক্য তত্ত্ব, তার ভিত্তি হলো মনস্তত্ত্ব। মানুষের ভয় হল এই তত্ত্বের প্রধান প্রেরণা। মানুষের জানার মধ্যে অনৈক্য থাকে। এর অর্থ বিপরীতমুখী ভাবনা মানুষের চেতনার কাজ করে। এর ফলে তৈরি হয় চাপ যা অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজন মানসিক শক্তি যেটা সব সময় মানুষ অর্জন করতে পারে না। এই কগনিটিভ ডিসনান্স-এর ক্ষেত্রে চারটি তাত্ত্বিক প্যারাডাইম লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি হল Believe disconfirmation– Induced compliance– Free choice এবং Effort Justification।

৪.২.৫ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. স্পাইরাল অব সাইলেন্সে তত্ত্ব বলতে কী বোঝেন?

২. জ্ঞানীয় অনৈক্য তত্ত্ব কী?

বড় প্রশ্ন

১. স্পাইরাল অব সাইলেন্স তত্ত্বের সঙ্গে কি মনস্তত্ত্বের যোগ রয়েছে?

ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

২. কগনিটিভ ডিসনান্স তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করুন।

৪.২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১) *Mass Communication Theory and Practice :* Uma Narula

২) *Communication Theory Today :* Edited by David Cowley and Devid Michel

৩) *গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী (অনুবাদ)* : মেলদিন এল কি ফ্ল্যার, সন্দ্রাবল রোকেশ (বাংলা একাডেমি ঢাকা)

৪) *জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম*- ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা প্রকাশনী, কলকাতা)

৫) *গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি* - ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা প্রকাশনী, কলকাতা)

একক-৩ ◘ উপস্থাপনা বিন্যাস তত্ত্ব (Agenda Setting Theory), সাম্যবাদী তত্ত্ব (Communist Theory), অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য (Other Related Theories)

গঠন

৪.৩.১ উদ্দেশ্য

৪.৩.২ উপস্থাপনা বিন্যাস তত্ত্ব (Agenda Setting Theory)

৪.৩.৩ সাম্যবাদী তত্ত্ব (Communist Theory)

৪.৩.৪ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব (Other Related Theories)

৪.৩.৫ সারাংশ

৪.৩.৬ অনুশীলনী

৪.৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৪.৩.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ার পরে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন

- উপস্থাপনা বিন্যাস তত্ত্ব (Agenda Setting Theory)
- সাম্যবাদী তত্ত্ব (Communist Theory)
- অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব (Other Related Theories)

৪.৩.২ উপস্থাপনা বিন্যাস তত্ত্ব (Agenda Setting Theory)

গণমাধ্যম-এর গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর অন্যতম হল কোন বিষয়টি কীভাবে উপস্থাপিত হবে তার বিন্যাস করা। কোন বিষয়টি কীভাবে উপস্থাপিত হবে তার খুঁটিনাটি যাচাই করা। সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন সকল গণমাধ্যমকেই উপস্থাপনা বিন্যাসের কাজটি করতে হয়। ডিজিটাল যুগে বিভিন্ন সোশ্যাল সাইটগুলোকেও বিষয় বেছে নিতে হয়। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং নিউজ পোর্টালগুলিতে কি পরিবেশিত হবে তা আগে থেকে ঠিক করতে হয়। বিষয় নির্বাচনের এই প্রক্রিয়াকে বলে উপস্থাপনা বিন্যাস। উপস্থাপনা বিন্যাসের চরিত্র অনুধাবন করলেই বোঝা যায় কোন মাধ্যম কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

এই তাত্ত্বিক ধারণার উদ্ভব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সাংবাদিক ওয়াল্টার লিপম্যান (Walter Lippmann) উপস্থাপনা বিন্যাসের প্রাথমিক রূপরেখা দিলেও ধারণাটি প্রথম সার্থক রূপ পায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বার্নাড কোহেনের (Berner Cohen) গবেষণায়। তিনি দেখেছিলেন সংবাদপত্র কী নিয়ে মানুষ চিন্তা করবে তা ঠিক করে দেয়। তার বক্তব্য ছিল সব সময় মানুষ কী চিন্তা করবে তা হয়তো সংবাদপত্র ঠিক করতে পারে না, কিন্তু পাঠক কে বলে দেয় কী বিষয় নিয়ে চিন্তা করা দরকার।

বাস্তব জগৎ মানুষের কাছে বিভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়। এই বিষয়টি নির্ভর করে অনেকাংশেই কীভাবে বাস্তব ঘটনা মানুষের কাছে উপস্থিত হচ্ছে ঠিক তার ওপর। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র পড়ে মানুষ যা জানছে, প্রকৃতভাবে তাই গড়ে তুলছে তার ভাবনার আধার। যুদ্ধ নিয়ে বেশি সংবাদ যদি প্রকাশিত হয় তাহলে যুদ্ধই মানুষকে বেশি ভাবাবে। আবার করোনার মত ভাইরাস আক্রমণ নিয়ে বেশি কভারেজ থাকলে করোনা ভাইরাস নিয়ে সে চিন্তা করবে।

বিষয়ে উপস্থাপনা বিন্যাস নিয়ে মূল্যবান আলোচনার সূত্রপাত করেন ১৯৭২ সালে Maxwell McCombs এবং Donald Shaw, ১৯৬৮ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে গণমাধ্যমের ভূমিকা ঠিক কি ছিল! সেটা বুঝতে তারা একটি ছোট্ট সমীক্ষা চালান। নর্থ ক্যারোলিনার চ্যাপল হিল অঞ্চলের মানুষদের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বুঝতে সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ও টেলিভিশন সংবাদে কী প্রভাব ফেলেছিল সেটাই তারা বোঝার চেষ্টা করেছিলেন।

তাঁরা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেছিলেন গণমাধ্যম কোন কোন বিষয়কে প্রাধান্য দিচ্ছিল, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মতামত জানার চেষ্টা করেছিলেন। সাধারণ মানুষের কাছে তাদের প্রশ্ন ছিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কোন বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে? আশ্চর্যের বিষয় গণমাধ্যম দ্বারা নির্বাচিত বিষয়ে এবং সাধারণ মানুষ উত্তরে যা বলেছিলেন তার মধ্যে সামাঞ্জস্য ছিল। দেখা গেল গণমাধ্যমের এজেন্ডা আর সাধারণ মানুষের এজেন্ডা একই ছিল। McCombs এবং Shaw এর প্রচেষ্টা গণজ্ঞাপন গবেষণায় নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। পরবর্তীকালে বহু গবেষক বিষয় উপস্থাপন বিন্যাস নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে রজার্স, শুমেকার এর গবেষণা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৮৮ সালে রজার্স এবং শুমেকার এর গবেষণায় উপস্থাপনা বিন্যাসের তিনটি দিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। একটি হলো মাধ্যম সম্পর্কিত উপস্থাপনা বিন্যাস (Media Agenda Setting), দ্বিতীয়টি হল জনমত সম্পর্কিত উপস্থাপনা বিন্যাস (Public Agenda Setting) এবং তৃতীয়টি নীতি সম্পর্কিত উপস্থাপনা বিন্যাস (Policy Agenda Setting)। মাধ্যমের ক্ষেত্রে দেখা যায় কীভাবে গণমাধ্যম এর বিষয়বস্তু নির্বাচিত হচ্ছে। পাঠকের চাহিদা, পছন্দ ও প্রতিষ্ঠান নীতি পর্যালোচনা করে ঠিক হয় কী বিষয়ের উপর কাজ করা হবে। সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক, মুখ্য অবর সম্পাদকরা হলেন গেটকিপার। তারা পেশাগত নৈপুণ্যের দ্বারা ঠিক করেন কী বিষয়ে গণমাধ্যমে—সংবাদপত্রে ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পরিবেশিত হবে।

প্রতিদিন প্রচুর সংবাদ এসে জমা হয় নিউজ ডেস্ক-এ। বার্তা সম্পাদক তার মধ্যে থেকে অল্পকিছু সংবাদ বেছে নেন পরিবেশনার জন্য। সম্পাদকীয় ও অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। হারোল্ড লাসওয়েল তার গবেষণায় এই মাধ্যম উপস্থাপনা বিন্যাসের ওপরই জোর দিয়েছিলেন। জনমত অনুধাবন করতে সাধারণ মানুষের চাহিদা পছন্দের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় জনগণের পছন্দ ঠিক করে দেয় কোন বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ। গবেষকরা জনমত সমীক্ষা চালিয়ে খুঁজে পান বিষয়গুলিকে। কিছু প্রশ্ন নিয়ে তারা উপস্থিত হন সাধারণ মানুষের কাছে। উত্তরের মধ্যে থেকে উঠে আসে নীতি সম্পর্কিত উপস্থাপনা বিন্যাসের দিশা।

নীতি সম্পর্কিত উপস্থাপনা বিন্যাস হল সেই প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে সরকারের নীতি এবং নেতৃবর্গের বর্ণিত নীতি

কোন বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে তার আভাস পাওয়া যায়। আইন সভায় প্রণীত আইন, বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ প্রভৃতির মাধ্যমে এই বিন্যাসের চরিত্র অনুধাবন করা যায়। এই তিনটি বিন্যাস পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। প্রতিটি বিন্যাস একে অপরকে প্রভাবিত করে। বিষয়টিকে এই ভাবে সাজানো যায়:

মধ্যম সম্পর্কিত উপস্থাপনা বিন্যাস—জনমত সম্পর্কিত উপস্থাপনা বিন্যাস—নীতি সম্পর্কিত উপস্থাপনা বিন্যাস।

এটা এখন প্রায় স্বতঃসিদ্ধ যে উপস্থাপনা বিন্যাস ও জনমত সম্পর্কিত উপস্থাপনা বিন্যাস জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনমতের দ্বারা মজবুত হয় গণতন্ত্রের ভিত্তি। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র বেতার ও টেলিভিশন প্রতিদিন যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করছে সেগুলি গভীরভাবে প্রভাবিত করছে মানুষের চিন্তা-ভাবনা। গণমাধ্যম যদি সরকারের দুর্নীতি, ব্যর্থতা নিয়ে খবর করে মানুষের মনে তার প্রভাব হয় সুদূরপ্রসারি। গণমাধ্যম বিশেষ করে টেলিভিশনে পরিবেশিত বিজ্ঞাপন ভোগের ইচ্ছা মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তোলে। প্রতিমুহূর্তে সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছে। আধুনিক সমাজের এই পরিবর্তনে গণমাধ্যমের যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। উপস্থাপনা বিন্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করে গণমাধ্যম পরিচালকরা সমাজ পরিবর্তনের গণমাধ্যমকে আরো সক্রিয় করে তুলছে। শুমেকার এবং রজার্স গবেষণা করে দেখেছেন সাংবাদিকদের নিজস্ব মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি ও পেশাগত দক্ষতা সংবাদপত্রের বিষয়বস্তু নির্ধারণে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

বিষয় উপস্থাপনা বিন্যাস সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি, অভ্যাস ও নীতিবোধ গড়ে তুলতে টেলিভিশন যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তা আজ প্রমাণিত। উলফ এবং ফ্রিস্ক তার গবেষণায় দেখিয়েছেন গণমাধ্যম কীভাবে বাচ্চা ছেলে মেয়েদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে।

টেলিভিশন দেখে তারা শেখে, নিজেদের অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে দেখে নেয়। এই ভাবেই তৈরি হয় তাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। টেলিভিশনে যদি হিংসা, স্বার্থপরতা দেখানো হয় তার প্রভাব শিশুদের ওপরেও পরে। তাদের সামাজিকীকরণ প্রভাবিত হয়।

গণমাধ্যমের সঙ্গে সংস্কৃতির যে নিবিড় সংযোগ রয়েছে তার মূলেও রয়েছে উপস্থাপনা বিন্যাস। গণমাধ্যমের বিষয় সমাজ সংস্কৃতি চেতনায় রূপান্তর ঘটাচ্ছে। ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা ভোগবাদের প্রতি ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষা, সমাজ বিচ্ছিন্নতা, এগুলি সংস্কৃতির অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। মানুষ যা পড়ছে, শুনছে এবং দেখছে তাই দিয়েই বিচার করছে সবকিছু। কী পড়বে, কী শুনবে, কী দেখবে এবং তারপর কী ভাববে এই গোটা প্রক্রিয়াটি নির্ধারণ করছে উপস্থাপনা বিন্যাস। গণমাধ্যম-এর মালিকানায় যত কেন্দ্রীভবন ঘটছে সমাজ সংস্কৃতির ওপর একচেটিয়া মালিকানার আধিপত্য তত বাড়ছে। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মিডিয়া নিয়ন্ত্রণে তৈরি হচ্ছে বিষয়ে উপস্থাপনা বিন্যাসের রূপরেখা। এটা গভীর উদ্বেগের বিষয়। বৈচিত্রের সম্ভাবনার ক্ষেত্র ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে বিশ্বজুড়ে।

৪.৩.৩ সাম্যবাদী তত্ত্ব (Communist Theory)

কাল মার্কস এবং এঙ্গেলসের সাম্যবাদী ভাবনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে গণমাধ্যম সম্পর্কিত সাম্যবাদী তত্ত্ব। মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সমাজ পরিবর্তনের যে রূপরেখা দিয়েছে তার মধ্যে প্রধান হয়ে

উঠেছে শ্রেণী সংঘাত, যা প্রকৃতপক্ষে মানবিক আচরণের প্রতিফলন ছাড়া কিছুই নয়। মার্ক্স বলেছেন মানবিক আচরণ সর্বদাই সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে ধাবিত হয়। মানুষ সর্বদাই চেষ্টা করে উন্নততর সামাজিক অবস্থায় পৌঁছতে। এর জন্য সে নিরন্তর সংগ্রাম করার জন্য তৈরি থাকে। এই সংগ্রামকে তিনি শ্রেণীসংগ্রাম বলে বর্ণনা করেছেন।

শোষক আর শোষিতের মধ্যে সংগঠিত শ্রেণিসংগ্রাম সূচনা করে সমাজ রূপান্তরের। সমাজতন্ত্র থেকে ধনতন্ত্র, তারপর সমাজতন্ত্র। এরপর উত্তরণ ঘটবে সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায়। এই হল মার্ক্সবাদী দর্শন এর মূল কথা। এই বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় জ্ঞাপন হয়ে ওঠে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তবে এই জ্ঞাপন প্রক্রিয়ায় উৎস রয়েছে সমাজেই। মানুষের যৌথ সমাজ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সমাজ পরিবর্তনের বার্তা। মানবিক আচরণ তাকেই প্রকাশ করে। শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিবাদী আচরণ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে পাল্টে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

কিন্তু পুঁজিপতি শ্রেণি প্রচলিত ব্যবস্থাকেই ধরে রাখতে চায় নিজেদের স্বার্থে। পুঁজিপতিরা গণমাধ্যম এর মালিকানা নিয়ন্ত্রণ করে। মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করেন গণমাধ্যম হলো সামাজিক উপরিকাঠামো। বৃহৎ সংবাদপত্র, টেলিভিশন এবং বর্তমানে ইন্টারনেট নির্ভর সোশ্যাল সাইট গুলি পুরোপুরি পুঁজিপতি শ্রেণী দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রচলিত মূল্যবোধকে ধরে রাখা এই গণমাধ্যম গুলির মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর পুঁজিবাদের কোন অস্তিত্ব থাকে না। সাম্যবাদী ভাবনার পরীক্ষায় শ্রমিক শ্রেণির হাতেই ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। রাষ্ট্রক্ষমতা চালিত হয় শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী স্বার্থে। শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় এক চূড়ান্ত মাইলফলক হলো সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। এই সমাজ ব্যবস্থায় গণমাধ্যম পরিচালিত হয় শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থে। গণমাধ্যম সেই বিষয় পরিবেশন করবে যাতে শ্রমিক কল্যাণ সাধিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেহেতু মুক্তবাজার ব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকে না, তাই সেখানে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন থাকে না। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় গণমাধ্যম, সংবাদপত্র টেলিভিশন বা বেতার যাই হোক না কেন পরিচালিত হয়। দেশের শাসন ক্ষমতা থাকে কমিউনিস্ট পার্টির হাতে। তাই কমিউনিজমের আদর্শেই গণমাধ্যম পরিচালিত হয়।

সাম্যবাদী তত্ত্বের সারকথা হলো শ্রেণিহীন সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। এই সাম্য শুধু রাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হয় সাম্যের ধারণা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় থাকে সমান ভোটাধিকার কিন্তু অর্থনৈতিক সাম্য থাকেনা। সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী ভাবধারায় সাম্য আর্থ-সামাজিক পরিসরেও বিরাজ করে।

৪.৩.৪ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য (Other Related Theories)

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল মার্কস, ফ্রয়েড ও অ্যাভাগার্দ শিল্প সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এই স্কুলের সমাজবিজ্ঞানীরা এক নতুন তাত্ত্বিক রূপরেখা দেন গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে। ১৯২৩ সালে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট ইনস্টিটিউট অফ সোশাল

রিসার্চ এর সঙ্গে তাঁরা যুক্ত ছিলেন। এই দলের নেতা ছিলেন ম্যাক্স হর্কহাইমার, তিনি ছিলেন ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর। তিনি মার্কসবাদের অনুসরণে সমালোচনা তত্ত্বের প্রাথমিক রূপরেখা দেন।

এই স্কুলের প্রবক্তারা ছিলেন বামপন্থী মার্কসবাদী, অন্যদিকে ফ্রয়েডিয়ান। সাহিত্য-শিল্প ও মানবতাবাদ তাদের চিন্তায় প্রভাব ফেলেছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে গোরা বামপন্থী ভাবনা ছিল স্কুলের প্রধান অনুপ্রেরণা।

ফ্রয়েডিয়ান ভাবনার অনুষঙ্গ প্রথম নিয়ে আসেন লিও লোয়েন্থল। তিনি ছিলেন ফ্রয়েডের ছাত্র। Karl Landawer এর অনুগামী। হর্কহাইমারের সহযোগিতায় লান্ডাওয়ের ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে মনঃসমীক্ষণের একটি কেন্দ্র গড়ে তোলেন। মনস্তত্ত্ব চর্চার প্রসার এর সঙ্গে সঙ্গে ফ্রয়েডীয় ভাবনা ধীরে ধীরে এই স্কুলের সদস্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রাজনীতি, বিশেষ করে হিটলারের সঙ্গে স্ট্যালিনের অনাক্রমণ চুক্তি এই স্কুলের সদস্যদের হতাশ করে। চিরায়ত মার্কসবাদ এর প্রতি বিশ্বাসের ভিত আলগা হয়ে যায়। তাঁরা সোভিয়েত মডেলের মার্কসবাদের তীব্র সমালোচনা করেন। নয়া মার্ক্সবাদী এই সদস্যরা ক্রমশ ফ্রয়েডিয়ান সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে থাকেন। এরিক ফ্রম এর মতো মার্কসবাদী সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করেন মার্কবাদ সম্পূর্ণ নয়। সমাজ পরিবর্তনের ব্যাখ্যাকে সঠিক রূপ দিতে গেলে ফ্রয়েডীয় ভাবনার সাহায্যে নেওয়া প্রয়োজন। ফ্রম মনে করতেন, পরিবার সমাজ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মানবিক জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এইভাবেই ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সদস্যরা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন। মানুষের আচরণ ও সমাজ পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গণমাধ্যমের কার্যধারা অনুসরণ করেছেন। হিটলারের মত একনায়ক তৈরি করতে গণমাধ্যমের প্রোপাগান্ডা কীভাবে কাজ করেছে তার বিশ্লেষণ তাঁরা করেছেন। গণমাধ্যম ব্যক্তি মানুষের আচরণ কীভাবে কতটা পরিবর্তন করতে পারে তার ওপর আলোকপাত করেছেন।

শিকাগো স্কুল

মানবিক জ্ঞানচর্চায় শিকাগো স্কুলের ভাবধারার তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রয়েছে। বিশ শতকের শুরু থেকেই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান চর্চা একের পর এক নতুন প্যারাডাইম তৈরি করে সমাজতত্ত্বের আলোচনার ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছিল। জার্মান সমাজতাত্ত্বিক এবং ফরাসি সমাজতাত্ত্বিক যথাক্রমে জর্জ সিমেল এবং এমাইল ডুর্ক হেইম শিকাগো স্কুলের চর্চাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৯২০ সালের পর থেকে শিকাগো স্কুল এর সদস্যরা সামাজিকীরণ প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞাপনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। বিশেষ করে জর্জ সিমেল এর আধুনিক নগর জীবন চর্চা, বিবর্তনবাদ কেন্দ্রিক ভাবনা, শিকাগো স্কুলের ভাবধারার ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তাদের দেওয়া তাত্ত্বিক প্যারাডাইম অনুযায়ী মানুষের ব্যক্তিত্ব বেড়ে ওঠা অনেকাংশে নির্ভর করে মানবিক জ্ঞাপনের ওপরে। তাদের অভিমত হলো সমাজে বাঁচতে গেলে মানুষকে জ্ঞাপন এর সাহায্য নিতেই হবে। মানবিক আচরণের বিকাশের জৈবিক কারণ আছে। সামাজিক কারণসমূহের ফলিত প্রভাবকে তারা বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। জ্ঞাপন এর মধ্যে দিয়ে যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তথ্য ভাবনার আদান-প্রদান হয়, বাস্তবে সেটাই মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠন করে। পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কের এই দিকটিকে তারা প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ (Symbolic Interactionism) বলে অভিহিত করেছেন। মানবিক আচরণের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই গণমাধ্যমের মধ্যে দিয়ে গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। দেখা দেয় সমাজ ও গণমাধ্যমের সম্পর্ক বিজ্ঞানসম্মত ভাবে অনুধাবন এর প্রয়োজনীয়তা। ধনী শিল্পপতি জন. ডি. রকফেলার এর আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতান্ত্রিক গবেষণার কেন্দ্রটি গড়ে ওঠে।

যে গবেষকরা শিকাগো স্কুল এর বিশেষ ধারণাকে গড়ে তুলেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আলবিয়ন স্মল (Albion Small), অ্যার্নেস্ট বার্জেস, জন ডিউয়ি (John Dewey), জর্জ হার্বার্ট মিড (George Herbert Mead) এবং রবার্ট ই পার্ক (Robert E Park)। আলবিয়ন স্মল ছিলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা। শিকাগো স্কুলে দার্শনিক ধারণা গড়ে তুলতে তার অবদান ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর্নেস্ট বার্জেস (Arnest Burgess) হলেন আরো একজন বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ। হিউম্যান ইকোলজি নিজে গবেষণা চালিয়েছিলেন। তার প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের নিত্যদিনের সম্পর্কের বিন্যাস। ডারউইনের বিবর্তনবাদ থেকেই তিনি অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন।

জন ডিউয়ি (John Dewey) ছিলেন দর্শনের অধ্যাপক। ১৮৯৪ থেকে ১৯০৪ তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছিলেন। পরে তিনি চলে যান কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। দর্শনকে তিনি মিলিয়েছিলেন বাস্তব বিচক্ষণতার সঙ্গে। তিনি মনে করতেন বিশ্বাসের ব্যাখ্যা করা উচিত তার ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে। প্রগতিশীল শিক্ষা বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ করতে পারে।

জর্জ হারবার্ট মিড ছিলেন দর্শনের অধ্যাপক। সমাজ মনস্তত্ত্ব নিয়ে দীর্ঘদিন তিনি গবেষণা করেছিলেন। তার বিখ্যাত বইটি ছিল 'মাইন্ড, সেল্ফ এন্ড সোসাইটি' (Mind self and society)। মিডের বক্তব্য ছিল মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে জ্ঞাপন এর মাধ্যমে। সমাজে বিভিন্ন মানুষের মেলামেশা, একে অপরের সঙ্গে ভাব বিনিময় এবং একে অপরের সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে তার ব্যক্তিত্ব।

Robert E. Park হলেন গণজ্ঞাপন চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ। অনেক বেশি বয়সে তিনি শিক্ষকতা জগতে এসেছিলেন। কিন্তু অতি দ্রুত তিনি স্বীকৃতি পান। সমাজতত্ত্বের আলোচনার সর্বপ্রথম তিনি জাতি সম্পর্কের বিকাশ আলোচনা করেন। গণজ্ঞাপন এবং মানুষের সমষ্টিগত আচরণ নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান চালান। পার্ক শিক্ষা ব্যবস্থায় আসার আগে ছিলেন একজন রিপোর্টার। রিপোর্টিং ছেড়ে তিনি মাস্টার হতে আসেন। সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা সমাজতত্ত্বকে গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য করেছিল। তিনি নিজেই বলেছেন "I have actually covered more ground– trampling about in cities in different parts of the world– than any other living man, out of all these I gained– among other things– a conception of the city– the community– and the region– not as a geographical phenomena merely but as a kind of social organism" তিনি ইউরোপ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসা আদিবাসীদের সমাজের উপর গবেষণা চালিয়ে মন্তব্য করেছিলেন অভিবাসীরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও কিন্তু মনে প্রাণে মার্কিন সমাজে মিলে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ভাষায় অনেকগুলি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। পোলিশ, জার্মান, ফরাসি প্রভৃতি ভাষায় যে সমস্ত কাগজ বেরোয় তাদের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে তিনি দেখেছিলেন সংবাদপত্রগুলি এমনভাবে বিষয় নির্বাচন করতো যাতে পাঠকরা তাদের আঞ্চলিক সত্তা বজায় রেখেও মার্কিন জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিলে মিশে যেতে উৎসাহ পায়। সমাজতত্ত্বের আলোচনায় অধ্যাপক পার্ক যেভাবে সংবাদপত্রের ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে গণ জ্ঞাপন গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। অনেকে মনে করেন পার্কই হলেন গণজ্ঞাপন চর্চার প্রথম তাত্ত্বিক। শিকাগো স্কুলের সতীর্থদের সঙ্গে এক সুরে পার্ক বলেন মানবিক জ্ঞাপন সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে সার্থক করে তোলে।

গণমাধ্যম নির্ভর তত্ত্ব (Media Dependency Theory)

গণমাধ্যম নির্ভর তত্ত্বের উদ্ভব গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের শুরুতে। গণমাধ্যম সেই সময় হয়ে উঠেছিল প্রবল শক্তিশালী। ওয়াশিংটন পোস্টের তদন্তমূলক সংবাদ মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সনকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। গণমাধ্যমের এই শক্তি সাধারণ মানুষকে গণমাধ্যমের উপর নির্ভর করে তুলেছে। গণমাধ্যম যা লিখেছে তা বিশ্বাস করছে মানুষ। এটাই গণমাধ্যম নির্ভর তত্ত্বের অন্যতম ভিত্তি।

Sandra Ball Rokeach এবং Mevin DeFleur ১৯৭৬ তৈরি করেন গণমাধ্যম নির্ভর তথ্য। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং সন্তুষ্টি তত্ত্ব গভীর প্রভাব ফেলেছিল এই গণমাধ্যম নির্ভর তত্ত্বের ওপরে।

গণমাধ্যম, মানুষ ও সামাজিক ব্যবস্থা জড়িয়ে আছে পরস্পরের সঙ্গে। এই পারস্পারিক সম্পর্কটা সহজেই বোঝা যায়। গণমাধ্যম এর সাহায্যে মানুষ অনেক কিছু জানতে পারে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে খুব বেশি কিছু জানা যায় না। কারণ তার দেখার, ভ্রমণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু গণমাধ্যম এর জানালা দিয়ে অনেক কিছু দেখা যায়। জানার পরিধি বহুদূর বিস্তৃত করে। এজন্যই মানুষের গণমাধ্যম নির্ভরতা বেড়েছে। নির্ভরতার মাত্রা কিন্তু সবসময় একরকম হয় না। নির্ভরতার মাত্রা কিন্তু জড়িয়ে থাকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের সঙ্গে। সেগুলি হল যথাক্রমে :

ব্যক্তি: নির্ভরতার মাত্রা ঠিক হয় কী তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি সে গণমাধ্যম এর কাছ থেকে পাচ্ছে তার উপরে। যদি তার সন্তুষ্টি বেশি হয় তাহলে নির্ভরতার মাত্রা বাড়বে। যদি সন্তুষ্টি কম হয় তাহলে নির্ভরতার মাত্রা কমবে।

সামাজিক পরিস্থিতি : সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে গণমাধ্যম নির্ভরতার যোগ রয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় দাঙ্গা যুদ্ধ ও নির্বাচনের সময় মানুষের গণমাধ্যম নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। কারণ তখন মানুষ অনেক বেশি তথ্য ও ব্যাখ্যা পায় যা তাকে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করে।

সক্রিয় শ্রোতা : এখানে শ্রোতার মধ্যে গণমাধ্যম যারা ব্যবহার করছেন তারা সকলেই আছেন। এই শ্রোতারা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে। যেমন অনেকে গান-বাজনা, নাটক দেখা-শোনার জন্য টেলিভিশন ও বেতার কে ব্যবহার করেন আবার শেয়ারবাজার বোঝার জন্য অনেকে গণমাধ্যমের ওপর নির্ভর করেন।

গণমাধ্যম-এর পক্ষ থেকেও এই নির্ভরতা বাড়ানোর প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। যেমন গণমাধ্যম কর্তৃপক্ষ শ্রোতাদের কথা মাথায় রেখে বিষয় নির্বাচন করেন। সোজা কথায় শ্রোতাদের চাহিদা রুচি পছন্দ অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়। টিভিতে সিরিয়াল রিয়েলিটি-শো তৈরি হয় সম্পূর্ণভাবে শ্রোতাদের পছন্দের কথা ভেবে।

উত্তর আধুনিক সমাজে গণমাধ্যম নির্ভরতা তত্ত্ব কখনোই সমালোচনার ঊর্ধে নয়। শুধুমাত্র গণমাধ্যম কর্তৃপক্ষ এবং শ্রোতারা এবং সমাজ বিষয়টি ঠিক করছে এমন ভাবাটা অতিসরলীকরণ পর্যায়ে পড়ে। জীবন আজ অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে ও সামাজিক বিন্যাস এর মধ্যে থাকছে বহুমাত্রা, স্তর এবং রং। যেমন পরিবেশ, ফেমিনিজম ,প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর গণমাধম-এ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। গণমাধ্যম ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কের মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। নিউ মিডিয়ার আবির্ভাব বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলেছে। অসংখ্য সোশ্যাল সাইট এর জন্য গণমাধ্যম, ব্যক্তি ও সমাজ অন্য মাত্রা লাভ করেছে।

মার্শাল ম্যাকলুহান (Marshall McLuhan)

জ্ঞাপন চর্চায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন মার্শাল ম্যাকলুহান। তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল জ্ঞাপন প্রযুক্তি কীভাবে মানুষের ইন্দ্রিয় জাত অনুভবে পরিবর্তন নিয়ে আসছে। আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম মানুষের সহজাত পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে প্রভাবিত করতে পারে। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে ম্যাকলুহানের গবেষণা যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল।

মুদ্রণ মাধ্যম দিয়ে ম্যাকলুহান আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। তার দাবি ছিল মুদ্রণ মাধ্যম মৌখিক জ্ঞাপনের প্রভাবকে বদলে দিয়েছিল। তথ্য পাওয়া ও বোঝার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এলো তা মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। অক্ষর ও লাইন কে অনুসরণ করতে গিয়ে মানুষের চিন্তা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। বাঁ দিক থেকে ডান দিকে সরে গিয়ে পাঠ করার যে অভ্যেস তৈরি হলো তা ব্যক্তিগত অনুভব। তা যোগ করেছিল নতুন মাত্রা। তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আন্ডারস্ট্যান্ডিং মিডিয়া' সমাজের সঙ্গে গণমাধ্যমে সম্পর্ক কে বিশ্লেষণ করে গণমাধ্যম চর্চায় যোগ করেছিলো এক নতুন দিকচিহ্ন।

ম্যাকলুহান বলেছেন বর্ণমালা থেকে সকল মাধ্যম মানুষই তৈরি করেছে। কিন্তু তাঁর অপরিসীম ক্ষমতা মানুষের নিজের সীমাকে সর্বদাই অতিক্রম করেছে। বর্ণমালা থেকে কম্পিউটার মানুষ ও তার পরিবেশকে একই সঙ্গে গভীরভাবে প্রভাবিত এবং রূপান্তরিত করেছে (Because all media, from the phonetic alphabet to the computer, are extensions of man that cause deep and lasting changes in him and transform his environment)।

ম্যাকলুহানের দাবি মানুষ সর্বদাই নিজের আবিষ্কারের দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। যন্ত্রের আবির্ভাবে মানুষের সমস্ত রকম ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। হাত দিয়ে যা করা যেত তা ক্রেন এর মাধ্যমে এখন আরও ক্ষিপ্রতার এর সঙ্গে করা সম্ভব হয়েছে। ম্যাকলুহানের বক্তব্য হলো প্রযুক্তি যত উন্নত হয়েছে মানুষের চেতনায় তার প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। টেলিভিশনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেছেন দৃশ্য ও শ্রাব্য মাধ্যমের এক সম্প্রচার শুধুমাত্র মানুষকে জানায় না, তার মনোজগতকেও বিপুল ভাবে প্রভাবিত করে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিতে নানান সূক্ষ্ম পরিবর্তন নিয়ে আসে। তার অপ্রতিহত এই অসামান্য ক্ষমতা মাধ্যমকেই বার্তা করে তোলে। তৈরি হয় তার সেই প্রবাদপ্রতিম ঘোষণা **'মাধ্যম হল বার্তা' (Medium is the message)**।

ম্যাকলুহান মাধ্যমকে দু'ভাগে বিভাজন করেছেন। একটি হলো ঠান্ডা মাধ্যম অপরটি হলো গরম মাধ্যম। তাঁর কথায় এটা হল 'কোল্ড মিডিয়া' এবং 'হট মিডিয়া'। ঠান্ডা মাধ্যমের শ্রোতা-দর্শকের অংশগ্রহণ অনেক বেশি। মুদ্রণ মাধ্যম, ফটোগ্রাফ, বেতার এবং চলচ্চিত্র হল হট মিডিয়া। আর বক্তৃতা, কার্টুন, টেলিফোন এবং টেলিভিশন হলো কোল্ড মিডিয়া। গরম মাধ্যম হলো হাই-ডেফিনেশন মিডিয়া। কারণ তার মধ্যে উন্নত সেন্সরি ডাটা থাকে। ঠান্ডা মাধ্যমে তুলনায় অনেক লো ডেফিনেশন এবং কম সেন্সারি ডেটা সমৃদ্ধ হয়। ঠান্ডা মাধ্যমে দর্শকদের শ্রোতাদের অনেক বেশি উদ্যোগ নিতে হয়।

প্রযুক্তি গণমাধ্যমকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে এবং এর প্রভাব মানুষের চেতনাতেও পড়েছে। ম্যাকলুহান এই সত্যটিকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন। তার এই ভাবনা পরবর্তীকালে জ্ঞাপন চর্চাকে উৎসাহিত ও একইভাবে উন্নত করেছে।

৪.৩.৫ সারাংশ

কীভাবে গণমাধ্যম এর বিষয়ে উপস্থাপিত হবে তার রূপরেখা নির্ধারণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সমস্ত গণমাধ্যমকেই এই উপস্থাপনা বিন্যাসের কাজটি করতে হয়। সে সংবাদপত্র বা বেতার অথবা টেলিভিশন যাই হোক না কেন। এরই নাম উপস্থাপনা বিন্যাস ইংরেজিতে বলা হয় এজেন্ডা সেটিং তত্ত্ব। এমনকি ডিজিটাল মাধ্যমের ক্ষেত্রে এই প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

এই ধারণা প্রথম সার্থক রূপ পায় বার্নাড কোহেন এর গবেষণায়। কোহেন দেখেছিলেন সংবাদ মানুষের কাছে উঠে আসছে গণমাধ্যম এর মধ্যে দিয়ে। খবরের কাগজ, বেতার অথবা টেলিভিশন দেখেই মানুষ তার চারপাশের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে। আসল কথা গণমাধ্যমে যা পরিবেশিত হবে তাই মানুষের চেতনাকে আচ্ছন্ন করবে। বিভিন্ন জ্ঞাপনবিদের গবেষণার এই উপস্থাপনা বিন্যাসের তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গেও এর যোগ রয়েছে। কারণ গণমাধ্যম যেমন সমাজকে প্রভাবিত করে তেমনই সংস্কৃতির রূপরেখা নির্ধারণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সমাজবাদী ধারণাও গণমাধ্যমকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কাল মার্কস এবং এঙ্গেলসের সাম্যবাদী ভাবনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে গণমাধ্যম সম্পর্কিত সাম্যবাদী তত্ত্ব। সমাজ বিপ্লবের পর যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গঠিত হয় সেখানেই কার্যকরী হয় সাম্যবাদী তত্ত্ব। গণমাধ্যম এই ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করে। সাম্যবাদী তত্ত্বের সারকথা হলো শ্রেণীহীন সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। এই সাম্য শুধু রাজনৈতিক মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয় সাম্য। অন্যান্য যেসব প্রাসঙ্গিক তথ্য আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল। শিকাগো স্কুল, গণমাধ্যম নির্ভর তত্ত্ব ও মার্শাল ম্যাকলুহানের তাত্ত্বিক অবদান।

৪.৩.৬ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উপস্থাপনা বিন্যাস (এজেন্ডা সেটিং) তত্ত্ব কী?

২. সাম্যবাদী গণমাধ্যম তত্ত্বের ভিত্তি কি?

বড় প্রশ্ন

১. উপস্থাপনা বিন্যাস এজেন্ডা সেটিং তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন। আধুনিক গণমাধ্যমের ভূমিকা কী?

২. সাম্যবাদী গণমাধ্যম তত্ত্বে গণতন্ত্রের কতটা পরিপূরক বুঝিয়ে দিন।

৩. ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, শিকাগো স্কুল আলোচনা করুন।

৪.৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১) *Mass Communication Theory,* D. McQuail–Sage.

২) *Communication Theory Today* - Edited by David Cowley and Devid Michel

৩) *গণজ্ঞাপন :* ড: পার্থ চট্টোপাধ্যায়

৪) *জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম*- ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

৫) *গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি* - ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

একক - ৪ ◘ কাল্টিভেশন তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ (Cultivation Theory and Analysis)

গঠন

৪.৪.১ উদ্দেশ্য

৪.৪.২ কাল্টিভেশন তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ (Cultivation Theory and Analysis)

৪.৪.৩ সারাংশ

৪.৪.৪ অনুশীলনী

৪.৪.৫ গ্রন্থপঞ্জি

৪.৪.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ার পরে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন কোল্টিভেশন তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ (Cultivation Theory and Analysis)

৪.৪.২ কাল্টিভেশন তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ (Cultivation Theory and Analysis)

কাল্টিভেশন তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো টেলিভিশনের সামাজিক প্রভাব। সাধারণ মানুষের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম হল টেলিভিশন। ছোট থেকে বড় সবার চোখ আটকে থাকে টেলিভিশনের পর্দায়। দুশোর ওপর চ্যানেল বর্ণময় পসরা নিয়ে হাজির। রিমোট বোতাম টিপলেই হলো। মন-পছন্দ অনুষ্ঠান একের পর এক চলে আসছে পর্দায়।

নেতিবাচক দিক থেকে টিভির অন্য একটা পরিচয় তৈরি হয়েছে। সেটা হলো বোকা বাক্স। অনেকে বলেছেন টিভি দেখে মানুষের শুধু সময়ের অপচয় হচ্ছে তা নয়, মস্তিষ্কের ক্ষমতাও কমে যাচ্ছে। আবার আরেক দল বলছেন সারাক্ষণ বসে বা শুয়ে টিভি দেখার ফলে মানুষ মোটা হয়ে যাচ্ছে। শারীরিক পরিশ্রম হচ্ছে না, তাই মেদবৃদ্ধি পাচ্ছে। একদল মনে করছেন অবিরাম টিভি দেখার ফলে বাচ্চাদের মনের একাগ্রতা কমছে। দৃশ্যে চাঞ্চল্য তাদের মনকেও চঞ্চল করে তুলছে। প্রচুর অ্যাকশনধর্মী ছবি ছোটদের মধ্যে হিংসা বাড়াচ্ছে এবং নৈতিক মূল্যবোধের পতন ঘটছে। টেলিভিশনের এই বিপুল প্রভাবের পর্যালোচনা করে কাল্টিভেশন তত্ত্ব। টেলিভিশন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণে কতটা প্রভাব ফেলছে সেটা যাচাই করে দেখতে চায় এই তত্ত্ব। অধ্যাপক জর্জ গার্বনার ১৯৭৬ সালে দর্শকদের উপরে টেলিভিশন কি প্রভাব ফেলছে তা জানার জন্য গবেষণা চালান। যদিও এই গবেষণাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে এর মূল্য ও প্রাসঙ্গিকতা বিশ্বজুড়েই গুরুত্ব পেয়েছিল।

গার্বনার টেলিভিশনের সামাজিকীরণ এবং ধর্মের সামাজিকীকরণ এর মধ্যে তুলনা করেন।

তিনি টেলিভিশনের সামাজিক ভূমিকাটি বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। অতীতে ধর্ম, সমাজ জীবনে যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল টেলিভিশন বর্তমানে সেই কাজটাই করছে। গার্বনার টেলিভিশনের প্রভাবকে দুটি স্তরে ভাগ করেছিলেন।

প্রথম স্তর কে First order এবং দ্বিতীয় স্তর কে Second-order বলে অভিহিত করেছেন। প্রথম স্তরে দেখা যায় টেলিভিশন দেখার ফলে জগতের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কীরকম হচ্ছে। যেমন পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য আইন-কানুন মেনে চলা ইত্যাদি। দ্বিতীয় স্তরে দেখা হয় বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে তৈরি হচ্ছে।

গার্বনার কাল্টিভেশন তত্ত্বের কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট উল্লেখ করেছিলেন সেগুলি হল :

ক) অন্যান্য গণমাধ্যম এর চেয়ে টেলিভিশনের প্রভাব বেশি কারণ টেলিভিশন এর বিষয়বস্তু বিচিত্র ও বিপুল। বর্ণময় ছবি এর প্রভাব বাড়িয়ে দেয়। সমাজ সংস্কৃতিতে এর ছাপ পড়ে।

খ) টেলিভিশন মানুষের হিংসা প্রবৃত্তি বাড়ায় না, বরং মানুষের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসকে প্রভাবিত করে।

গ) কিছু মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করে চলি। টেলিভিশন এগুলিকে পুষ্ট করে এবং ধরে রাখতে উৎসাহ দেয়। সামাজিক স্থিতিশীলতা বাস্তবতা বজায় রাখার ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। কখনোই তার বিরোধিতা করে না।

ঘ) দিনে চার ঘন্টার বেশি টেলিভিশন দেখলে মানুষ Mean Word Syndrome এর দিকে ঝুঁকবে। Mean Word Syndrome হল সেই ব্যবস্থা যেখানে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রশ্রয় পায়।

ঙ) টেলিভিশন কখনোই বাস্তবকে প্রতিফলিত করে, না পরিবর্তে এক সৃষ্টিমূলক বাস্তবকে তুলে ধরে। যা দেখানো হয় তাই দেখে মানুষ। এই দেখানো পদ্ধতির মধ্যে যুক্ত হয়ে থাকে অন্য আরও প্রচেষ্টা।

কাল্টিভেশনের তারতম্য :

টেলিভিশন কতটা সময় একজন দেখছে সেটা বিবেচনা করা দরকার। যে অনেকক্ষণ রিয়েলিটি শো দেখে সে ভাবতেই পারে মানুষ প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব বেশি পোষণ করে এবং নিজেও স্বার্থকেই বেশি প্রাধান্য দেয়। আবার যে ধ্রুপদী সঙ্গীত নৃত্য প্রভৃতি বেশি দেখে তার মনে হতে পারে মানুষ আনন্দে থাকতেই বেশি পছন্দ করে। আবার যে কম সময় টেলিভিশন দেখে তার মনে হতে পারে মানুষ সহযোগিতা করতে সদা প্রস্তুত। বিভিন্ন বিষয়ে এই কাল্টিভেশন এর তারতম্যকে প্রভাবিত করতে পারে। বিষয়গুলি হলো অনেকটা এইরকম :

১) **সময় :** কত সময় নিয়ে একজন টেলিভিশন দেখছেন সেটা খতিয়ে দেখতে হবে। যারা বেশি সময় নিয়ে দেখছেন তারা হলে হেভি ভিউয়ার্স। আর যারা কম সময় দেখছেন তারা হলেন লাইট ভিউয়ার্স।

২) **পরিবেশ :** মানুষ কেমন পরিবেশে আছে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যারা খারাপ পরিবেশে থাকে তাদের মনে হতে পারে সব কিছুই খারাপ। Mean World Syndrome এ আচ্ছন্ন হয়ে তারা টেলিভিশনে খারাপ বিষয়গুলির দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়।

৩) মেয়েরা: টেলিভিশনে মেয়েদের কোন বিষয়টি দেখানো হবে এবং কীভাবে তা পরিবেশিত হবে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফেমিনিস্টরা বলে টেলিভিশনের অধিকাংশ অনুষ্ঠানে পুরুষশাসিত সমাজের প্রেক্ষাপটে মেয়েদের সমস্যা

তুলে ধরে যা প্রকৃত অবস্থা থেকে অনেক দূরে থাকে। তারা অত্যাচারিত, পুরুষ নির্ভরশীল ও অপমানিত হতে থাকে। তাদের অভিজ্ঞতা হয় Mean World Syndrome এর কাছাকাছি।

৪) অনেকের সঙ্গে বসে টেলিভিশন দেখলে কাল্টিভেশন এর প্রভাব কমে, একা দেখলে প্রভাব বাড়ে।

৫) **বিচিত্র অবস্থার সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার ফারাক :** টেলিভিশনের পর্দায় যা উঠে আসে তার সঙ্গে আমাদের অনেকেরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকে না। এই অভিজ্ঞতা কাল্টিভেশন এর ক্ষেত্র প্রশস্ত করে।

৬) **বয়স :** বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অল্প বয়সী ছেলে-মেয়েদের অভিজ্ঞতা কম থাকে। টিভিতে যা দেখে তাই বিশ্বাস করতে তাদের মন চায়। তাদের মন কল্পনাপ্রবণ, সুন্দর কিছু দেখলে তা বিশ্বাস করতে চায়। সেটা যে সাজানো তা মানতে চায় না। এক্ষেত্রে কাল্টিভেশন এর প্রভাব কম হয়।

বিশ্লেষণ

কাল্টিভেশন তত্ত্বের সমালোচকরা বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ এর ওপর গুরুত্ব দেন। শুধুমাত্র হিংসা বললে সঠিকভাবে কিছুই বোঝায় না, হিংসারও অনেক ধরন আছে। যেমন কার্টুনে যখন হিংসা দেখানো হয়, তার চরিত্র অনেক হালকা, অন্যদিকে বাস্তবে যখন হিংসা দেখানো হয় তার প্রভাব বহুলাংশে বেশি। বাবা মা সন্তানকে মারছে এমন বহু ছবি ভাইরাল হয়ে উঠে আসে পর্দায়। তখন তার সঙ্গে কার্টুন এর হিংসার অনেক পার্থক্য থাকে।

কাল্টিভেশন তত্ত্বের গবেষণায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কাল্টিভেশন এর প্রভাব মাপার ওপরে। শুধুমাত্র কাল্টিভেশন এর মাপ দিয়ে টেলিভিশনের প্রভাব এর সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায় না। যে সমস্ত দর্শক প্রভাবিত হচ্ছে তাদের মানসিক গঠনের ওপরে আগে থাকতেই অন্য কিছুর প্রভাব থাকতেই পারে। একেবারে পরিষ্কার স্লেটের মতন মন নিয়ে তো কেউ টেলিভিশন দেখে না। অনেক দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যবোধ আগে থাকতেই মনের মধ্যে থাকে। দেখতে দেখতে গ্রহণ-বর্জনের পালা চলতেই থাকে। একটা দুটো ক্ষেত্র সমীক্ষায় মানুষ কী উত্তর দিল তা দিয়ে টেলিভিশনের প্রভাব বিষয়ে সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায় না। তবে এই গবেষণার মধ্য দিয়ে টেলিভিশন প্রভাবের খণ্ডচিত্র অবশ্যই পাওয়া যায়।

৪.৪.৩ সারাংশ

কাল্টিভেশন তত্ত্ব ও তার বিশ্লেষণ এই পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে। কাল্টিভেশন তত্ত্বের মূল বিচার্য বিষয় হল সমাজের উপরে টেলিভিশনের প্রভাব। বর্তমানে টেলিভিশন ভীষণ জনপ্রিয় মাধ্যম। সন্ধের পর মানুষের সব সময় টুকু কেড়ে নিয়েছে টেলিভিশন। প্রাইম টাইম চলতে থাকে একটার পর একটা সিরিয়াল। কখনো আকর্ষণীয় রিয়ালিটি শো। এছাড়া বর্ণময় বিচিত্রানুষ্ঠানতো রয়েছে। এই যে মানুষ টেলিভিশন দেখছে তার একমাত্র কারণ হল টেলিভিশনের বিশাল প্রভাব। এই প্রভাব পর্যালোচনা করার জন্যই তৈরি হয়েছে কাল্টিভেশন তত্ত্ব।

জর্জ গার্বনার টেলিভিশনের প্রভাব জানার জন্য গবেষণা করেন। তিনি জানান আগে ধর্ম সমাজ জীবনে যেভাবে প্রভাব ফেলত বর্তমানে টেলিভিশন সেই কাজটাই করছে। গার্বনার কাল্টিভেশন তত্ত্বের কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। কাল্টিভেশন তারতম্যের বিষয়গুলিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন। কাল্টিভেশন

এর প্রভাব মানুষের মনোজগতে বিপুল তরঙ্গ তুলতে পারে। এগুলো বিশ্লেষণ করলে টেলিভিশনের মতো গণমাধ্যমের প্রভাব বুঝতে পারা যাবে।

কাল্টিভেশন তত্ত্বের বিশ্লেষণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেকগুলো বিষয় উঠে আসে। যেমন হিংসা, কার্টুনে যখন হিংসা দেখানো হয় তার প্রভাব আর বাস্তবে যখন হিংসা দেখানো হয় তার প্রভাব কিন্তু কখনোই এক হয় না। কাল্টিভেশন তত্ত্বে এই বিভাজন খুব অস্পষ্ট। এছাড়া মানুষের মনের মধ্যে আগে থাকতেই যেসব ধারণা রয়েছে তার প্রভাবের কথা কাল্টিভেশন তত্ত্বে পাওয়া যায় না। সবচেয়ে বড় কথা শুধুমাত্র ক্ষেত্র-সমীক্ষা দিয়ে কাল্টিভেশন এর গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। আরো অনেক জরুরী বিষয় পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে।

৪.৪.৪ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কাল্টিভেশন তত্ত্ব কী?

২. কাল্টিভেশন তত্ত্ব কি মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে?

বড় প্রশ্ন

১. কাল্টিভেশন তত্ত্ব এবং টেলিভিশনের সম্পর্কটি আলোচনা করুন। এই তত্ত্ব কি গণমাধ্যমের সামাজিক প্রভাব কে বেশি গুরুত্ব দেয়? যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

২. কাল্টিভেশন তত্ত্বটি উদাহরণ সহযোগে বিশ্লেষণ করুন।

৪.৪.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১) *Mass Communication Theory* D. McQuail–Sage

২) *Communication Theory Today* - Edited by David Cowley and Devid Michel

৩) *গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী (অনুবাদ) :* মেলদিন এল কি ফ্ল্যার, সন্দ্রাবল রোকেশ (বাংলা একাডেমি ঢাকা)

৪) *গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি* - ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা প্রকাশনী, কলকাতা)

নোটস্

নোটস্

প্রথম পত্র : দ্বিতীয় পর্যায়

পেপার - **IB**

মিডিয়ার ইতিহাস
History of Media

মডিউল - ১ ◻ ভারতে প্রেসের ইতিহাস

একক - ১ ◻ টাইপসেটিং এবং মুদ্রণ প্রযুক্তির বিকাশ এবং তাদের প্রভাব-বিশেষ উল্লেখ ভারতের ক্ষেত্রে

গঠন

১.১.১ উদ্দেশ্য

১.১.২ প্রস্তাবনা

১.১.৩ ভূমিকা

১.১.৪ সারাংশ

১.১.৫ অনুশীলনী

১.১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১.১.১ উদ্দেশ্য

মুভেবল টাইপ (Movable type) থেকে প্রারম্ভিক মুদ্রণ এর সূচনা ষোড়শ শতকের ভারতীয় ইতিহাসের একটি যুগান্তকারী সময়। এর আগে জ্ঞান সীমিত অবস্থায় সীমাবদ্ধ ছিল কয়েকজনের মধ্যে এবং লিখিত রেকর্ডগুলি ছিল কিছুজনের মূল্যবান সম্পত্তি। তবে মুদ্রণের উদ্বোধন ও বিকাশ ভারতীয় মাটিতে বইয়ের উৎপাদনের হার অনেকটা বাড়িয়েছে এবং আধুনিক যুগের সূচনা করেছে। আমরা এই একক এ ভারতীয় সমাজে মুদ্রণ প্রযুক্তির আবির্ভাব ও তার বিকাশ নিয়ে আলোচনা করবো।

১.১.২ প্রস্তাবনা

ভারতে খবর সরবারহ করার ইতিহাস মুদ্রণ ব্যবস্থা চালু হওয়ার আগে থেকেই খুঁজে পাওয়া যায়। মুদ্রণ,বলতে বর্তমান সময়ে আমরা যা বুঝি তা ভারতে প্রাচীন যুগে যখন রাজা এবং সম্রাটদের শাসন করতেন তখন ছিল না। এটা এমন একটা যুগ যখন শিক্ষা ব্যবস্থা বিস্তৃত ছিল না এবং যোগাযোগ মাধ্যম ও পরিবহন ব্যবস্থা বেশ অপর্যাপ্ত ছিল। সম্রাট অশোক (৩০৪ বি.সি. থেকে ২৩৩ বি.সি.), তাঁর নিজেস্ব যোগাযোগ মাধ্যমের সূচনা করেছিলেন। তাঁর শাসনকালে সমস্ত রাজকীয় নির্দেশ লিখিত ছিল তামার ফলক, শিলা এবং পাথরের স্তম্ভগুলিতে যা আজও বিদ্যমান উত্তর-পূর্বের আফগানিস্তান থেকে দক্ষিণের কর্ণাটক রাজ্যে। তাঁর নির্দেশসমূহ অবহিত এবং শিক্ষিত মানুষজনের মধ্যে রাজকীয় রাজনৈতিক যোগাযোগের উদাহরণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা শুরু হলো ভারতীয় প্রেস। যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যকরভাবে সংগঠিত হয়েছিল। এক রকমের লিখিত খবরের কাগজ প্রচারিত হয়। এটি অবশ্যই উল্লেখনীয় যে সংবাদ-লেখকদের উপস্থাপন ও প্রচারের সর্বাধিক স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। সাংবাদিকতার ইতিহাসবিদদের মতে,রাজা আকবার এর অধীনে সুসংগঠিতভাবে সংবাদ সংগ্রহ করা শুরু হয়েছিল।

১.১.৩ ভূমিকা

এটি একটি সাধারণ বিশ্বাস যে মুদ্রিত বইগুলি প্রথমে তৈরী হয় চিনে এবং সবথেকে প্রাচীনতম মুদ্রিত বই যা কাঠের ব্লক থেকে উতাদিত হয় তার নাম ডায়মন্ড সুত্রা (Diamond Sutra) যা ৮৬৮ এডি তে প্রকাশিত হয়। তবে সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এবং আবিষ্কার এর ফলে এইটা কিছুটা প্রমাণিত হয়েছে যে ভারতীয়রা প্রাচীন কাল থেকেই পুনরাবৃত্তির শিল্প ও ব্লক প্রিন্টিং এর শিল্পের সম্বন্ধে ধারণা ছিল এবং তারা চীনাদের সঙ্গে যৌথভাবে কাঠের ব্লকার মাধ্যমে বৌদ্ধ রচনার প্রকাশনার দায়িত্ব নেন।

হরপ্পার মহেঞ্জোদারো এবং লোথাল থেকে পাওয়া অগুন্তি শীলের আবিষ্কার এই বিষয়টি নিশ্চিত করে যে প্রাক-ঐতিহাসিক দিন থেকে ভারতীয়দের মধ্যে মুদ্রণ শৈলীর মাধ্যমে পুনরাবৃত্তির ধারণাটা তৈরী হয়েছিল। 'মুদ্রা' শব্দটির অর্থ সীলমোহর হিসেবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লেখিত হয়েছে। পরবর্তীকালে সংস্কৃত নাটক মুদ্রা-রাখসা তে 'মুদ্রা' শব্দটি ব্যবহৃত হয় ব্লক থেকে মুদ্রণ করার পদ্ধতিটা বোঝাতে।

ভারতীয় পণ্ডিতরা চীনাদের সাথে যৌথভাবে কাজ করেছিলেন চীনা সংস্করনের ত্রিপিটকের (Tripitaka) প্রকাশনার জন্য যা সংস্কৃত ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয় ৯৭৩- ৮৩ এডি তে। ১,৩০,০০০ টি কাঠের ব্লক কাটা হয় এই প্রকাশনার জন্য এবং সেগুলিকে অন্য একটি বিভাগে সঞ্চিত রাখা হয় অনুবাদ এর দরবারের মাধ্যমে যেইখানে ভারতীয় সন্ন্যাসী এবং তাদের সহকর্মীরা নিয়মিত কাজ করে থাকেন।

ধর এর কামাল মাওলা মসজিদ থেকে পাওয়া পাথরের টুকরো ভারতে এগারো শতাব্দী তে প্রচলিত স্টোন ব্লক প্রিন্টিং এর দিকে আমাদের নজর টানে। মুদ্রণ রোল বই বা একক পাতা যা পাথরের ব্লক থেকে বানানো হতো চিনে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল।

অসংখ্য কাঠের কাজ এবং ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া ব্লক প্রিন্ট মধ্য এশিয়ায় আবিষ্কৃত হয়েছে। এই অঞ্চলটি ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত ছিল যা প্রারম্ভিক ভাবে ভারতের মুদ্রণের উন্নয়ন এবং বিকাশের প্রতি অবদান এর দিকে আমাদের চোখ আকৃষ্ট করে।

প্রমাণ হিসাবে এটি গ্রহণ করা যেতে পারে উপরে উল্লিখিত, যে অনুলিপি এবং ব্লক-প্রিন্টিং এর শিল্প প্রাচীন ভারতে পরিচিত ও চর্চিত ছিল। মধ্যযুগের সময় মোগল ও মারাঠাদের যোগাযোগ হয় ইউরোপীয়দের সাথে। ইউরোপীয় জেসুইটসরা মুদ্রিত বই নিয়ে এসে সেগুলিকে তৎকালীন শাসকদের কাছে উপস্থাপন করেছিলেন। ইউরোপীয়দের সঙ্গে দৃঢ় যোগাযোগ এবং বই মুদ্রণ ও ছাপাখানা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ভারতীয়রাও এই শিল্প প্রবর্তন এর ধারণাকে উৎসাহ দেয়নি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অধ্যয়ন আমাদের আরও ভালোভাবে মুদ্রণ শিল্পের সূচনার বিরুদ্ধে যে সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় কারণগুলি কাজ করছে সেগুলিকে বুঝতে সাহায্য করে। সাধারণত, এটি বলা হয় যে ধর্মীয় সাহিত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং ক্যালিগ্রাফি জন্য ভালবাসা থাকার পাশাপাশি লেখক এবং ক্যালিগ্রাফারের খ্যাতি এবং জীবিকায় যাতে হ্রাস না পরে সেই জন্য ষোড়শ শতাব্দীর আগে ভারতে মুদ্রণ শিল্প তেমন বিকাশ লাভ করতে পারেনি।

ভারতীয় মাটিতে মূলত মুদ্রণের বিকাশ দেশের উপকূলের রেখাগুলির অনুসারে হয়েছে। পশ্চিম উপকূলে গোয়া, কিউইলন, আম্বালাক্কাদুল ও ট্র্যাংকবার এর পাশাপাশি বোম্বাই এবং পুনা আবার পূর্ব উপকূলে ভ্যাপেরি, ফোর্ট সেইন্ট জর্জ, মাদ্রাজের পাশাপাশি ফোর্ট উইলিয়াম, কলকাতা ও শ্রীরামপুরে হয়েছিল।

গোয়া

প্রথম মুদ্রণযন্ত্রটি পর্তুগাল থেকে গোয়ায় পৌঁছেছিল ৬ ই সেপ্টেম্বর ১৫৫৬ এ। ফাদার বেক্কারির দ্বারা সম্পাদিত ১০ নম্বর খন্ডে প্রকাশিত একটি চিঠি যেইটা ফাদার গ্যাস্পার কালাজে সেইন্ট ইগনাটিউস কে ৩০শে এপ্রিল ১৫৫৬ সালে লিখেছিলেন সেখানে এইটা পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যে একটি মুদ্রণযন্ত্র পর্তুগাল থেকে আবিসিনিয়া তে ফাদার জন নুনেস এর তত্ত্বাবধান এ আবিসিনিয়ার সম্রাটদের ইচ্ছাতে পাঠানো হয়েছিল। ফাদার এর সঙ্গে জুয়ান দে বুস্তামন্তে ছিলেন যিনি মুদ্রণ শিল্পটি জানতেন এবং তার সঙ্গে একজন ভারতও ছিলেন যিনি বুস্তামন্তে মুদ্রণ যন্ত্রটি চালু করার কাজে সাহায্য করেছিলেন।

যেই জাহাজটি তাদের কে অ্যাবিসিনিয়ায় নিয়ে যাচ্ছিলো সেইটা গোয়ায় পৌঁছলে, গোয়ার গভর্নর জন নুনেসকে সেখানে কিছুদিনের জন্য থাকার অনুরোধ জানালেন। তার অনুরোধ ফেলতে না পেরে নুনেস গোয়ায় থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। মুদ্রণযন্ত্রটি ১৫৫৬ সালের অক্টোবর থেকে কার্যকরী হলো যখন জন যুক্তি এবং দর্শন এর কিছু থিসিস এর পাতা ছাপানো কাজে হাত দিলেন যা আসলে লোকসমক্ষে হওয়া আলোচনার সারাংশ ছিল।

১৫৫৭ সালে পর্তুগিজ ভাষায় প্রথম জানা বই সেন্ট জ্যাভির্সের 'ডাউট্রিন্স ক্রিস্টা' (Doutrins Christa) গোয়াতে ছাপা হয়েছিল। দুঃখজনক ভাবে এই শিরোনামের কোনও অনুলিপি এখন উপলব্ধ নেই। তবে তামিল ভাষায় অনুবাদ করা 'ডাউট্রিনা ক্রিস্টা' যা ১৫৫৪ সালে লিসবনে মুদ্রিত হয়েছিল সম্প্রতি লিসবনের মিউজু এটনোলজিস দা বেলেমে পাওয়া গেছে।

জন কুইনকেনসিও (John Quinquencio) এবং জন অফ এন্ডেম (John of Endem), যারা মুদ্রাকর হিসেবে পর্তুগাল থেকে গোয়ায় আর্কবিশপ এর সঙ্গে এসেছিলেন তারা গ্যাস্পার ডি লিওর (Gaspar de Leao)এর লেখা 'কমপেন্ডিও আধ্যাত্মিক ডি ভিডিও ক্রিস্টাও' (Compendio Spiritual de vide Christao) ২রা জুলাই, ১৫৬১ সালে ছাপিয়েছিলেন। এর একটি অনুলিপি নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে।

১৫৭৮ সালে ডাউট্রিনা ক্রিস্টার একটি তামিল অনুবাদ হেরিক হেনরিক্স দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল। মালবার তামিল অক্ষরে ছাপানো ফাদার সৌজা (Father Souza) লিখেছেন যে 'এটিই প্রথম মুদ্রিত বই যা ভারতের জমিতে জন্মগ্রহণ করেছিল'। যদিও সেন্ট জেভিয়ার্সের ডাউট্রিনা ক্রিস্টা ১৫৫৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, সেই জন্য ফাদার সৌজা 'প্রথম মুদ্রিত বই' বলতে ভারতীয় ভাষায় প্রথম মুদ্রিত বই যা তামিল ভাষায় অনুবাদিত হয়েছিল।

১৫৭৭ থেকে ১৫৭৪ এর মধ্যে একজন স্প্যানিশ ভদ্রলোক জোয়াও গনসালভেস এবং রেভারেন্ড জোয়াও দা ফারিয়া দুজনে মিলে ইন্ডিক টাইপগুলি প্রস্তুত করেন। জোয়াও গনসালেস ভারতে প্রথম মালাবার টাইপ অক্ষর তৈরী করেন যা দিয়ে প্রথম বই ছাপা হয়। পেরো লুইস নামে একজনকে গোয়ায় পাঠানো হয়েছিল জোয়াও গনসালেসকে ভারতীয় বর্ণমালার ব্যবস্থা সম্পর্কে বোঝাতে।

ডাউট্রিনা ক্রিস্টা মালাবার এবং তামিল টাইপ এ ছাপা হয়। বইটির প্রথম আটটি লাইন গনসালভেস গোয়া তে তৈরী করেছিলেন ১৫৭৭ সালে আর বই এর বাদবাকি অংশগুলি ১৫৭৮ সালে কুইলন এ ফারিয়ার দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল। এই বিশেষ খণ্ডটির শুধু ১৬ টি পৃষ্ঠা আছে যা এইমুহূর্তে হার্ভার্ড কলেজ এর গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

আম্বালকাকাদু

কোচিনের আম্বালকাকাদু ও সেই সময় আদি ভারতীয় মুদ্রনের কেন্দ্র ছিল তবে এই জায়গায় কোনও মুদ্রিত বই পাওয়া যায় না। ডাউট্রিনা ক্রিস্টার একটি আলাদা খন্ড যা কোচিনে ছাপা হয়েছিল ১৫৭৯ সালে সেটি ১৫৭৮ সালে ছাপা ডাউট্রিনা ক্রিস্টা বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ নয় বরংচ একটি স্বাধীন কাজ যা মার্কোস জর্জের একটি পর্তুগিজ ভাষার কাজের ১২০ পৃষ্ঠার একটি বিস্তৃত অনুবাদ যা ১৫৬৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি সোরবোনের লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত করা আছে। ফ্লোস সানেটরম নামক আরেকটি এইচ হেনরিক্সে দ্বারা লেখা তামিল বই ১৫৮৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এটি এখন ভ্যাটিকান লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত।

১৬৭৪ সাল অবধি গোয়ায় সক্রিয়ভাবে মুদ্রণ অব্যাহত ছিল কিন্তু ধীরে ধীরে এটি কমে যায় যেহুতু মিশনারীরা ভারতীয় ভাষা শেখার প্রতি একটি উদাসীন মনোভাব দেখায়। ১৬৮৪ সালের একটি ফরমান অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে পর্তুগিজ ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পায় এবং বাকি স্থানীয় ভাষা আস্তে আস্তে তাদের গুরুত্ব হারায় যার ফলে ভারতীয় মুদ্রণের বৃদ্ধি এবং বিকাশ কিছুটা আঘাত পায়।

ক্যাথলিক মিশনারিদের মতো ডেনিশ প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারিরাও ভারতে মুদ্রণ প্রবর্তনের কাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ডেনিশ প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারিরা তাদের ধর্ম প্রচারের জন্য স্থানীয় লোকেদের ভাষা শেখেন তাদের সামাজিক প্রথা এবং ধর্মের সাথে পরিচিত হন এবং মুদ্রণ চালু করার চেষ্টা করেন। বার্থোলেমেও জিগেনবালগ ১৭০৬ সালে ভারতে পৌঁছলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচার করার জন্য খ্রীষ্টান সাহিত্যগুলিকে ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন। জিগেনবালগ ২২শে আগস্ট ১৭০৮ সালে মালাবার ও পর্তুগিজ প্রেস তৈরি করার দাবি করেন এবং ১৭০৯ সালে সমস্ত প্রটেস্টান্ট ইউরোপিয়ান দেশগুলি কে তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার প্রার্থনা করেন। জিগেনবালগ ও এফ ই গ্রউন্ডলার বারংবার একটি মুদ্রণ প্রেস এর দাবি করতে থাকলেন। এ ডব্লিউ বেহমে নামে ডেন্মার্কএর রাজা জর্জ এর জার্মান যাজক তাদের মুদ্রণ যন্ত্রের দাবি তে সফলতা লাভ করলেন যখন সোসাইটি ফর প্রমোশন অফ খ্রীষ্টান নলেজ ইংল্যান্ড থেকে একটি মুদ্রণ যন্ত্র, ১০০ রীম কাগজ আর, ২১৩ টি পর্তুগিজ ভাষায় নিউ টেস্টামেন্ট ও একজন জোন্স ফিংক নামক মুদ্রাকরকে ভারতে পাঠালেন।

ট্র্যাংকবার

মুদ্রাকর বাদে এই সমস্ত জিনিস পরের বছর ভারতে আসে। ফিঙ্ক, ভারতে যাওয়ার পথে কেপ অফ গুড হোপের কাছে জ্বরের কারণে মারা যান। মুদ্রণ যন্ত্রটি ট্র্যাংকবারে (মাদ্রাজ) ১১ জুন ১৭১৩ সাল থেকে কাজ শুরু করে দেয় একজন জার্মান প্রিন্টারের সহায়তায় যিনি তখন একটি ডেনিশ সংস্থার সাথে কাজ করতেন। তারা জোরেশোরে মালাবর টাইপ তৈরি করতে শুরু করেন এবং তারা খুব তাড়াতাড়ি একটি ফাউন্ড্রি প্রতিষ্ঠা করেন। ১১ ই ডিসেম্বর, ১৭১৩ সালে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে সেই ছয় মাসের মধ্যে প্রেস এবং ফাউন্ড্রি ভাল অগ্রগতি করেছিল। তারা 'দি এবোমিনেশন অফ পেগানিজম এন্ড দি ওয়ে ফর দি পেগানস টু বি সেভড' ছেপেছিলেন প্রথমবারের তৈরি টাইপ দিয়ে যা পরীক্ষামূলক ভাবে তৈরী করা হয়েছিল। ১৭১৪ সালে তামিল ভাষায় দি নিউ টেস্টামেন্ট ও দি ফোর এভাঞ্জেলিস্টস এন্ড এক্টস অফ দি অপোস্টলস ছাপা হয়েছিল। শ্রীরামপুর কলেজ এর গ্রন্থাগার এ সেটি এখন সংরক্ষিত আছে। ভারতে তারা মিশন এর স্বার্থে একটি পেপার মিল তৈরী করার চেষ্টা করেন।

খ্রিস্টান ফ্রেডরিক শোয়ার্জ নামক একজন ডেনিশ মিশনারি যিনি তাঞ্জোরের রাজা সার্ফজি ভেঁসলের শিক্ষক ছিলেন, তিনি তাকে প্রভাবিত করেন সংস্কৃত ও মারাঠি ভাষায় বই ছাপার জন্য একটি মুদ্রণ প্রেস খোলার জন্য। মারাঠি ও সংস্কৃত ভাষায় যেই বইগুলি এই মুদ্রনালয় থেকে উন্নিশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ছাপা হয়েছিল সেইগুলি হলো যেকানাথের যুদ্ধ কাণ্ড (১৮০৯), মাঘার শিশুপাল বধ (১৮১২), তাছাড়া কারিকাভালি ও মুক্তভালি। এই প্রেস এ যেই দেবনাগরী টাইপ ব্যবহার করা হয়েছিল সেইগুলি চার্লস উইলকিন্স নামক একজন ভদ্রলোক কাস্ট করেছিলেন।

মাদ্রাস

মাদ্রাসের প্রথম মুদ্রণালয় ভাপেইরি তে শুরু হয় যার নাম পরবর্তীকালে ডাইসেশন প্রেস নামে প্রসিদ্ধি পায়। মাদ্রাসে তামিল ভাষার টাইপগুলি কাস্ট করা হয় এবং ভাপেইরি তে ব্যবহার করা হয় ১৮৭০ সাল অব্দি। ভ্যাপেরইর মুদ্রণালয় তৈরী করার পেছনে একটা গল্প আছে। বলা হয় যে ১৭৬১ সালে যখন স্যার আয়রে কুটি ফ্রেঞ্চদের কাছ থেকে পন্ডিচেরীর আধিপত্য নেন সেই সময় গভর্নর এর বাড়িতে উনি একটি মুদ্রণ প্রেস ও কিছু টাইপ পান। এইগুলিকে উনি মাদ্রাজে নিয়ে আসেন কিন্তু ফোর্ট সন্ত জর্জ এর আধিকারিকরা সেইটা কে মুদ্রাকর না থাকার কারণে ব্যবহার করতে পারেননি। তামিল পন্ডিত ফ্যাব্রিকস সেই সময় ভ্যাপেরইতে থাকতেন এবং তাকে এই মুদ্রণযন্ত্রটির দায়িত্ব দেওয়া হলো এই শর্তে যে তিনি প্রয়োজনে কোম্পানির মুদ্রণের কাজ করবেন। ভ্যাপেরইতে থাকাকালীন ফ্যাব্রিকস তার একটি স্তবগানের বই ও তামিল ইংরেজি অভিধান ছাপান। মাদ্রাসের ফোর্ট সেইন্ট জর্জ কলেজ ১৮১২ সালে স্থাপিত হয় এবং এই কলেজের প্রেস তেলুগু ও কন্নড ভাষায় ছাপানো হয়। এই কলেজটি কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এর নমুনায় তৈরী করা হয়েছিল।

বম্বে

বম্বেতে প্রথম মুদ্রণ চালু করার চেষ্টা ১৬৭৪-৭৫ সাল নাগাদ হয়। ভীমজি পারেখ নামক একজন গুজরাটি বণিক এর প্রবর্তক ছিলেন। উনি হিন্দু ধর্মের গ্রন্থগুলিকে ছাপানোর সিদ্ধান্ত নিলেন যেহেতু এই গ্রন্থগুলির চাহিদা বাজারে সেই সময় ছিল। সে অনুযায়ী তিনি একটি প্রেস আমদানি করেছিলেন এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে অনুরোধ করেছিলেন বম্বেতে একটি সক্ষম প্রিন্টার কে পাঠানোর যার জন্য তিনি তাকে বছরে ৫০ পাউন্ড স্টার্লিং করে তিন বছর দেওয়ার জন্য রাজি ছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভীমজির ইচ্ছেগুলিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন এই ভেবে যে এই পদ্ধতিতে তারা খ্রীষ্টান সাহিত্য ছাপাতে সক্ষম হবেন যা খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে। ৩ রা এপ্রিল, ১৬৭৪ সালের একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে হেনরি হিলস নামক একজন মুদ্রাকরকে প্রেস, টাইপ ও অন্যান্য জরুরি জিনিসপত্র নিয়ে বম্বেতে পাঠানো হয়। জেনারেল আউংগেয়ার যিনি বম্বের গভর্নর ছিলেন তিনি মুদ্রণ শিল্প কে আরো বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং রাজ্যের কিছু কাগজ ছাপা শুরু করেছিলেন।

বম্বে টাইমস এর সম্পাদক, জর্জ বুইস্ট, বলেছেন যে ক্যালেন্ডার ফর দি ইয়ার অফ আওয়ার ল্যান্ড ১৭৮০ বম্বের প্রথম মুদ্রিত বই। বইটির ৩৪ ঠা পৃষ্টা নিয়ে মুদ্রিত হয়েছিল। দি কুরিয়ার প্রেস বম্বের একটি প্রধান মুদ্রণালয় ছিল এবং তার মালিক তাদের ব্যবসার স্বার্থে গুজরাটি ও মারাঠি টাইপ এ ছাপার সিদ্ধান্ত নেন। মারাঠি ভাষায় প্রথম বিজ্ঞাপন ১৮০২ সালে বম্বে কুরিয়ার নামক উক্তি খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়।

টাইপোগ্রাফিকাল এর পাশাপাশি লিথোগ্রাফিক্যাল প্রিন্টিং বম্বের নেটিভ এডুকেশন সোসাইটির প্রেসে করা হতো, কিন্তু টাইপের আকার বড় হওয়ার কারণে অনেক কাগজের প্রয়োজন ছিল যার বেশি টাকা খরচ হতো। সেই জন্য কলকাতা থেকে ছোট ধরণের টাইপ আনানো হয়। লিথোগ্রাফিক মুদ্রণের জন্য কালি এবং পাথর ছিল প্রয়োজনীয়

উপাদান। কালি ও লিথোগ্রাফিক পাথর ভারতে উতাদিত হওয়া শুরু হয় ১৮২৬ সাল থেকে এবংতখন থেকে তারা ইংল্যান্ড থেকে আনা পাথরকে প্রতিস্থাপন করে।

বেঙ্গল

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৫ সাল থেকে বাংলার প্রশাসন পরিচালনার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করে যার ফলের তাদের সরকারী কর্মচারীরা এই স্থানান্তর এই প্রদেশের ভাষা শেখা শুরু করেন। এই ভাষা শেখার উদ্যোগ বাংলা ভাষায় মুদ্রণের উন্নতি ও ক্রমবিকাশে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ১৭৭৮ সালে নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড নামক একজন কর্মচারী, যিনি বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন উনি ইংরেজি ভাষায় - এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজে নামক একটি পুস্তক সংকলিত এবং মুদ্রিত করলেন। এই খণ্ডটি সেইন্ট আন্দ্রেউস প্রেস, হুগলিতে ছাপা হয়েছিল এবং লিসবন এবং লন্ডনের প্রকাশনা বাদ দিলে এটি হলো প্রথম দিকের বাংলা মুদ্রণের গোড়ার দিকের নমুনা। চার্লস উইলকিনস নামক একজন এই বইটিতে টাইপগুলিকে কাস্ট করেছিলেন।

চার্লস উইলকিনস বেঙ্গলে ১৭৭০ সালে আসেন এবং সংস্কৃত ও বাংলা সহ অন্যান্য পূর্বদেশীও ভাষা শেখেন। উইলকিনস ইংরিজি ভাষায় গীতা, হিতোপদেশ ও শকুন্তলার অনুবাদ করেন। উইলকিনস কিছু ভারতীয় কারিগরদের প্রশিক্ষণও দিয়েছিলেন যা শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করেছিল। তিনি শ্রীরামপুরের শ্রী পঞ্চানন কর্মকারকে নিযুক্ত করেছেন তার সহকারী হিসাবে। পঞ্চানন টাইপ কাটার শিল্প শিখলেন তার কাছ থেকে এবং বাংলা টাইপ কাস্ট করলেন কলকাতা ও শ্রীরামপুরে অবস্থিত প্রেসের জন্য। ১৭৮৩ সালে যখন উইলিয়াম জোন্স যখন বাংলায় আসেন সুপ্রিম কোর্ট এর জজ হিসেবে তখন উইলকিন্স তার সাহায্যে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল এর স্থাপন করেন।

১৭৮০ সালে জেমস অগাস্টাস হিকি কলকাতায় প্রথম মুদ্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন তার সংবাদপত্র বেঙ্গল গেজেট ছাপানোর জন্য। ১৭৮৪ সালে ফ্রান্সিস গ্লদিন ক্যালকাটা গেজেট প্রেস এর স্থাপনা করেন যেখান থেকে সমস্ত সরকারি কাগজ ছাপানো হয়। বাংলার ইতিহাসে ১৭৯৯ এবং ১৮০১ সাল মুদ্রণের ইতিহাসে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময় মিশনারিদের একটি গোষ্ঠী গঙ্গার তীরে অবতরণ করেন এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন স্বদেশীয় ভাষা তরুণ সিভিলিয়ানদের শেখানোর জন্য।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্যাপটিস্ট মিশনকে নিজেদের অঞ্চলে তাদের কেন্দ্র খোলার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করায় তারা কলকাতার কাছে ডেনিশ অঞ্চল, শ্রীরামপুরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল। মিশনের প্রধান লক্ষ্য ছিল বাইবেল এবং অন্যান্য খ্রিস্টান সাহিত্যের বাংলা অনুবাদ করা।

ডাঃ, জন থমাস, যিনি ১৭৮৩ সালে বাংলায় এসেছিলেন তিনি শ্রীরামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি ১৭৯২-তার দেশে ফিরে যান এবং পরের বছর উইলিয়াম কেরিকে নিয়ে আসেন। কেরির মূল উদ্দেশ্য খ্রীষ্টান সাহিত্যগুলিকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। শ্রীরামপুর ১৮৬০ শাল অব্দি একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বদেশীয় ফাউন্ডরী হিসেবে কাজ করেছে এবং ১৮০০ থেকে ১৮৩২ সাল পর্যন্ত শ্রীরামপুর প্রেস দুশো থেকে বারোহাজার খন্ড চল্লিশটি ভাষায় ছাপিয়েছে। তাছাড়াও তারা চীনা ভাষায় মুভেবল মেটাল টাইপ অক্ষর তৈরী করেছেন।

১.১.৪ সারাংশ

ভারতীয় পণ্ডিতরা চীনাদের সাথে যৌথভাবে কাজ করেছিলেন চীনা সংস্করনের ত্রিপিটকের (Tripitaka) প্রকাশনার জন্য যা সংস্কৃত ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয় ৯৭৩- ৮৩ এডি তে। ত্রিপিটক প্রকাশনার ক্ষেত্রে কাঠের ব্লক ব্যবহার করা

হয়। ভারতে এগারো শতাব্দীতে যে স্টোন ব্লক প্রিন্টিং এর ও চল ছিল সেইটাও আমরা কামাল মাওলা মসজিদ থেকে পাওয়া পাথরের টুকরোর মাধ্যমে জানতে পারি। ভারতীয় মাটিতে মূলত মুদ্রণের বিকাশ দেশের উপকূলের রেখাগুলির অনুসারে হয়েছে। পশ্চিম উপকূলে গোয়া, কিউইলন, আম্বালাক্কাদুল ও ট্র্যাংকবার এর পাশাপাশি বোম্বাই এবং পূনা আবার পূর্ব উপকূলে ভ্যাপেরি, ফোর্ট সেইন্ট জর্জ, মাদ্রাজের পাশাপাশি ফোর্ট উইলিয়াম, কলকাতা ও শ্রীরামপুরে হয়েছিল। প্রথম মুদ্রণযন্ত্রটি পর্তুগাল থেকে গোয়ায় পৌঁছেছিল। মুদ্রণযন্ত্রটি ১৫৫৬ সালের অক্টোবর থেকে কার্যকরী হলো। ভারতীয় মুদ্রণ ইতিহাসে শ্রীরামপুর মিশনারি ও ড্যানিশ মিশনারিরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

১.১.৫ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন :

১. প্রথম মুদ্রণযন্ত্রটি ভারতবর্ষে কোন দেশ থেকে এসেছিলো ?

২. পর্তুগিজ ভাষায় প্রথম কোন বইটি গোয়া থেকে ছাপা হয়েছিল ?

৩. গোয়াতে মুদ্রণ ব্যবস্থার পতন এর পিছনে কারণগুলি কি কি ?

৪. প্রথম বাংলা ভাষার মুদ্রণালয় এর স্থাপনা কে করেছিলেন ?

৫. বাংলায় শ্রীরামপুর মিশনারি স্থাপনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কে নিয়েছিল ?

বড় প্রশ্ন :

১. ভারতে মুদ্রণ চালুর ইতিহাসটি সংক্ষেপে লিখুন।

২. বাংলা সাংবাদিকতায় শ্রীরামপুর মিশনের অবদান আলোচনা করুন।

১.১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

- মার্গারিটা, বি. (১৯৪০), দ্য ইন্ডিয়ান প্রেস: এ হিস্ট্রি অফ দ্য গ্রোথ অফ পাবলিক ওপিনিয়ন ইন ইন্ডিয়া, জি অ্যালেন এন্ড এডউইন.
- চালাপথী রাও, এম. (১৯৭৪), *দ্য প্রেস.* ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট.
- চক্রবর্তী, এস. (১৯৭৬), *দ্য বেঙ্গল প্রেস, ১৮১৮-১৮৬৮: স্টাডি ইন দ্য গ্রোথ অফ পাবলিক ওপিনিয়ন.*
- কাকবা প্রিয়লকার, এ. (১৯৫৮), *প্রিন্টিং প্রেস ইন ইন্ডিয়া: ইটস বেগিননিংস এন্ড আর্লি ডেভেলপমেন্ট. বম্বে ইউনিভার্সিটি প্রেস.*
- *সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত,* ড: নন্দলাল ভট্টাচার্য — লিপিকা প্রকাশনী, কলকাতা
- *A History of the Press in India*, S. Natarajan, Asia Publishing House

একক : ২ □ ভারতে প্রেসের প্রারম্ভিক ইতিহাস

১.২.০ গঠন

১.২.১ উদ্দেশ্য

১.২.২ প্রস্তাবনা

১.২.৩ মোগল সাম্রাজ্যের সময়কার নিউজলেটার

১.২.৪ হিকির বেঙ্গল গেজেট

১.২.৫ ভারতীয় প্রেসের উপর বিধিনিষেধ

১.২.৬ ১৯ শতকের ভারতীয় প্রেস

১.২.৭ জেমস সিল্ক বাকিংহাম ও রাজা রাম মোহন রায়

১.২.৮ স্যার চার্লস মেটকাফ (**Sir Charles Metcalfe**)

১.২.৯ উপসংহার:

১.২.১০ সারাংশ

১.২.১১ অনুশীলনী

১.২.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১.২.১ উদ্দেশ্য

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের বিবর্তন উন্নয়নমূলক অসুবিধা, নিরক্ষরতা, ঔপনিবেশিক বাধা এবং দমন দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। এটি স্বাধীনতার ধারণাগুলি প্রচার করে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশিষ্ট হাতিয়ার হিসেবে পরিণত হয়। এই এককে আমরা ভারতে মুদ্রণ প্রেস এর আবির্ভাব, ভারতীয় সংবাদপত্রের এর উদ্ভব এবং তার উপর ব্রিটিশ শাসনের লাগানো নানা বিধিনিষেধ নিয়ে আলোচনা করবো। এই আলোচনা ছাত্রদের মধ্যে ভারতীয় সংবাদপত্রের বিবর্তন এর প্রতি একটা প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টি করবে।

১.২.২ প্রস্তাবনা

যেকোন দেশে প্রেসের ক্রমবিকাশ মূলত সেই দেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী হয় এবং সেইজন্য প্রেসের বিকাশ এবং প্রভাব, বুঝতে গেলে আমাদের প্রয়োজন সেদেশে প্রচলিত পরিস্থিতিকে পর্যবেক্ষণ করা। সেইভাবে দেখতে গেলে, ভারতের প্রেসের ইতিহাস ভারতে ব্রিটিশশাসনের একীকরণও বর্ধনের ইতিহাস। মানুষের মন সবসময় কৌতূহলের প্রবৃত্তি দ্বারা প্রভাবিত থাকে যার ফলে জ্ঞানের প্রতি একটা ক্ষুধা তৈরি হয়। প্রথমথেকেই মানুষের জিজ্ঞাসু মনোভাব তাকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে হওয়া ঘটনার প্রতি আকৃষ্ট করে যার ফলে সে সেই ঘটনাগুলি জানার বিভিন্ন উপায় খুঁজে বের করতে থাকে।

১.২.৩ মোগল সাম্রাজ্যের সময়কার নিউজলেটার

ভারত বিজয়ের পরে মুসলিম শাসকরা এমিসরিজ (emissories) এর প্রাচীন পদ্ধতিকে প্রশাসনের এর কাজে একটু উন্নতির সঙ্গে ব্যবহার করা শুরু করেছিলেন।তারা এটিকে একটি সংস্থার রূপ দিয়েছিলেন। রাজ্য নিয়মিত ভাবে আদালতকে বিভিন্ন ঘটনা, অনুষ্ঠান এবং অভিযোগ এর বিষয়ে অবগত রাখার জন্য পৃথক বিভাগ চালু রেখেছিল।এই পৃথক বিভাগগুলো সমস্ত ঘটনা, অনুষ্ঠান এবং অভিযোগ এর বিবরণ সম্পর্কে ওয়াকিয়া অর্থাৎ সংবাদবাহী পত্র হিসেবে একজন ওয়াকিয়া নবিস এর অধীনে রাখা হতো। আধুনিক ভারতীয় সাংবাদিকতার উৎসটি আওরঙ্গজেবের শাসনকালের সঙ্গে জড়িত।

পত্রিকাগুলি আওরঙ্গজেবের সময়ে অনেকটা স্বাধীনতা উপভোগ করেছিল যা স্পষ্টতই পত্রিকায় ছাপা তাঁর এবং তাঁর নাতি আজিম ও শান এর সম্পর্কের বিষয়ে মন্তব্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ১৮২৪ সালে কর্নেল জেমস টড রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি লন্ডনে মোগলে আদালতের (১৬৬০) শতাধিক মূল পাণ্ডুলিপি সংবাদপত্র পেয়েছিলেন। এই কাগজগুলি আকারে আট ইঞ্চি বাই চার এবং অর্ধ ইঞ্চি ও বিভিন্ন হাতে লেখা। তারা বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি দেয় যেমন প্রচার, সম্রাটদের দ্বারা মসজিদ পরিদর্শন, শিকার অভিযান, উপহার এবং উপহার ইত্যাদি।

মোগল শক্তির ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রদেশগুলির মধ্যে ঘন ঘন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। নবাবের মৃত্যু অনিবার্যভাবে প্রতিপক্ষ দাবিদারদের মধ্যে সিংহাসনে উত্তরাধিকারের চাহিদা নিয়ে ঝামেলা শুরু হয়ে যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের পরিষেবাগুলি বিক্রয় করার জন্য এই সুযোগগুলি বিভিন্ন ভাবে কাজে লাগায়। প্রথমত তাদের পরিষেবাগুলি তারা ব্যবহার করে মুনাফার পরিবর্তে যুদ্ধরত গোষ্ঠীগুলিকে বিক্রি করার জন্য এবং পরে শুরু হয় তাদের নিজের স্বার্থ পূরণ করার জন্য সরাসরি হস্তক্ষেপ।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ, ভারতের ভাগ্যকে ব্রিটিশদের হাতে তুলে দেয়। যদিও এই যুদ্ধের আগে মুদ্রণ প্রেস ভাস্কো দা গামা ধর্মীয় বই মুদ্রণের জন্য ভারতে ১৫৫৭ সালে নিয়ে এসেছিলেন। পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বোম্বেতে প্রথম মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে ১৬৭৪ সালে এবং প্রথম অফিসিয়াল প্রিন্টিং প্রেস কলকাতায় স্থাপন করা হয়েছিল ১৭৭৯ সালে। কোম্পানির প্রশাসন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছিল যাতে এই প্রেসগুলি কোনও ভাবে তাদের কোনো কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহৃত না হয়। এই ব্যাপারটাকে বজায় রাখার জন্য যে কোনো নতুন সংবাদপত্র চালু করার ক্ষেত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলাদের তীব্র বাধা ছিল।

১৭৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রাক্তন কর্মচারী উইলিয়াম বোল্টস বিজ্ঞপ্তি দেন যে মুদ্রণ প্রেস না থাকলে মানুষজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা খুবই অসুবিধাজনক। যে কোনো ব্যক্তি যার মুদ্রণের ব্যবসা সম্পর্কে দক্ষতা আছে বা যে একটি প্রেস পরিচালনা করতে পারে তাদেরকে বোল্টস বিশেষ উৎসাহ দেবেন। তিনি মানুষজনকে অনুরোধ জানান যে যার কাছে পাণ্ডুলিপি রূপে যোগাযোগ করার জিনিস আছে, যা কোনো ব্যক্তির সঙ্গে জড়িত বা যা কোনো ব্যক্তির মধ্যে কৌতুহল যোগায় তাদেরকে বোলৎসের বাড়িতে পড়ার ও অনুলিপি নেওয়ার অনুমিতি দেয়া হবে।

বোলৎসের বিজ্ঞপ্তিটি বজ্রের মতো এসেছিল; এটি প্রশাসকদেরকে আতঙ্কিত করেছিল। তাকে নির্বাসন এর নোটিশ পেশ করা হয়েছিল। কোম্পানির মতে তিনি প্রশাসন এর মধ্যে বিরোধিতা ও অসন্তোষ আনার চেষ্টা করেছেন যা তাকে কোম্পানির সুরক্ষা ও কোম্পানির কোনো কাজকর্মের ক্ষেত্রে অযোগ্য প্রমাণ করে।

১.২.৪ হিকির বেঙ্গল গেজেট

পরবর্তী বারো বছর সংবাদপত্র প্রকাশের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। অবশেষে ২৯শে জানুয়ারি, ১৭৮০ সালে প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্র জেমস অগাস্টাস হিকির বেঙ্গল গেজেট বা ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভার্টাইসার শিরোনামে প্রকাশ করেছিলেন। হিকি পেশাগত দিক থেকে প্রিন্টার ছিলেন এবং তার সংবাদপত্রের উদ্যোগ সম্বন্ধে উনি বলেছেন—'আমার কোনও বিশেষ আগ্রহ নেই পত্রিকা মুদ্রণে; আমাকে দাসত্ব করার মতো কঠোর পরিশ্রমের জীবনের উদ্দেশে পুষ্ট করা হয়নি, তবুও আমি আমার দেহকে দাস বানিয়ে আনন্দিত কারণ এর ফলে আমি আমার মন এবং আত্মার স্বাধীনতা কিনতে পারি।'

হিকির 'বেঙ্গল গেজেট বা কলকাতা জেনারেল অ্যাডভারটাইজার ছিল একটি দুটি পাতার সাপ্তাহিক রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক কাগজ সমস্ত পক্ষের জন্য উন্মুক্ত তবে কারুর দ্বারা প্রভাবিত নয়।'

যারা ক্ষমতায় ছিলেন, হিকি তাদের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন এমনকি গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস এবং তাঁর স্ত্রীকেও। এই নীতি শীঘ্রই তাকে সমস্যায় ফেলেছিল এবং ১৭৮০ সালের নভেম্বরে তাঁর পত্রিকাটি জেনারেল পোস্ট অফিসের মাধ্যমে সম্প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তারপরেও হিকি তাঁর পত্রিকার প্রচার চালিয়ে যান, কলকাতার পিয়নদের মাধ্যমে পার্শবর্তী অঞ্চলে সরবরাহ করে। তবে ওয়ারেন হেস্টিংস হিকিকে ও হিকির কাগজ কে ধ্বংস করার জন্য তৎপর হয়ে পড়েন।

হিকিকে একটা কেসে দু বছরের কারাদণ্ড এবং দু হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং আরেকটা কেসে হেস্টিংস- এর মানহানির জন্য পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। অনন্য দুটো বিচারের ক্ষেত্রে তাকে ৮০০০০ টাকা জামিনের জন্য দিতে বলা হয়। এ জাতীয় ভারী জামিনের দাবির প্রতিবাদে হিকি ক্রাউন এর উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখেছিলেন। এই চিঠি বেঙ্গল গেজেটে, ১৭৮১ সালের জুন মাসের ১৬-২৩ তারিখের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল তবে তার প্রার্থনা মনজুর হয়নি। তিনি জামিনের ৮০০০০ টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন যার ফলে, তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল। তবে তিনি কারাগার থেকে কাগজ সম্পাদনা করতে থাকলেন। অন্যদিকে সমানভাবে অদম্য, ওয়ারেন হাস্টিংস মামলার পর মামলা দায়ের করেছেন হিকিকে হয়রান করার জন্য। অবশেষে তার বন্ধু, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, স্যার এলিজা ইম্পের সহায়তায় তিনি শেষ পর্যন্ত হিকির ছাপাখানা কে বিক্রি করতে সফল হন যেহেতু হিকি জরিমানার টাকা দিতে ব্যর্থ হন।

এই সময়ের মধ্যে, ওয়ারেন হেস্টিংস অন্য প্রকাশকদের উতাহিত করেছিলেন। যেমন বি. মেসিঙ্ক এবং পিটার রিড, যারা সেই বছরেই (১৭৮০) 'ইন্ডিয়া গেজেট' নামক একটি সংবাদপত্র শুরু করেছিলেন। তারা কর্তৃপক্ষকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তারা তাদের দ্বারা জারি করা নির্দেশাবলী এবং আইন মেনে চলবেন। চার বছর পরে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় 'কলকাতা গেজেট' নামক সংবাদপত্র চালু করেন। 'মাদ্রাজ কুরিয়ার' মাদ্রাজে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র ছিল যা ১৭৮৫ সালে প্রকাশিত হয় এবং বোম্বেতে 'বোম্বে হেরাল্ড' নামের পত্রিকা ১৭৯১ সালেও এ 'বোম্বে গেজেট' নামের আরেকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

এই জার্ণালগুলোর সম্পাদকেরা যদিও নিয়ম মেনে চলার সম্মতি দেন তবুও প্রায়শই এই সব পত্রিকাগুলোর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষকে আক্রমণ করা হয়। যার ফলে কতৃপক্ষের ক্রোধের মুখোমুখি তাদের হতে হয়। এর ফলস্বরূপ বোম্বে গেজেট ভারী লোকসানের মুখোমুখি হয় আর তার সম্পাদক মিঃ ফার কে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং

তার উত্তরসূরি সহজেই প্রকাশের আগে সচিবের কাছে পরিদর্শনের জন্য প্রুফ শিট জমা দিতে রাজি হন। পরে, কাগজটি সরকারী কাগজ হিসেবে পরিণত হয় যেহেতু ভারী ক্ষতির ফলে কাগজটি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা চেয়েছিল।

HICKY'S
BENGAL GAZETTE;
OR THE ORIGINAL
Calcutta General Advertiser.

A Weekly Political and Commercial Paper, Open to all Parties, but influenced by None,

59 From Saturday March 3d to Saturday March 10th 1781. No. VII

ছবি সৌজন্যে-Archive of University of Heidelberg

১.২.৫ ভারতীয় প্রেসের উপর বিধিনিষেধ

১৭৮৬ সালে, লর্ড কর্নওয়ালিসকে গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত করা হয় এবং তাকে একদিকে একীকরণ এবং অন্যদিকে প্রশাসনের সংস্কার করার দায়ভার দেওয়া হয়। তবে বাংলার ব্যাপারটা আলাদা ছিল। এখানকার সম্পাদকরা জোর গলায় আমলাতান্ত্রিক নিয়মের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন। ১৭৯১ সালে, বেঙ্গল জার্নাল এর সম্পাদক উইলিয়াম ডুয়ানে তার জার্ণালে লর্ড কর্নওয়ালিসের মৃত্যুর একটি ভুয়ো সংবাদ প্রকাশ করেছিলেন। এরপরে, তিনি সম্পাদক হিসাবে চালিয়ে যেতে পারেন নি। এর ই মধ্যে ডুয়ানে আরেকটি কাগজ, ইন্ডিয়ান ওয়ার্ল শুরু করেন ১৭৯৪ সালে। ইতিমধ্যে তার বাড়িতে দু''বার অভিযান চালানো হয় এবং সেইজন্য তিনি কাগজটিকে বিক্রি করে নতুন মালিকের কাছে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নেন এবং কাজটি ১ জানুয়ারি, ১৭৯৫ শেষ হয়। ২৬ শে ডিসেম্বর, ১৭৯৪ সালে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে কোনো কথা ও তথ্য ছাড়া এবং তার ভারতবর্ষের কোনো সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ ছাড়াই তাকে ইংল্যান্ডে নির্বাসন দেওয়া হয়।

১৭৮৯ সালে, লর্ড ওয়েলেসলি গভর্নর জেনারেলের পদ গ্রহণ করেন। সেই সময় ''এশিয়াটিক মিরর'' এর সম্পাদক মিঃ ব্রুস একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন ইউরোপীয় এবং স্থানীয় জনসংখ্যার আপেক্ষিক শক্তি নিয়ে। ওয়েলেসলি ক্ষিপ্ত হয়ে মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় স্যার আলফ্রেড ক্লার্ককে ১৭৯৯ সালের এপ্রিল মাসে লেখেন:

'আমি সম্পাদকদের আচরণের নিয়ম প্রেরণের চেষ্টা করবো কিন্তু আপনি যদি সমস্যাজনক সংবাদপত্রগুলিকে শান্ত করতে না পারেন তাহলে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে তাদেরকে দমন করুন এবং তাদের লোকজনদের ইউরোপে পাঠিয়ে দিন।'

এই হুমকি ততণাতকার্যকর করা হয়েছিল এবং নিয়মের একটি নতুন সেট তৈরি করা হয়েছিল।

১৩ মে, ১৭৯৯ সালে যা প্রেসের স্বাধীনতা হস্তক্ষেপ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। নিয়মাবলীর মধ্যে এইগুলো বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য:

১. একটি সংবাদপত্রের প্রতিটি মুদ্রক তার নাম সংবাদপত্রের নীচে মুদ্রণ করতে বাধ্য।

২. প্রতিটি সম্পাদক এবং কাগজের স্বত্বাধিকারী তার নাম ও থাকার জায়গা থেকে সরকারি সচিবকে সংবাদপত্র সরবরাহ করবে।

৩. রবিবার কোন কাগজ প্রকাশিত হবে না।

৪. কোনও কাগজ আগে প্রকাশিত হবে না যতক্ষণ না এটি সরকারের সচিব বা সরকারের অনুমোদিত কোনও ব্যক্তি দ্বারা পরিদর্শন করা হচ্ছে।

৫. উপরোক্ত যে কোনও বিধিবিধানের বিরুদ্ধে কাজ করার শাস্তি অবিলম্বে নির্বাসন।

এই নতুন নিয়মাবলী সেই সময়ের বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক এবং প্রিন্টারদের জানানো হয়েছিল। সম্পাদকরা এই নিয়মাবলী কে হতাশার চোখে দেখেছিলেন তবুও তারা তাদের বিরক্তি প্রকাশ করেননি।

১.২.৬ ১৯ শতকের ভারতীয় প্রেস

উনিশ শতক ভারতীয় ও ব্রিটিশদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়। একদিকে ব্রিটিশরা তাদের অবস্থান একীভূত করেছিল এবং অন্যদিকে ভারতীয়রা বুঝতে পেরেছিল যে কোনও বিদেশি প্রশাসন তাদেরকে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা

করার দায়িত্ব নিতে পারে না। এই ভাবনা ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন এবং ভারতীয় জনসচেতনতাকে প্রেরণা এবং উতাহ দিয়েছিল।

প্রেসের প্রতি সরকারের দমনমূলক নীতিতে, ১৯ শতকের প্রথম দশকে কোনও বড় পরিবর্তন আনা হয়নি সরকারের তরফ থেকে। সংবাদপত্রকে সন্দেহের চোখে দেখা হতো আর সেই জন্য সংবাদপত্রের তরফ থেকে একটা খবর ও তাদের বিরোধিতা করলে করা ব্যবস্থা নেওয়া হতো। সেই সময়কার প্রেস এর প্রতি প্রশাসনের মনোভাব নিম্নোক্ত মতামতের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়, যা মাদ্রাজের গভর্নর মিস্টার এলিয়ট একটা লেখায় বয়ান করেছেন: "যারা সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা চায় তাদের উদ্দেশ্যগুলি হ"ল পসমাজের সবচেয়ে খারাপ রাজনৈতিক মতবাদ রচার করা, ইউরোপ এবং এশিয়ার কর্তৃপক্ষদের কে অবজ্ঞা করা এবং আইনজীবীদের কে মানহানির কেস দিয়ে লাভের মুখ দেখানো।"

লর্ড ওয়েলেসলি প্রেসের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। এই সমস্ত বিধিনিষেধ কে অমান্য করে প্রচুর পরিমাণে প্যামফ্লেট প্রকাশ করা শুরু হলো যেগুলোতে লেখকদের নাম বা প্রিন্টারদের নাম ছাপা থাকতো না। লর্ড মিন্টো, যিনি লর্ড ওয়েলেসলের পরে গভর্নর জেনারেল হিসাবে আসেন তিনি ১৮১১ সালে কিছু নির্দেশ জারি করে বলেন যে সব মুদ্রণ সংস্থা গুলিকে মুদ্রাকর এর নাম তাদের সংবাদপত্রে ও বিজ্ঞাপনে ছাপতে হবে। যারা এই নির্দেশিকাকে অমান্য করবেন তারা সরকারের তীব্র বিরক্তির মুখে পড়বেন।

১৮১৩ সালে লর্ড হেস্টিংস গভর্নর হন - জেনারেল। তিনি অনেক ধৈর্যের সাথে ভারতীয় প্রেস এর সম্মুখীন হন। ১৮১৪ সালে ডঃ জেমস ব্রাইস "এশিয়াটিক মিরর" এর সম্পাদক হন। কিছুদিন পর তার মিঃ জন আদম, যিনি সেই সময় প্রধান সচিব ও সেন্সর ছিলেন, এর সাথে তীব্র বিরোধ বাধে যার ফলে ডঃ জেমস ব্রাইস, মিঃ জন আদম এর বিরুদ্ধে বারংবার লেখালেখি করেন। কিন্তু তার কোনো উপস্থাপনাই কার্যকরী হয়নি।

প্রাক-সেন্সরশিপ অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখিন হয়। যখন সম্পাদক হিটলিকে তার সংবাদপত্র মর্নিং পোস্ট থেকে কিছু অংশ বাদ দিতে বলা হয়।

তখন তিনি দাবি করেন যে তার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না যেহুতু তিনি প্রকৃতিগতভাবে ভারতের বাসিন্দা (তার বাবা ইউরোপীয় এবং মা ভারতীয়)। প্রেস সেন্সর তখন গভর্নর - জেনারেল কে জানালেন যে তিনি ভারতে জন্মগ্রহণ করা সম্পাদকের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ। লর্ড হেস্টিংস সেন্সর এর পদটিকে বাতিল করেছিলেন ১৮১৮ সালে এবং সম্পাদকদের উপর দায়িত্ব দিয়েছিলেন যে সরকারি কাজের বিরুদ্ধে বা জনসাধারণের জন্য ক্ষতিকারক কোনো খবর যাতে প্রকাশিত না হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কিছু উচ্চ পদস্থ অফিসারদের তার এই মতামত ভালো লাগেনি। সেই জন্য তাদেরকে খুশি করার জন্য হেস্টিংস কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কেমন ধরণের খবর প্রকাশিত করা যাবে না সেইটা তিনি বিস্তারিত জানিয়েছিলেন।

আদালতের পদক্ষেপ ও কার্যনির্বাহী পরিচালক, বা ইংল্যান্ডের অন্যান্য সরকারী কর্তৃপক্ষ যার সাথে ভারত সরকার সংযুক্ত রয়েছে বা রাজনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে বাতিল করার ঘটনা নীয় প্রশাসন বা কাউন্সিলের সদস্যদের (সুপ্রিম কোর্টর বিচারকমন্ডলী বা কলকাতার লর্ড বিশপ) কাজের প্রতি আপত্তিকর মন্তব্য:

আলোচনা যা স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে সন্দেহ তৈরি করতে পারে বা কোনো ধার্মিক চিন্তাভাবনার বিরোধিতা করতে পারে।

কোনো ইংরেজি বা অনন্য ভাষার সংবাদপত্র থেকে কোনো রচনাংশ পুনঃপ্রকাশ করা যা ইংরেজ শাসনের উপর কোনোভাবে আঘাত আনতে পারে।

ব্যক্তিগত কেলেঙ্কারী এবং কিছু মানুষের ব্যক্তিগত মন্তব্য যা সমাজে উত্তেজনা ছড়াতে পারে।

যদিও এই নিয়মাবলীর ফলে প্রেস এর উপর তদারকি করা হয় তবুও মানুষ খোলামনে এই নিয়মগুলিকে স্বাগত জানিয়েছিল। এই নতুন বিধি প্রেসকে আবার অনেকটা খোলা মনে ও স্বাধীন ভাবে কাজ করার দিক দেখিয়েছিলো।

১.২.৭ জেমস সিল্ক বাকিংহাম ও রাজা রাম মোহন রায়

এই সময়কালে তিনজন মানুষ ভারতে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তারা হলেন জেমস সিল্ক বাকিংহাম, উনি প্রেসে স্বাধীনতার অনির্বাচিত যোদ্ধা, দ্বিতীয় রাজা রাম মোহন রায় যার সংবাদপত্র হিন্দু সামাজিক এবং ধর্মীয় বিশ্বাস এর বিরোধিতা করেছিল এবং লর্ড হেস্টিংস যিনি সংবাদমাধ্যমের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করেছেন কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে সরকারের পক্ষে সবচেয়ে কার্যকর সুরক্ষা হলো প্রেসের সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করার স্বাধীনতা যা প্রশাসনের হাত শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে।

ছবি সৌজন্যে- National Portrait

সেই একই বছরে, ১৮১৮ সালে, জেমস সিল্ক বাকিংহ্যাম তার সংবাদপত্র "ক্যালকাটা জার্নাল" শুরু করেছিলেন। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তীব্র সমালোচক ছিলেন এবং কোম্পানির একচেটিয়াকরণ, কর আদায় ইত্যাদি নিয়ে লিখতে লাগলেন। ১৮১৯ সালে তাকে ততালীন মাদ্রাজের গভর্নরকে কলমের মাধ্যমে আক্রমণ করার জন্য সতর্ক করা হয়েছিল এবং ১৮২৩ সালে তাকে তাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হয় যখন জন আদম গভর্নর-জেনারেল হিসেবে কাজ করছিলেন।

ছবি সৌজন্যে- wikipedia

১৮২২ সালে রাজা রাম মোহন রায় "সংবাদ কৌমুদি" নামক এক আঞ্চলিক সংবাদপত্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ফারসি ভাষায় "মিরাট উল আকবার" নামক একটি কাগজও প্রকাশ করেছিলেন।

বাকিংহামের নির্বসনের সঙ্গে সঙ্গেই, জন আদম, যিনি তখন ভারপ্রাপ্ত গভর্নর - জেনারেল ছিলেন, একটি নয় দফা অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন যার ফলে প্রতিটি প্রকাশনার রেজিস্ট্রেশন এবং লাইসেন্স বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। ছয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তি যার মধ্যে রাজা রামমোহন রায় ও ছিলেন তারা যৌথ ভাবে একটি পিটিশন জমা দেন তবে তা বিশেষ গুরুত্ব পায়নি যার প্রতিবাদে রাজা রাম মোহন রায় তার পত্রিকাগুলি বন্ধ করার কথা ঘোষণা করেছিলেন।

১.২.৮ স্যার চার্লস মেটকাফ (Sir Charles Metcalfe)

স্যার চার্লস মেটকাফ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক এর পর গভর্নর জেনারেল হিসেবে ক্ষমতায় আসেন। তার প্রেসের স্বাধীনতার প্রতি একটা বিশেষ ভালোবাসা ছিল। উনি তার কোম্পানির সদস্যদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইউরোপীয় ও

ভারতীয় সংবাদপত্রের জন্য একটা জার্নাল আইন তৈরী করতে চাইলেন। মেটকাফ তার কাউন্সিল এর আইনি সদস্য, মাকাউলিকে নিয়ে বিদ্যমান কঠোর প্রেস আইন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ছবি সৌজন্যে-Wikipedia

মাকাউলি উল্লেখ করেছিলেন যে লাইসেন্সিং বিধিমালাকে বাতিল করা উচিত। লর্ড মাকাউলির মতামতের সাথে একমত হওয়ার সময়, গভর্নর - জেনারেল মতামত দিলেন যে যেহেতু প্রেস আইনগুলি বিভিন্ন প্রদেশে আলাদা রকমের সেই জন্য সমগ্র ভারতের জন্য একটা সাধারণ আইন কার্যকর করা খুবই জরুরি। গভর্নর - জেনারেল কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যরা সরকারের স্থানীয় প্রেসের উপর নজরদারি রাখার দিকে জোর দিয়েছিলেন।

তবে কাউন্সিল একটি নতুন আইন তৈরি করলো যার ফলে ১৮২৩ সালের বেঙ্গল রেগুলেশন এবং ১৮২৫ ও ১৮২৭ সালের বোম্বে প্রেস রেগুলেশনকে বাতিল করা হয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমস্ত অঞ্চলগুলিতে এই আইন প্রযোজ্য করা হয়েছিল এবং প্রিন্টার এবং প্রকাশকের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে একটি ঘোষণা জমা দিতে বলা হয়েছিল। আইন এ এই পরিবর্তন আনার জন্য স্যার চার্লস মেটকাফের কোর্ট অফ ডিরেক্টরস এর অসন্তুষ্টির মুখে পড়তে হয়েছিল। ১৮৩৫ সালের মেটকাফের আইন বেঙ্গল, বোম্বে ও মাদ্রাজে ভারতীয় প্রেসের দ্রুত বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়।

সংবাদমাধ্যমের সমস্ত বিধিনিষেধ অপসারণের খবর যখন ইংল্যান্ডে পৌঁছয়ে তখন কোর্ট অফ ডিরেক্টরস রা ক্ষুব্ধ হয়ে ১৮৩৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারিতে একটি চিঠিতে বলে যে তারা এই পদক্ষেপকে ভালো চোখে দেখছেন না এবং সেই জন্য তার সমর্থন করছেন না। এই পদক্ষেপকে তারা সাময়িক বলেও ব্যাখ্যা করে। প্রেস এর স্বাধীনতার প্রতি তার ভালবাসার জন্য মেটকাফকে খুব ভারী মূল্য দিতে হয়েছিল। প্রেসের তার ন্যায্য দাবি সত্ত্বেও তাঁকে স্থায়ী গভর্নর জেনারেল করা হয়নি। ১৮৩৬ সালে মেটকাফকে মাদ্রাজের গভর্নর-এর দায়িত্ব দেওয়া হয়।

লর্ড অকল্যান্ড এর সময়কালেও প্রেস ও সরকারের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক ছিল। এই সময় পার্সিয়ান ভাষায় পাঁচটি সংবাদপত্র চালু করা হয়। লর্ড এলেনবোরো যিনি ১৮৪২ সালে লর্ড অকল্যান্ডের পরে এসেছিলেন তার প্রেস এর প্রতি কোনো সহানুভূতি ছিলনা। তার ফলে সরকার ও প্রেসের মধ্যে একটা গভীর খাদ তৈরী হয়। সরকার নির্দেশ এর মাধ্যমে অফিসিয়াল অর্ডার এবং আলোচনা প্রকাশনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলো। তার ফলে একটি প্রশ্ন উঠে এলো যে কোন তথ্যটি সরকারী ভাবে প্রেসে জানানো উচিত এবং কোনটি জানানো উচিত নয়?

আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিতে সতী, বর্ণ, বিধবা পুনর্বিবাহ, নীল চাষীদের আন্দোলন এবং তরুণ ম্যাজিস্ট্রেটদের ভুল নিয়ে আলোচনা হতে লাগলো। ১৮৫৬ সালে, লর্ড ক্যানিং গভর্নর জেনারেল হন। তিনি ডালহৌসি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিলেন কিন্তু ডালহৌসির দ্বারা বপন করা বীজগুলি তখন অংকুরিত হয়ে গেছে। আসলে বীজগুলি কোনও বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা নয় বরং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভিত্তিক আদর্শের দ্বারা বপন করা হয়েছিল। সাথে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সরকার প্রেসকে শায়েস্তা করার জন্য একটি বিধি আনলেন যার মিল আমরা ১৮২৩ সালের প্রেস

আইন এর সঙ্গে পাই। সিপাহী বিদ্রোহ সরকারের মনের মধ্যে আশংকার জন্ম দেয় আর তাদের মধ্যে মানুষকে সন্দেহের চোখে দেখার একটা মনোভাব তৈরী হয়। মুদ্রণ প্রেস প্রতিষ্ঠা কে নিয়ন্ত্রণে আনার এবং বইপত্রের সংবহন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ১৮৫৭ সালে লর্ড ক্যানিং 'Act XV of ১৮৫৭' চালু করেন।

আইনটি সব রকমের ভাষার সংবাদপত্রের প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা সে ভারতীয়দের মালিকানার অধীনেই হোক বা ইওরোপীযদের মালিকানার অন্তর্গত। সুতরাং, এই আইনটি অ্যাডামের লাইসেন্সিং বিধিমালার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আবার চালু করে। এই আইনটি সমগ্র ভারতেবর্ষের জন্য প্রযোজ্য ছিল।

১.২.৯ উপসংহার :

সিপাহী বিপ্লবের পর ভারতীয় প্রেস একটি নতুন দিশা পায়। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি জাতীয়তাবাদী মনোভাব ও পদ্ধতি অবলম্বন করে। আঞ্চলিক ভাষাগত সংবাদপত্র আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে যেহেতু তারা জনসাধারণের সঙ্গে তাদের নিজের ভাষায় খবর সরবারহ করতে পারেন।

১.২.১০ সারাংশ

ভারতে সংবাদপত্রের আবির্ভাব মোগল দের সময়ে হয়। তারা প্রশাসনিক কাজকর্মের তথ্যগুলো ওয়াকিয়া অথবা নিউজলেটার হিসেবে রাখতেন। এই থেকেই তথ্য প্রকাশের ব্যাপারটা আসে। কিন্তু ভারতের প্রথম সংবাদপত্র শুরু করেন জেমস অগাস্টাস হিকি নামক একজন ইংরেজ। ক্ষমতাশালী লোকেদের বিরুদ্ধে খবর ছাপানোর জন্য তাকে জরিমানা করা হয় যা দিতে না পেরে অবশেষে তিনি তার সংবাদপত্রটিকে বন্ধ করে দেন। হিকের দেখানো দিক অনুসরণ করে আরো অনেক সংবাদপত্র চালু হয়। পরবর্তীকালে লর্ড ওয়েলেসলির সময় সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে কিছু কঠোর আইন আনা হয়। জেমস সিল্ক বাকিংহাম ও রাজা রাম মোহন রায় তাদের সংবাদপত্রের মাধ্যমে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। জন আদম এর ১৮২৩ সালের লাইসেন্সিং প্রবিধান (এডামস গ্যাগ) প্রেসর উপর নিষেধাজ্ঞা আরো প্রবল করে তোলে। স্যার চার্লস মেটকাফ ক্ষমতায় আসার পর ১৮২৩ সালের লাইসেন্সিং প্রবিধান কে অনেক শিথিল করে দেন যার ফলে কোম্পানির লোকেরা তার উপর ক্ষুব্দ হন।

লর্ড ক্যানিং এর সময় এমন একটি বিধি আনা হলো যার মিল আমরা ১৮২৩ সালের এডামস গ্যাগ এর সঙ্গে পাই। মুদ্রণ প্রেস প্রতিষ্ঠা কে নিয়ন্ত্রণে আনার এবং বইপত্রের সংবহন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ১৮৫৭ সালে লর্ড ক্যানিং 'Act XV ১৮৫৭' চালু করেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি জাতীয়তাবাদী মনোভাব অবলম্বন করলো।

১.২.১১ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন :

১. মুঘল আমলের নিউজ লেটার কী?

২. এই পত্রিকার বিষয় কী হত?

৩. উইলিয়াম বোলটস কে?

বড় প্রশ্ন :

১. মোগলদের সময় প্রশাসনিক কাজকর্মের বার্তাগুলো কি ভাবে প্রচার করা হতো?

২. হিকির বেঙ্গল গেজেটে সম্বন্ধে আলোচনা করুন?

৩. ভারতীয় সাংবাদিকতার জেমস্ সিল্ক বাকিংহামের অবদান কী? ব্যাখ্যা করুন।

৪. চার্লস মেটকাফ কি ভারতীয় সাংবাদিকতাকে মুক্ত করেছিলেন? ব্যাখ্যা করুন।

৫. ভারতীয় সাংবাদিকতায় রামমোহন রায়ের অবদান সংক্ষেপে আলোচনা করুণ।

৬. ভারতীয় প্রেসর উপর ইংরেজদের নিষেধ্যাজ্ঞা জারির কারণগুলি কি কি?

৭. রাজা রামোহন রায় কয়েকটা সংবাদপত্রের বিষয়ে আলোচনা কর?

৮. স্যার চার্লস মেটকাফ কে ভারতীয় প্রেসের মুক্তিদাতা ক্যানো বলা হয়?

১.২.১২ গ্রন্থপঞ্জি

- মার্গারিটা, বি. (১৯৪০). *দ্য ইন্ডিয়ান প্রেস: এ হিস্ট্রি অফ দ্য গ্রোথ অফ পাবলিক ওপিনিয়ন ইন ইন্ডিয়া.* জি অ্যালেন এন্ড এডউইন.
- চালাপতী রাও, এম. (১৯৭৪). *দ্য প্রেস.* ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট.
- চক্রবর্তী, এস. (১৯৭৬). *দ্য বেঙ্গল প্রেস, ১৮১৮-১৮৬৮: স্টাডি ইন দ্য গ্রোথ অফ পাবলিক ওপিনিয়ন.*
- কাকবা প্রিয়লকার, এ. (১৯৫৮), *প্রিন্টিং প্রেস ইন ইন্ডিয়া: ইটস বিগিননিংস এন্ড আর্লি ডেভেলপমেন্ট,* বম্বে ইউনিভার্সিটি প্রেস.
- *সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত :* ড. নন্দলাল ভট্টাচার্য্য (লিপিকা)
- *A History of the Press in India* - S. Natarajan - Asia Publishing House

একক - ৩ □ ১৮৫৭ এর পরে ভারতীয় প্রেসের বিকাশ

১.৩.০ গঠন

১.৩.১ উদ্দেশ্য

১.৩.২ প্রস্তাবনা

১.৩.৩ সংবাদমাধ্যম এবং বিভিন্ন প্রেস আইন

১.৩.৪ ভার্নাকুলার প্রেসের সূচনা

১.৩.৫ ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট

১.৩.৬ উপসংহার

১.৩.৭ সারাংশ

১.৩.৮ অনুশীলনী

১.৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১.৩.১ উদ্দেশ্য

এই একক এর উদ্দেশ্য মূলত ছাত্র ছাত্রীদের ভারতীয় প্রেস সম্বন্ধে অবগত করা। এছাড়াও ছাত্র ছাত্রীরা জানতে পারবে যে ১৮৫৭ এর সিপাহী বিদ্রোহের পর কি ভাবে স্থানীয় ভাষার কাগজগুলি মানুষজনদের মধ্যে জাতীয় সচেতনতা এবং প্রেরণা জাগিয়েছিল ব্রিটিশদের অপ্রীতিকর নীতির বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়াই করার। ব্রিটিশ সরকার ভার্নাকুলার কাগজের প্রভাব কমিয়ে ফেলার জন্য ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট পাস করে যার ফলে ভারতীয় ভাষার খবরেরকাগজের উপর প্রবল প্রভাব পরে। আমরা ব্রিটিশ সরকারকে নীতি এবং ভারতীয় প্রেস এর তাদের নীতির বিরুদ্ধে লড়াই সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

১.৩.২ প্রস্তাবনা

যেই সময় ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়, সেই সময় প্রেসের বিকাশে একটি ধাক্কা লেগেছিলো। ১৮৫৭ এর সিপাহী বিদ্রোহের ফলে প্রেসের স্বাধীনতা কঠোরভাবে কমানো হয়েছিল। ১৮৫৮ সালের আগস্টে ব্রিটিশ সংসদ একটি আইন পাস করে যা কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল। সিপাহি বিদ্রোহের ব্যর্থতার পরে, ভারতের শাসন ব্যবস্থা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে ইংল্যান্ডের রানীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই আইনটি ভারতীয় ইতিহাসে একটি নতুন পর্ব আনলো যা ভারতে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল এবং এই নতুন ব্রিটিশ রাজের শাসনকাল স্থাপিত করেছিল যা ১৯৪৭ এর আগস্ট মাস অব্দি চলেছিল। ১৮৫৯ সালে, লর্ড ক্যানিং ভারতের ভাইসরয় হয়ে আসেন আর ১৮৬০ সালে ইন্ডিয়ান পেনাল কোড পেনাল কোড গৃহীত হয়েছিল। বাংলার বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র যেমন নীল দর্পণ, দ্য হিন্দু,প্যাট্রিয়ট, সোমপ্রকাশ, ইন্ডিয়ান মিরর, বেঙ্গালি এবং আরও কয়েকটি খবরের কাগজ ভারতীয়

জনমতকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। অমৃতবাজার পত্রিকার আবির্ভাব, প্রথমে বাংলা ভাষায় এবং পরবর্তীকালে ইংরেজি ভাষায়, ভারতের সাংবাদিকতার ইতিহাসে একটা আমূল পরিবর্তন এনেছিল। এই সময় দেশে ভারতীয় ভার্নাকুলার সংবাদমাধ্যমে বৃদ্ধি দেখা গেল। এই সময় প্রায় সমস্ত প্রধান ভারতীয় ভাষায় পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। হিন্দি, মারাঠি, উর্দু, তামিল, গুজরাটি, মালায়ালাম, কামদা, পাঞ্জাবি এবং অন্যান্য ভাষার সংবাদমাধ্যমের মধ্যে বাংলা ভাষার সংবাদমাধ্যম অবশ্যই এগিয়ে ছিল।

১.৩.৩ সংবাদমাধ্যম এবং বিভিন্ন প্রেস আইন

লর্ড অকল্যান্ড মেটকাফের পর গভর্নর জেনারেলের পদে ছিলেন ১৮৪২ সাল অব্দি। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম অকল্যান্ডকে মনে রেখেছে তার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলা এবং মেটকাফের উদার আইনকে সমর্থন করার জন্য। তাঁর শাসনকালে তার সঙ্গে কলকাতার বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকদের সঙ্গে এক সৌহার্য্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালে সিপাহীদের দ্বারা একটি বিদ্রোহ শুরু হলো। এই বিদ্রোহ ভারতীয়দের দ্বারা ব্রিটিশদেরকে সশস্ত্র প্রচেষ্টায় বের করার শেষ চেষ্টা ছিল। বিদ্রোহ শুরু হওয়ার সাথে সাথে সরকার অ্যাডাম-এর ১৮২৩ সালের প্রেস আইনগুলির অনুরূপ একটি অধ্যাদেশ দিয়ে প্রেসকে চাপে রাখার ব্যবস্থা করে। এটি ছিল লর্ড ক্যানিংয়ের কুখ্যাত গ্যাগিং আইন, যিনি তখনকার গভর্নর জেনারেল ছিলেন এবং যার অধীনে সংবাদপত্রে এবং সাময়িকীতে নানা বিধিনিষেধ চাপানো হয়েছিল। কোনও কাগজ বা সাময়িকী চালু করার ক্ষেত্রে একটি অনুমতি প্রয়োজন ছিল এবং সরকার এ ধরণের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিচক্ষণতা লক্ষ্য করা শুরু করলো। এই অধ্যাদেশটি সমানভাবে ভারতীয় এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পেপারগুলির উপরে প্রযোজ্য করা হয়। এই সেন্সরশিপটির মেয়াদ ছিল এক বছর। 'গ্যাগিং অ্যাক্ট', সংবাদপত্র প্রকাশকদের লাইসেন্স প্রাপ্ত করা এবং সংবাদ প্রকাশের পূর্বে সরকারকে পরীক্ষার জন্য উপকরণ জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করেছিল। লর্ড ক্যানিং, ভারতে তার সুখ্যাতি বাড়ানোর জন্য ১৩ই জুন, ১৮৫৮ সালে 'গ্যাগিং আইন' টি তুলে নেওয়ার অনুমতি দিলেন।

লর্ড লরেন্স ১৮৬৪ সালে ভারতের ভাইসরয় হন। তাঁর প্রশাসনের সময়ই এক যুগান্তকারী আইন 'প্রেস এন্ড রেজিস্ট্রেশন অফ বুক অ্যাক্টে' পাস হয়েছিল ১৮৬৭ সালে। এই আইন এর সারমর্ম সংবাদমাধ্যমের প্রতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস এবং এটি কী করতে সক্ষম তার উপরেই মূলত। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল সরকারকে মুদ্রণ প্রেসগুলির ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অবহিত রাখা এবং সংবাদপত্রগুলিকে ও মুদ্রণ প্রেসগুলিকে কোনোভাবেই সীমাবদ্ধ না করা। এছাড়াও মেটকাফের লিবারেশন আইন বাতিল করা হয়, যদিও মেটকাফের আইনের এক্ট দুই এর সমস্ত বিধানগুলিকে নতুন আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। জনসাধারণের স্বার্থের উদ্দেশ্যের যুক্তি ব্যবহার করে ব্রিটিশরা 'রুল অফ ল' এর জন্য আবেদন করেছিল এবং যুক্তি দিয়েছিল যে জনসাধারণের শৃঙ্খলা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। ১৮৭০ সাল থেকে, ভারতীয় দন্ডবিধি নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রসারিত করা হয়েছিল সংবাদমাধ্যমের দ্বারা জনসাধারণের শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে 'গঠনমূলক' হুমকিগুলির বিরুদ্ধে উচিত ব্যবস্থা নিতে। এই আইনটির নির্দিষ্ট কিছু প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে আইনের অংশ হিসেবে বেঁচে আছে।

১৮৮১ সালে লর্ড রিপন, যিনি সেই সময় ভাইসরয় হিসেবে এসেছিলেন, তিনি এই আইনটি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। রিপনকে এই আইনটি বাতিল করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। রিপন, তার নীতিমালা অনুসারে সমঝোতা এবং সংস্কার এর পথ অবলম্বন করেছিলেন এবং ভার্নাকুলার প্রেসের মুক্তির জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, কিন্তু আইনটি ভারতীয়দের মধ্যে যে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিলো তা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের লড়াইয়ের জন্মে

একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। জাতীয়তাবাদী প্রেস এবং ব্রিটিশ শাসনের মধ্যেকার সম্পর্কে উত্তেজনা এবং সংঘাত অব্যাহত ছিল।

১৮৩৫ সালে, যখন মেটকাফ ভারতীয় সমগবাদমাধ্যমকে মুক্ত করেছিযেন, সেই সময়টি ভারতীয় প্রেসের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ছিল। ১৮৩৫ থেকে ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ভারতীয় আকাঙ্ক্ষার সাথে কাঁধে কাঁধ দিয়ে চলেছে এবং দেশকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এই সময় প্রেসের সমস্ত বিভাগের উত্থান দেখতে সক্ষম হয়েছে এবং সেই কারণেই মেটকাফকে 'প্রেসের মুক্তিদাতা' বলা হত। সামাজিক এবং ধর্মীয় যুক্তিগুলি গণমাধ্যমে ছাপানো হয়েছিল এবং সংবাদমাধ্যমকে স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম চারদিক থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছে। মেটকাফ এমন একটি নিখুঁত আইন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যা সমগ্র ভারতীয় সাম্রাজ্য জুড়ে অভিন্ন থাকবে। কর্তৃপক্ষ ইংল্যান্ডের শাসকগোষ্ঠী মেটকাফের পদক্ষেপকে অসন্তুষ্টির সাথে দেখেছিলেন, তবুও ভারতীয় সংবাদমাধ্যম আগামী কুড়ি বছর ধরে লড়াই চালিয়ে গেছে। শিক্ষিত ভারতীয়দের কাছে পত্রিকার চাহিদা দিনে দিনে বেড়েছিল এবং সেই জন্য বাংলায় একুশটি ভার্নাকুলার সাময়িকী শুরু হয়।

১.৩.৪ ভার্নাকুলার প্রেসের সূচনা

ভারতে দিগদর্শন ছিল প্রথম দেশীয় সংবাদপত্র। এটি ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর মিশনারির উইলিয়াম ক্যারি, জোশুয়া মার্শম্যান এবং উইলিয়াম ওয়ার্ড শুরু করেছিলেন। তারা শীঘ্রই একই বছরের জুনে একটি অন্য জার্নাল শুরু করেন এবং এর নাম সমাচার দর্পণ রাখেন। কোনো ভারতীয় দ্বারা প্রকাশিত প্রথম ভার্ণাকুলার পত্রিকাটি বাংলা ও ফারসি ভাষায় প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাগুলি আঞ্চলিক সাংবাদিকতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, রাজা রামমোহন রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়। ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাসে রামমোহন রায় অন্যতম শীর্ষ ব্যক্তিত্ব। তিনি একজন সমাজ সংস্কারক যিনি তাঁর জার্নালগুলি প্রচলিত রীতিনীতির সমালোচনা করতে ব্যবহার করেছিলেন বিশেষ করে যে রীতিনীতিগুলি ভারতীয় সমাজকে পিছিয়ে রেখেছিল। তিনি আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন যা যুক্তিসঙ্গত এবং সমতাবাদী রীতি নীতি অনুসরণ করে নিয়ে আসা যায়। হুগলী জেলার রাধানগরে তাঁর জন্ম ১২ ই মে ১৭৭২ সালে হয় এবং ছোটবেলা থেকেই তিনি গতানুগতিক রীতিনীতির শিকার হয়েছিলেন। রাম মোহন তাঁর জার্ণালগুলির দ্বারা চেষ্টা করেছিলেন একদিকে মিশনারিদের সমালোচনার বিরুদ্ধে লড়াই করা, এবং অন্যদিকে ভারতীয়দের শিক্ষিত সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার সম্বন্ধে শিক্ষিত করা। রাম মোহন রায়ের ভার্নাকুলার কাগজপত্রগুলি ভারতীয়দের বিতর্কিত সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে সচেতন করার চেষ্টা করেছিল। এইভাবে, তিনি জাতীয় সমস্যা প্রকাশ্যে এনে মানুষজনকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছিলেন।

রাজা রামমোহন রায় ইংরেজি, বাংলা এবং ফারসি ভাষায় সাময়িকীও বের করেছিলেন। এগুলির নাম ছিল সংবাদ কৌমুদী, ব্রাহ্মীনিক্যাল ম্যাগাজিন, মীরাত-উল-আখবার বঙ্গদূত এবং বেঙ্গল হেরাল্ড। সংবাদ কৌমুদী এবং মীরাত-উল-আখবর চেষ্টা করেছিলেন পাঠকের আগ্রহের বিভিন্ন দিক কে বোঝার চেষ্টা করেছিল। খবরের কাগজগুলিতে যে খবরগুলি প্রধান ভাবে স্থান পেতো তার মধ্যে ছিল স্থানীয় খবর যেমন জন্ম, বিবাহ এবং মৃত্যু তার পাশাপাশি থাকতো ভারত ও বিশ্বের ঘটনাবলির রিপোর্ট; ধর্মীয় এবং সামাজিক সংস্কারের বিষয় নিবন্ধ, বিশেষত অমানবিক সতীদাহ প্রথাকে বন্ধ করার প্রয়োজনিয়তা; এবং শিপিং ও বাণিজ্যিক সংবাদ। পারসী ভাষার সাপ্তাহিক মিরাত-উল-আখবর আন্তর্জাতিক বিষয়গুলিকে তার কাগজে অনেক বেশি জায়গা দিত। এই সংবাদপত্রের প্রথম সংখ্যাটিতে চীন সম্পর্কে একটি নিবন্ধ ছিল এবং রাশিয়া ও তুর্কির শাসকের মধ্যে চাপা উত্তেজনার কারণগুলির বিশ্লেষণ করেছিল।

বাংলায় রাম মোহন রায়ের বাণী খুব শীঘ্রই ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি জাতীয় চেতনাকে আরও শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়েছিল। ভারতীয়দের মালিকানাধীন সংবাদপত্র দেশের বিভিন্ন জায়গায় চালু হতে থাকে। তাদের মধ্যে অনেকে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের পক্ষে ছিলেন। এই জাগরণের ফলে নাগরিকদের সমিতি গঠন হয়েছিল যার সদস্যরা মূলত আইনজীবি, শিক্ষক এবং অন্যান্য বিভাগের ইংরেজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন। এছাড়া এই সময় জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের উত্থানও দেখা যায়।

ব্রিটিশদের কাছে, দেশীয় সংবাদমাধ্যম এমন একটি ভারতকে উন্মোচিত করেছিল যা তারা কেবল ক্ষণিকভাবে আন্দাজ করেছিলেন এবং সঠিকভাবে ভয় পেয়েছিলন। প্রাথমিকভাবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের এই সংবাদপত্রগুলির প্রভাব বুঝতে সময় লাগে যেহুতু তাদের খুব কম আধিকারিকরাই স্থানীয় ভাষা ছিলেন। এর পরে আস্তে-আস্তে যখন ব্রিটিশরা এই সংবাদপরগুলির ক্রমশ বিস্তৃত পাঠকবৃন্দ এবং প্রকাশনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সচেতন হন তখন তারা 'নির্ভরযোগ্য' ভারতীয় মধ্যস্থতাকারীদের দিয়ে এই সংবাদপত্রের বিষয়বস্তুগুলি যাচাই করা শুরু এইটা বোঝার জন্য যে এই পত্রিকাগুলি রাজনৈতিক আন্দোলন বা ব্রিটিশবিরোধী অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলছে কি না। ১৮৭০ এর দশকে, ভারতীয় প্রেসের উপর ইতিমধ্যে যেই যেই কড়া নিয়মগুলি চাপানো হয়েছিল তা ছাপিয়ে গিয়ে ভার্নাকুলার প্রেসর উদ্দ্যেশে এমন একটি আইন আনা হলো যা আগের আইন থেকে আরো প্রখর ছিল।

১৮৬১ সালে, হিন্দু প্যাট্রিয়ট কাগজে দীনবন্ধু মিত্রের লেখা 'নীল দর্পণ' নামক একটি নাটক সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল যা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করার তাগিদ যোগায় যার প্রথম ধাপে জনগণকে সাদা ব্যবসায়ীদের জন্য ফসল চাষ করা বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। নীলকরদের অত্যাচার নিয়ে কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল এই পত্রিকায়। এর ফলস্বরূপ একটি নীল কমিশন গঠন করা হয়। হিন্দু প্যাট্রিয়ট কাগজটি প্রথমে গিরিশ চন্দ্র ঘোষ এর তত্ত্বাবধানে ছিল এবং পরবর্তীকালে এটি আরো বেশি জনপ্রিয়তা হরিশ চন্দ্র মুখার্জীর সম্পাদনায় পায়। পরবর্তীকালে কাগজটি ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর এর অধীনে চলে আসে।

এই কাগজটি সরকারের বাড়াবাড়ির তীব্র বিরোধিতা করেছিল এবং সেই সঙ্গে দাবি করেছিল যে ভারতীয়দের শীর্ষস্থানীয় সরকারী পদে নিয়োগ করা হয়। আরেকটি সমসাময়িক পত্রিকা যা জনগণের মধ্যে খুব জনপ্রিয় ছিল তা হলো দ্য ইন্ডিয়ান মিরর। আরেকটি সাপ্তাহিক কাগজ, অমৃতবাজার পত্রিকা যশোর থেকে শিশির কুমার ঘোষের সম্পাদনায় সেই সময় প্রকাশনা শুরু করে। এই পত্রিকা মূলত মানুষের অভিযোগ দূরীকরণের সাথে সাথে জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং সরকারের সমালোচনা করার উপরে জোর দিয়েছিলো।

১৮৭৪ সালের পয়লা জানুয়ারি শিশির কুমার ঘোষ তার কাগজে (অমৃতবাজার পত্রিকায়) লিখেছেন যে একমাত্র উপকরণ যার সাহায্যে জনগণ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে তা হলো সংবাদপত্র। এই লেখার ফলস্বরূপ সংবাদপত্রের মালিকদের সরকারের রোষের মুখে পড়তে হয়েছিল। ১৮৭১ সালে এই পত্রিকাটি কলকাতায় চলে আসে এবং সেই সময়কার সমস্ত পত্রিকাগুলিকে দমন করার জন্য আরেকটি আইন পাস করা হয়।

ভার্নাকুলার প্রেস এবং ব্রিটিশ প্রেসগুলির মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যাচ্ছিলো। ১৮৫৭ এর বিদ্রোহে পর এই পার্থক্যটি আরো প্রখর হয়ে উঠলো। ভারতের সাংবাদিকরা ছিলেন তাদের জাতীয়তার ভিত্তিতে বিভক্ত ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পরে ইংরেজি সাংবাদিকরা এক কণ্ঠে রক্তের জন্য রক্ত বলে চ্যাঁচাতে শুরু করলেন অন্যদিকে ভারতীয় সম্পাদকরা বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জাতীয়তাবাদী হয়ে ওঠে এবং সরাসরি জনগণের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হয় যেহেতু এটি তাদের নিজস্ব ভাষায় খবর ছাপছিলো। জাতীয় চেতনার উত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত প্রেসগুলি জনগণের মধ্যে প্রভাব ও শক্তি অর্জন করে যার ফলে তারা অনেক বিধিনিষেধের সম্মুখীন হয়।

অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান প্রেস এর ভারতীয় প্রেসের প্রতি ঈর্ষা জন্মায় এবং তারা সরকারের সমর্থন ও পেতে থাকে। সেই জন্য, ১৮২৩ সালের অ্যাডামের 'গ্যাগিং অ্যাক্ট' এবং ১৮৫৭ সালের ক্যানিংয়ের 'গ্যাগিং অ্যাক্ট' মূলত ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র এবং স্থানীয়দের দ্বারা সম্পাদিত সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত এবং ইংরেজদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রের তুলনায় আরও বেশি সচল ছিল। ক্যালকাটা জার্নাল বাদে কোনও ইংরেজি সংবাদপত্রের লাইসেন্স ১৮২৩ সালে বাতিল করা হয়নি। সম্পাদকদের সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছিল, তবে কোনও গুরুতর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ভারতীয় মালিকানাধীন সংবাদপত্রের মধ্যে রাজা রাম মোহন রায় ইতিমধ্যেই মীরাত-উল-আখবরের প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়েছিযেন এবং সংবাদ কৌমুদীর সাথেও তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। অন্যান্য ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিও গ্যাগিং অ্যাক্টগুলি থেকে বাঁচতে কোনো রকমের রাজনৈতিক সংবাদ প্রকাশ করছিলো না। ক্যানিংয়ের 'গ্যাগিং অ্যাক্ট' যখন ১৮৫৮ সালে প্রত্যাহার করা হয়েছিল তখন ইংরেজি এবং ভারতীয় ভাষায় বইয়ের উতাদন,এর সঙ্গে ভারতীয় লেখকদের দ্বারা লেখা সংবাদপত্রগুলি পুনরায় বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। সংবাদমাধ্যমের এই বৃদ্ধির পাশাপাশি মানুষজনের মধ্যে তাদের প্রভাব ও বৃদ্ধি পায়। ১৮৭০ সালে ভারতে ৬৪৪ টি কাগজ ছিল যার মধ্যে ৪০০ টি স্থানীয় ভাষায় ছিল। ভার্নাকুলার জার্নালগুলি ব্রিটিশ জার্নালের চেয়ে বেশি ছিল সংখ্যার এবং প্রভাব বিস্তারে অনেক বেশি সফল ছিল।

১.৩.৫ ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট

ব্রিটিশেরা যখন নিশ্চিত হলো যে স্থানীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলি মানুষজনদের মধ্যে জাতীয় চেতনার জন্ম দিচ্ছি তখন লর্ড লিটন, ১৮৭৮ সালের পয়লা মাচে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট পাস করলেন যা স্থানীয় ভাষার প্রকাশনাগুলির বিরুদ্ধে আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণ আনার ব্যবস্থা নিয়েছিল। এই আইনটিকে অন্যতম কঠোর আইন মনে করা হয় যেহেতু এই আইন সরকারকে আরও বেশি ক্ষমতা দিয়েছিলো রাষ্ট্রবিরোধী লেখাকে কড়া হাথে দমন করা এবং সরকারের প্রতি অসন্তুষ্টি তৈরী করা কাগজের বিরুদ্ধে উচিত পদ্দক্ষেপ নেওয়া। এই আইনটি যেকোন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট অথবা শহরের কোনো কমিশনার বা পুলিশকে ক্ষমতা দিয়েছিল যে প্রকাশক এবং মুদ্রাকরকে যেকোনো নির্দিষ্ট ধরণের লেখা ছাপাতে বাধা দেওয়ার অধিকার তাদের থাকবে, এছাড়াও তাদের বিবেচনার ভিত্তিতে তারা ছাপা কাগজকে এবং মুদ্রণ উপকরণকে বাজেয়াপ্ত বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতাও পেয়েছিলেন। সংবাদপত্র প্রকাশকদের কিছু টাকা সিকিউরিটি হিসেবে জমা রাখা বাধ্যতামূলক ছিল এবং এই টাকাটা চাইলে সরকার বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা রাখতো। সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের সমস্ত প্রুফ শীট প্রকাশের আগেপুলিশের কাছে জমা দেয়া বাধ্যতামূলক ছিল। যে কোনো মামলার ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হত এবং আদালতে এ জাতীয় পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কোনও আপিল করা সম্ভবপর ছিল না। যদি আঞ্চলিক ভাষার সংবাদপত্র কোনও সরকারী সেন্সরের কাছে তাদের কাগজের প্রুফ শিট জমা দিতে পারে তবে এই আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে তারা ছাড় পেতে পারে।

ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট ইংরেজি ভাষার প্রকাশনাকে তার পরিধির মধ্যে আনেনি। স্থানীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলি এই অ্যাক্ট এর বিরোধিতায় ফেটে পরে। ১৮৮০ সালে দেখা যায় যে ভার্নাকুলার কাগজগুলির ভাষা এবং শৈলীতে একটা পরিবর্তন হয়েছে যার ফলে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট আইনটি ১৮৮২ সালের অ্যাক্ট III অনুযায়ী প্রত্যাহার করা হয় এবং পোস্ট অফিসের আধিকারিকদের ক্ষমতা দেওয়া হয় যেকোনো ভার্নাকুলার কাগজে রাষ্ট্রবিরোধী লেখা বেরোলে তাকে বাজেয়াপ্ত করার।

১.৩.৬ উপসংহার

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গঠনে সংবাদমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। রাজা রামমোহন রায় থেকে কেশব চন্দ্র সেন, গোখলে, তিলক, ফিরোজশাহ মেহতা, সুভাষ চন্দ্র বসু, সি আর দাস, দাদাভাই নওরোজি, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সি ওয়াই চিন্তামণি, মতি লাল নেহরু, মদন মোহন মালাভিয়া, এম.কে. গান্ধী এবং জওহরলাল নেহেরুর মতো নেতারা সংবাদমাধ্যমকে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন এবং জাতীয়তাবাদী জনমত সংহত করা এবং জাগ্রত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তারা সরকারের নীতিগুলির সমালোচনা করেছিল এবং জনসাধারণকে রাজনৈতিক সমস্যাগুলি প্রেসের মাধ্যমে বোঝানোর জন্য শিক্ষিত করল। তারা তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং সংগ্রামের পদ্ধতি জনগণদের জানিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করলো। এই জন্য সেই সময়ে দৈনিক এবং সাময়িকী উভয় ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গেল। জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রেসের অবদান মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

নতুন শতাব্দীর আগমনে সংবাদপত্রের সংখ্যা আরো বেড়েছিল বিশেষত ভার্নাকুলার প্রেস যা জাতীয় চেতনা জাগানোর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলো সর্বদা সরকারী ব্যবস্থা এবং নীতি সমর্থন করে চলেছিল যার ফলে ভারতীয় এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সংবাদমাধ্যমের মধ্যে পার্থক্য আরো বেশি জোরদার রূপ নিলো। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পক্ষে কথা বলছিলো আবার অন্যদিকে আংলো ইন্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলো সরকারের পক্ষে কথা বলা চালু রেখেছিলো। সরকারও সেই জন্য অ্যাংলো-ইন্ডিয়ার কাগজপত্রের পক্ষে ছিল এবং ভারতীয় সংবাদপত্রের বিরোধিতা করেছিল।

১.৩.৭ সারাংশ

বর্ণবাদী তিক্ততা যা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে প্রণোদিত করেছিল সেইটাই ১৮৫৮ সালের পরে ইউরোপীয় প্রেসগুলির সর্বদা রাজনৈতিক বিতর্কে সরকারকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। ভার্নাকুলার সংবাদপত্রগুলি ব্রিটিশ সরকারের নীতিগুলির বিরোধিতা করেছেন এবং জনসাধারণকে সচেতন করার চেষ্টা করেছে। ভারতের ততালীন গভর্নর জেনারেল লিটনের ভয়াবহ নীতি এবং ১৮৭৬-১৮৭৭ এর দুর্ভিক্ষের ঘটনাকে যথাযথ ভাবে নিষ্পত্তি না দেওয়াতে ভার্নাকুলার প্রেসে ব্রিটিশ সরকারের নীতির বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক প্রতিবাদের জন্ম দেয়। সেইজন্য রাষ্ট্রবিরোধী লেখাগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এবং সরকারের প্রতি অসন্তুষ্টি কে দমন করার জন্য সকার ১৮৭৮ সালে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট পাস করে। যদিও রাষ্ট্রদ্রোহ সংক্রান্ত আইন ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ১২৪এ তে ১৮৭০ সালে চালু করা হয়েছিল যেই কোনো সরকারবিরোধী কথাবার্তাকে দমন করার জন্য কিন্তু তা সত্ত্বেও ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট বাকস্বাধীনতা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতার উপর আরও বাধানিষেদ আনার জন্যে ব্রিটিশ সরকার দ্বারা পাস করা হয়েছিল। লর্ড রিপন ভার্নালার প্রেস একট তা ১৮৮২ সালে প্রত্যাহার করেছিলেন যার ফলে ভার্নাকুলার কাগজগুলি সেই সময়কার আংলো ইন্ডিয়ান কাগজের মতো সমপরিমান স্বাধীনতার অধিকার অর্জন করবে।

১.৩.৮ অনুশীলনী

১. কোন গভর্নর জেনারেল চার্লস মেটকাফ এর উদারবাদী আইনকে সমর্থন করেছিলেন?

২. সিপাহী বিদ্রোহের পর জন অ্যাডামের গ্যাগিং অ্যাক্ট এর অনুরূপে কোন গভর্নর জেনারেল আইন পাস করেছিলেন?

৩. কোন ভাইসরয় ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট আইনটি পাস করেন?

৪. প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের নাম কি?

৫. সংবাদ কৌমুদী নামক খবরেরকাগজটি কে শুরু করেছিলেন?

১.৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

- *হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান জার্নালিজম*, যে নটরাজন. পাবলিকেশন্স ডিভিশন.
- *এ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান জার্নালিজম*, মোহিত মৈত্র. ন্যাশনাল বুক এজেন্সী.
- *জার্নালিজম ইন ইন্ডিয়া*, রঙ্গস্বামী পার্থসারথি. স্টার্লিং পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড.
- *হিস্ট্রি অফ জার্নালিজম: এন এনালিসিস*, প্রশান্ত কে মাথুর. কনিষ্ক পাবলিশিং হাউস

একক : ৪ □ স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং স্বাধীনতার পর থেকে প্রেসের ভূমিকা

গঠন

১.৪.১ উদ্দেশ্য

১.৪.২ প্রস্তাবনা

১.৪.৩ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতীয় সংবাদমাধ্যম

১.৪.৩.১ লর্ড কার্জন ও অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট

১.৪.৩.২ বাংলার পার্টিশন

১.৪.৩.৩ বাল গঙ্গাধর তিলক

১.৪.৩.৪ প্রেস এবং কংগ্রেসের প্রথম সেশন

১.৪.৩.৫ বিপ্লবী আন্দোলন এবং সংবাদমাধ্যম

১.৪.৩.৬ গান্ধীজি এবং তার সংবাদপত্র

১.৪.৪ স্বাধীনতার পরে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম

১.৪.৪.১ প্রেস কমিশন

১.৪.৪.২ প্রেস কাউন্সিল

১.৪.৪.৩ ইমার্জেন্সির সময় ভারতীয় প্রেস

১.৪.৫ উপসংহার

১.৪.৬ সারাংশ

১.৪.৭ অনুশীলনী

১.৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১.৪.১ উদ্দেশ্য

স্বাধীনতার আগে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, প্রেসের উপর চাপানো নিষেধাজ্ঞা এবং কিছুটা শিথিলকরণের মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায়। প্রেসের মনোভাব কেমন হবে তা মূলত সেই সময় ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এবং মূল্যবোধের উপর নির্ভর করত। ভারতের স্বাধীনতার পর সেই দৃষ্টি কিছুটা পাল্টেছে যদিও এখনো সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা কতটা হবে তা কিছুটা হলেও ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এবং মূল্যবোধ উপর নির্ভর করে। স্বাধীনতার আগে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা মূলত সেই সময়কার গভর্নর জেনারেল এবং ভাইসরয়দের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং স্বাধীনতার পরে, প্রেসের প্রতি মনোভাব মূলত ক্ষমতায় থাকা প্রধানমন্ত্রীর চিন্তা ভাবনার উপরে নির্ভরশীল যদিও ভারত যেহুতু একটি গণতান্ত্রিক দেশ সেহুতু এখানকার সংবাদমাধ্যমেরা বাকস্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষমতার অধিকারী। এই একক এ আমরা ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার আগের ভূমিকা এবং ১৯৪৭ সালের পর তারা কি দিশা নিলো সেই বিষয় আলোচনা করবো।

১.৪.২ প্রস্তাবনা

প্রেস যা চতুর্থ এস্টেট নামেও পরিচিত, তার স্বাধীনতা, যে কোনো গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়। একটি গণতান্ত্রিক সমাজ তাদের সদস্যদের কাছ থেকে স্থানীয় বা জাতীয় বিষয়গুলিতে একটি সক্রিয় এবং বুদ্ধিমান অংশগ্রহণের দাবি করে। গণতান্ত্রিক সমাজ মানুষজনদের অংশগ্রহণ দাবি করে শুধুমাত্র নিখুঁত রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলিতেই নয় বরংচ দেশের জটিল পরিস্থিতিগুলির প্রচেষ্টাতেও। সেই জন্য গণতান্ত্রিক সমাজের যে কোনো ঘটনার একটি স্পষ্ট এবং সত্য বিবরণ দরকার, ঘটনাগুলির পটভূমি এবং তাদের কারণ; ঘটনাগুলির জন্য আলোচনা ও সমালোচনার একটি ফোরাম এবং এমন একটি মাধ্যম দরকার যা ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীগুলিকে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের একটি জায়গা দেবে। এই সমস্ত চাহিদা পূর্ণ করার জন্য অনিবার্যভাবে সংবাদপত্র এবং সাময়িকীগুলি একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

১.৪.৩ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতীয় সংবাদমাধ্যম

১.৪.৩.১ লর্ড কার্জন ও অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট

লর্ড কার্জন ১৮৯৯ সালে ভাইসরয় হিসেবে ভারতে এসেছিলেন। তিনি জনমতের তোয়াক্কা না করেই ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দমিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। ১৯০৩ সালে উনি অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট নামক একটি আইন পাস করেছিলেন। এই আইনটি সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় এক মারাত্মক বিপদ ডেকে এনেছিল এবং সেই জন্য এই আইনটি তীব্র নিন্দার সুম্মুখীন হয়েছিল ভারতীয় সংবাদপত্র এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান প্রেস উভয়ের দ্বারা।

১.৪.৩.২ বাংলার পার্টিশন

জনমত বিবেচনা না করে লর্ড কার্জন বাংলার মতো একটি বৃহত প্রদেশের প্রশাসনের উন্নতির অজুহাতে আরেকটি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সেটি ছিল ১৯০৫ সালে বাংলার পার্টিশন। এর বিরুদ্ধে বাংলায় ব্যাপক আন্দোলন হয়েছিল। লোকজনেরা বুঝতে পেরেছিলেন যে এই বিভাজন করার কারণ মূলত বাংলার জাতীয় চেতনা দুর্বল করার একটি চেষ্টা ছিল। বাংলার বিভাজনের আন্দোলনের সময় ব্রিটিশদের দমনমূলক পদক্ষেপের বিরোধিতা করার জন্য বিপ্লবী এবং তাদের সাংবাদিকতার একটি উত্থান দেখা দিয়েছিলো। বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষের ছোট ভাই ১৯০৬ সালে যুগান্তর নামক একটি সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাঞ্জাবের লালা লাজপত রাই পাঞ্জাবী নামে একটি সংবাদপত্র শুরু করেছিলেন, বাংলার বিভাজনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে আরও প্রখর করার জন্য এই সংবাদপত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। অরবিন্দ ঘোষ তার কাগজ বন্দেমাতরমে তার ব্রিটিশ বিরোধী লেখার জন্য ব্রিটিশদের বিরূপ চোখে পড়েছিলেন।

১.৪.৩.৩ বাল গঙ্গাধর তিলক

বাল গঙ্গাধর তিলক তার মারাঠি সাপ্তাহিক, কেশরী ১ জানুয়ারী, ১৮৮১ সালে শুরু করেছিলেন। তিনি, আগরকর এবং চিপলুঙ্কার সহ ইংরেজিতে মারাঠা নামক আরেকটি সাপ্তাহিক জার্নাল শুরু করেছিলেন। দ্য ডেকান স্টারের সম্পাদক, মহাদেব বল্লাল নামজোশীও তাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন এবং তাঁর কাগজটি ও মারাঠার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। তিলকের কাগজগুলি সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা নেয়। তারা

ছবি সৌজন্যে- Wikipedia

বাংলার পার্টিশন বিরোধী আন্দোলনকে একটি জাতীয় ইস্যু হিসেবে জনসমক্ষে এনেছিলেন। ১৯০৮ সালে তিলক সেডিশন অর্ডিন্যান্স এর বিরোধিতা করেছিলেন। তার ও আগারকার এর ব্রিটিশ বিরোধী লেখার জন্য তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। পরে তিলককে তাকে ছয় বছরের জন্য দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল।

১.৪.৩.৪ প্রেস এবং কংগ্রেসের প্রথম সেশন

প্রেস এবং কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সম্পাদকরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের সময় বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। এই শ্রদ্ধার পরিমাপটি বোঝা যায় যখন আমরা দেখি যে, ১৮৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বম্বেতে অনুষ্ঠিত প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনে যারা প্রথম সারির আসন দখল করেছিল তাদের মধ্যে ভারতীয় সংবাদপত্রের কিছু সম্পাদকও ছিলেন। এই অধিবেশনটিতে প্রথম রেসল্যুশনটি দ্য হিন্দু-র সম্পাদক জি. সুব্রামণ্য আইয়ার করেছিলেন। এই রেজুলেশনে দাবি করা হয়েছিল যে ভারতীয় প্রশাসনের কার্যকারিতা অনুসন্ধানের জন্য সরকারের উচিত একটি কমিটি নিয়োগ করা।

সেই সময় অনেক কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন যারা বিভিন্ন কাগজের সম্পাদক ছিলেন বা কোনো সংবাদপত্রের প্রকাশনা শুরু করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে, বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে ফিরোজশাহ মেহতা, যিনি বম্বে ক্রনিকল শুরু করেছিলেন এবং পন্ডিত মদন মোহন মালাভিয়া, যিনি দৈনিক কাগজ, হিন্দুস্তানের সম্পাদনা করেছিলেন। তিনি এলাহাবাদ থেকে লিডার নামক কাগজ প্রকাশের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছিলেন। মতিলাল নেহরু ছিলেন লিডার কাগজের পরিচালনা পর্ষদের প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন। লালা লাজপত রায় তিনটি জার্নালের প্রকাশনাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন -পাঞ্জাবী, বন্দেমাতরাম এবং লাহোর থেকে প্রকাশিত পিপল। দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানকালে, গান্ধীজি ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন প্রকাশ করেছিলেন এবং ভারতে ফিরে আসার পরে উনি ইয়ং ইন্ডিয়া, নবজীবন, হরিজন, হরিজন সেবক এবং হরিজন বান্ধুর প্রকাশনা শুরু করেছিলেন। সুভাষ চন্দ্র বোস এবং সি আর দাস সাংবাদিক ছিলেন না তবে তারা ফরোয়ার্ড এবং অ্যাডভান্সের মতো কাগজপত্রের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং এই কাগজগুলি পরবর্তীকালে জাতীয় মর্যাদা লাভ করে। জওহরলাল নেহেরু ন্যাশনাল হেরাল্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

১.৪.৩.৫ বিপ্লবী আন্দোলন এবং সংবাদমাধ্যম

ভারতে বিপ্লবী আন্দোলন বন্দুক এবং বোমা দিয়ে শুরু হয়নি বরংচ এটি সংবাদপত্রের প্রকাশের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে প্রথমে উল্লেখ করা যাক যুগান্তর সংবাদপত্রের। এই সংবাদপত্রটি বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, অভিনাশ ভট্টাচার্য এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত কলকাতা শহরে ১৯০৬ সালে শুরু করেছিলেন। বারীন্দ্র কুমার ঘোষ এই সংবাদপত্রের সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

যুগান্তরর পরে, বন্দেমাতরম কাগজটি স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই জার্নালটি সুবোধ চন্দ্র মালিক, সি. আর. দাস এবং বিপিন চন্দ্র পাল ৬ আগস্ট, ১৯০৬ সালে শুরু করেছিলেন। এই কাগজের সম্পাদক

অরবিন্দ ঘোষ, সন্ধ্যা কাগজের সম্পাদক বি উপাধ্যায় এবং যুগান্তর কাগজের সম্পাদক বি. এন. দত্তকে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করার জন্য বিচারের মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

লালা হরদয়াল ঘদর নামক একটি পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেছিলেন। এক বছরের মধ্যে এই জার্নালের কয়েক মিলিয়ন অনুলিপি হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবী, গুজরাটি, মারাঠি এবং ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছিল এবং বিশ্বের যে সমস্ত অঞ্চলে ভারতীয়রা বসবাস করতো সেখানে পাঠানো হয়েছিল। শুরুতে জাণালের অনুলিপিগুলি বিদেশি কাপড়ের পার্সেলগুলিতে গোপনে দিল্লিতে পাঠানো হতো। তাদের আরেকটি উদ্দেশ্যে ছিল গোপনে প্রিন্টিং প্রেস ভারতে পাচার করারও। কিন্তু এরপরে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় যার ফলে বিদেশ থেকে প্রিন্টিং প্রেসের আমদানি করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। লালা হরদয়ালকে আমেরিকাতে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরে তাকে ভারতে নির্বাসনে পাঠানো হয়। তাঁর অন্যতম অনুসারী পণ্ডিত রামচন্দ্র হিন্দুস্তান গদর নামক একটি পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেছিলেন।

ভারতে এমন একটিও রাজ্য নেই যে স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণকে সমর্থন করার জন্য কোনও জার্নাল বা পত্রিকা প্রকাশ করেনি। এ. জি. হর্নিমান বম্বে ক্রনিকলকে জঙ্গি জাতীয়তাবাদি প্রচারের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি নিজে যে সভাগুলিতে সত্যগ্রহের পরিকল্পনা করা হতো তাতে অংশ নিতেন। তিনি তার কাগজে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের স্পষ্ট বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন যার জন্য তাঁর কাগজের একজন সংবাদদাতা, গোভারধন দাসকে সামরিক আদালত তিন বছরের কারাদণ্ডে দন্ডিত করেছিল। হর্নিমানকেও গ্রেপ্তার করে অসুস্থ থাকাকালিনই লন্ডনে নির্বাসিত করা হয়েছিল।

১৯০৫ সালে শ্যামজি কৃষ্ণ ভার্মা লন্ডন থেকে ইন্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট নামক জার্নালের প্রকাশ শুরু করেছিলেন। এটি লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের রিপোর্ট প্রকাশ করত। ১৯০৯ সালে এই জার্নালের দু'জন মুদ্রককে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। শ্যামজি কৃষ্ণ ভার্মা পরে প্যারিসে গিয়ে জার্নালটির প্রকাশনা শুরু করেছিলেন। পরে তাকে জেনেভা চলে যেতে হয়েছিল। তিনি আরও দুই বা তিন বছরের জন্য সেখান থেকে জার্নালটি বের করেছিলেন।

অ্যানি বেসান্ত মাদ্রাজে থাকাকালীন কমনওয়েলথ নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বার করেন ১৯১৪ সালে। সেই বছরেরই জুন মাসে তিনি মাদ্রাজ স্ট্যান্ডার্ড সংবাদপত্রটিকে কিনে নেন এবং তার নাম নিউ ইন্ডিয়া রাখেন। এরপরে এই সংবাদপত্রটি ভারতের স্বাধীনতার বাণী প্রচারের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হয়ে ওঠে। তিনি ভারতের এই স্বাধীনতার নাম রাখলেন 'হোম রুল' রাখেন। ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে তাঁকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের সভাপতি করা হয়।

১.৪.৩.৬ গান্ধীজি এবং তার সংবাদপত্র

গান্ধীজি সম্ভবত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সাংবাদিক ছিলেন এবং তিনি যে সাপ্তাহিকিগুলির সম্পাদনা করেছিলেন তা সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে নামকরা সাপ্তাহিকি। তিনি তার সংবাদপত্রে কোনও বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেননি। গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকাতে থাকাকালীন যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, এইখানে উনি ১৯০৪ সালে "ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন" সংবাদপত্রের সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং ইংরেজী, তামিল ও গুজরাতি ভাষায় তার প্রকাশনা করেছিলেন। "ইয়ং ইন্ডিয়া" এবং "হরিজন" সমস্ত বিষয়ে তাঁর মতামত প্রকাশের একটি শক্তিশালী বাহনে পরিণত হয়েছিল। উনি তার কাগজে সব বিষয় সম্বন্ধেই লিখতেন। উনি সরল ও স্পষ্টভাবে কিন্তু আবেগ এবং ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের সঙ্গে লিখেছিলেন। তার মতে একটি পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষজনের অনুভূতি বোঝা এবং তাকে প্রকাশ করা; তা ছাড়াও মানুষের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু পছন্দসই অনুভূতি জাগ্রত করা এবং তৃতীয়টি হলো নির্ভীকভাবে সামাজিক অপূর্ণতা প্রকাশ করা।

"ইয়ং ইন্ডিয়া" এবং "নবজীবন" নামক দুটি জার্নালকে উনি তাঁর মতামতকে উজ্জীবিত করতে এবং সত্যাগ্রহে জনসাধারণকে শিক্ষিত করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন। ১৯৩৩ সালে গান্ধীজী যথাক্রমে ইংরেজী, গুজরাটি এবং হিন্দিতে "হরিজন", "হরিজনবন্ধু", "হরিজনসেবক" শুরু করেছিলেন। এই সংবাদপত্রগুলি ছিল গ্রামাঞ্চলে অস্পৃশ্যতা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে তাঁর লড়ার হাতিয়ার।

My Mouth is Gagged

HARIJAN

MAHADEV DESAI

ছবি সৌজন্যে-dnaindia.com

১.৪.৪ স্বাধীনতার পরে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম

স্বাধীনতা অর্জনের সাথে-সাথে গণতন্ত্রের মূলনীতি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং জনগণ সার্বভৌমত্ব পায়। জনগণ ও শাসকদের মধ্যেকার বিদ্বেষের অবসান ঘটে এবং সরকার ও প্রেসের সম্পর্কের নতুন অধ্যায় চালু হয়। ভারতীয় প্রেসের অবিরাম দাবিতে সরকার ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে একটি প্রেস আইন তদন্তকরি কমিটি নিয়োগ করে এবং তাকে প্রেস আইনগুলির অনুসন্ধান করা এবং সেগুলিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের প্রস্তাব আনার দায়িত্ব দেয়। এই কমিটি তার প্রতিবেদন ১৯৪৮ সালের মে মাসে জমা দেয়। তার সুপারিশগুলির মধ্যে ছিলো কিছু আইন যেমন ইন্ডিয়ান প্রেস ইমার্জেন্সি পোয়ার্স একট ১৯৩১ ও স্টেটস প্রটেকশন এক্ট ১৯৩৪ কে প্রত্যাহার করা এবং অন্য আইনগুলির মধ্যে পরিবর্তন আনা। একই সাথে কমিটি প্রস্তাব দেয় যে প্রাদেশিক সরকারগুলির প্রেস পরামর্শদাতাদের বৃহত্তর ব্যবহার এবং স্থানীয় প্রেস পরামর্শদাতা কমিটির পরামর্শ ছাড়া কোনো সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ না নেওয়া।

ভারতের খসড়া সংবিধানে বাকস্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু আমেরিকান এবং রাশিয়ান সংবিধানের মতো সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়নি। অনুমান করা হয়েছিল যে প্রেসের স্বাধীনতা, যেটি বৃহত্তর মত প্রকাশের একটি দিক তার স্বাধীনতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবিধান দ্বারা রক্ষিত ছিল। ডঃ আম্বেদকর, তখনকার আইনমন্ত্রী, বলেছিলেন যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দাঁড়িয়ে আছে সংবিধানের ব্যক্তির বাকস্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর এবং সেই জন্য প্রেসের নাগরিকের চেয়ে বেশি অধিকার দাবি করা উচিত নয়। শ্রীরাজাগোপালাচারী একটি প্রেস পার্টিতে এই বিষয় ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে প্রেস কে সংবিধানে উল্লেখ করে সীমাবদ্ধ করা মানে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময় প্রেস বিশাল পরিমাণে স্বাধীনতা উপভোগ করেছিল কারণ পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, বিশ্বাস করতেন যে গণতান্ত্রিক স্থাপনের সফল কার্যকারিতার জন্য গণমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রয়োজন। তাঁর কাছে, সমালোচনা এমন একটি উপায় ছিল যার মাধ্যমে সরকারের কাজকর্মের উন্নতি হতে পারে এবং তাই তিনি সমালোচনাকে উতাহিত করতেন। যদিও নেহেরু উদার ছিলেন এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু তিনি বাধ্য হয়েছিলেন স্বাধীনতা অর্জনের পরে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রতিরোধকারী আইন কার্যকর করার জন্য যাতে তিনি প্রেসে সাম্প্রদায়িক লেখাকে রুখতে পারেন। তিনি সেই সময় দেখেছিলেন যে প্রেস সাম্প্রদায়িক ভাবে ভারতের বিভাজনের পর সৃষ্টি হওয়া সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে আরো কঠিন করে দিচ্ছিলো। সেই জন্য ২৩ শে অক্টোবর, ১৯৫১ তিনি একটি নতুন আইন 'প্রেস এন্ড অব্জেকশনেবল ম্যাটার্স এক্ট' নামে একটি আইন পাস করেন। আইনটির ব্রিটিশদের সময় ১৯০৮, ১৯১০, ১৯৩০ এবং ১৯৩১ সালে পাস হওয়া আইনেই অনুরূপ ছিল। এই আইনটি নেহেরুর প্রেসের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকে খবরের মাধ্যমে উদ্দীপ্ত করা, তার প্রতি উদ্বেগের প্রতিফলন ছিল। এই আইন এর মাধ্যমে আপত্তিকর বিষয়গুলির মধ্যে ছিল কোনও শব্দ, চিহ্ন বা দৃশ্যমান অন্তর্ভুক্ত উপস্থাপনা যা কোনো ব্যক্তিকে হিংস্রতার প্রতি উতাহিত করতে পারে অথবা সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা করতে পারে।

এই আইনটি পাস হওয়ায় সারা ভারত জুড়ে সম্পাদকরা এবং সাংবাদিকরা প্রতিবাদে নেমেছিল। দি অল ইন্ডিয়া নিউজপেপার্স এডিটরস কনফারেন্স, দি ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অফ ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস ও দি ল্যাঙ্গুয়েজে নিউজপেপারস এসোসিয়েশন এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে অনেক প্রস্তাব এনেছিলেন। সুতরাং, যদিও নেহেরু ১৯৫১ এ এই আইনটি পাস করেছিলেন, কিন্তু তিনি এটি জোর দিয়ে প্রয়োগ করেননি। শেষে সাংবাদিকদের শান্ত করার জন্য, নেহেরু, ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে প্রেস কমিশন গঠনের ঘোষণা করেন এবং এই কমিশনে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের নিয়োগ করেছিলেন যাতে তারা ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে পারেন। দ্য প্রেস (অব্জেকশনেবল ম্যাটার্স) আইনটিকে ১৯৫৬ সালে বাতিল করে দেওয়া হয়।

১.৪.৪.১ প্রেস কমিশন

প্রথমবারের জন্য আমাদের প্রেসের কাঠামো এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ তদন্ত ১৯৫২-৫৪ সালে প্রেস কমিশন দ্বারা করা হয়েছিল। কমিশন লক্ষ করলো যে ভারতে সংবাদপত্রের মালিকানা কিছু গোষ্ঠীর হাতে এবং এই প্রবণতা আরও বাড়লে প্রেস এর স্বাধীনতায় বিপদ ডেকে আনতে পারে। প্রেসের বিকাশের জন্য কমিশনের অনেকগুলি সুপারিশের মধ্যে একটি ছিল প্রেস রেজিস্ট্রার এর নিয়োগ। প্রেসের স্ব-নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি প্রেস কাউন্সিল স্থাপন করার কথাও বলা হয়েছিল।

দ্বিতীয় প্রেস কমিশন তার ১৯৮২ সালের প্রতিবেদনে প্রেসকে অন্যান্য শিল্পের থেকে সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। প্রেস কমিশন সমাজে ধারণার বৃহত্তর বিস্তার ও বিকিরণের কথার উপরেও গুরুত্ব দিয়েছিলো। কমিশন স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছিল যে সাংবাদিকতা কেবল একটি শিল্প নয় বরংচ জনসেবা।

কমিশনের অন্যতম প্রধান সুপারিশ ছিল একটি ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কমিশন (এনডিসি) গঠন করা যা ভারতীয় প্রেসের উন্নতিতে কার্যকর হবে। এনডিসি বিশেষত ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংবাদপত্রগুলির জন্য পরামর্শমূলক সহায়তা প্রদান করবে যাতে তাদের মুদ্রণ ও অন্যান্য প্রযুক্তি বিকশিত হতে পারে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল খবরের সঙ্গে বিজ্ঞাপনএর অনুপাত। এই ক্ষেত্রে বড়ো সংবাদপত্রগুলি ৬০:৪০ হারে মাঝারি সংবাদপত্রগুলি ৫০:৫০ হারে এবং ছোটগুলি ৪০:৬০ হারে, বিজ্ঞাপন চাপাতে পারবে এই প্রস্তাব প্রেস কমিশন রেখেছিলো।

এখন, আমাদের কাছে একটি বৃহত এবং উন্নত প্রেস রয়েছে। প্রায় ১,০৫,৪৪৩ টি পত্রিকা ও সাময়িকী ভারতবর্ষে রয়েছে যা ৯২টি ভাষা এবং উপভাষায় প্রকাশিত হয়। অধিকাংশ কাগজপত্র মুদ্রণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে উন্নতমানের প্রযুক্তি ব্যবহার করে।

১.৪.৪.২ প্রেস কাউন্সিল

প্রথম প্রেস কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী একটি প্রেস কাউন্সিল গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কাউন্সিলের জন্য দৃশ্যমান লক্ষ্যগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল: 'সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা করা', 'প্রেসের পক্ষ থেকে জনসাধারণের রুচির উচ্চমানের রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা এবং নাগরিকত্বের অধিকার এবং দায়িত্ব উভয় সম্পর্কে যথাযথ বোধ জাগানো' এবং 'সাংবাদিকতার পেশায় নিযুক্ত সকলের মধ্যে দায়িত্ববোধ এবং জনসেবা বোধ বৃদ্ধিতে উতাহিত করা।' কমিশন, আইনী ভিত্তিতে কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছিল এবং বলেছিলো যে কাউন্সিলের তদন্ত করার আইনি ক্ষমতা থাকবে।

ছবি সৌজন্যে-Nationalheraldindia.com

প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া সর্বপ্রথম ১৯৬৬ সালের ৪ জুলাই গঠিত হয় একটি স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ, অর্ধ বিচার বিভাগীয় সংস্থা হিসাবে এবং সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি, জে আর মুধোলকরকে তার সভাপতি হিসেবে নিয়োগ করা হয়। প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৬৫, কাউন্সিলের নিম্নোক্ত কাজকর্মের বিষয়গুলি তালিকাভুক্ত করেছে:

- সংবাদপত্রকে তাদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে সহায়তা করতে;
- উচ্চ পেশাদার মান অনুযায়ী সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের জন্য আচরণবিধি তৈরি করা;
- সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের পক্ষে জনগণের রুচির উচ্চমানের রক্ষণাবেক্ষণ এবং নাগরিকত্বের অধিকার এবং দায়িত্ব উভয়ই বোধগম্য করানো;
- সাংবাদিকতার পেশায় নিযুক্ত সকলের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও জনসেবা বৃদ্ধির উৎসাহ জোগানো;
- জনস্বার্থ ও গুরুত্বের সংবাদ সরবরাহ ও প্রচারকে সীমাবদ্ধ করতে পারে এমন কোনও পরিণতির দিকে নজর রাখা;
- বিদেশী উৎস থেকে ভারতের যে কোনও সংবাদপত্র বা নিউজ এজেন্সির প্রাপ্ত সহায়তার বিষয়টি পর্যালোচনা করা যদি কেন্দ্রীয় সরকার তাদেরকে তা করার জন্য নির্দেশ করে।

১৯৬৫ সালের আইনের অধীনে গঠিত কাউন্সিলটি ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাস অবধি কার্যকর ছিল। অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থার সময়, আইনটি বাতিল করা হয়েছিল এবং সেই মতো কাউন্সিলটিও বাতিল হয়ে যায়। কাউন্সিল

প্রতিষ্ঠার জন্য একটি নতুন আইন ১৯৭৮ সালে পাস করা হয় এবং ভারতে প্রেসের স্বাধীনতা রক্ষা এবং প্রেসের মান বজায় রাখা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৭৯ সালে এই সংস্থাটি ফের গঠন করা হয়।

১.৪.৪.৩ ইমার্জেন্সির সময় ভারতীয় প্রেস

অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা ঘোষণা ২৬ শে জুন, ১৯৭৫ সালে করা হয়। এই জরুরি অবস্থা ১৯ মাস পর্যন্ত চলেছিল এবং এই সময়টাকে ভারতীয় প্রেসের ইতিহাসের অন্ধকারতম কাল হিসাবে মনে করা হয়। সেই একই দিনে, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে, সরকার 'সেন্ট্রাল সেন্সরশিপ অর্ডার' এবং 'গাইডলাইনস ফর দি প্রেস ইন দি প্রেসেন্ট ইমার্জেন্সি' জারি করে। সেন্ট্রাল সেন্সরশিপ অর্ডার সমস্ত মুদ্রক, প্রকাশক এবং সম্পাদককে সম্বোধন করে, এবং যেকোনো সংবাদ, মন্তব্য, গুজব ও অন্য কোনও দস্তাবেজ যা সরকারের কোনো কাজের সাথে যুক্ত তার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং প্রকাশের আগে সমস্ত সাময়িকী ও পত্রিকাগুলি সরকার দ্বারা অনুমোদিত কর্মকর্তা দ্বারা যাচাইয়ের জন্য প্রথমে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করে। সরকারের প্রধান সেন্সরকে পুরো সেন্সরশিপ অপারেশন তদারকি এবং পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

১১ ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬ সালের আইনসভার অনুমোদনক্রমে, কংগ্রেস সরকার প্রিভেনশন অফ পাবলিকেশন অফ অব্জেকশনেবল ম্যাটার্স এক্ট পাস করেছিল। এই আইন এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ১৯০৮, ১৯১০, ১৯৩০, ১৯৩১, ১৯৩২ এবং ১৯৫১ এর প্রেস দমনের সমস্ত বিধান। এই আইনের সমস্ত বিধান ভারতের সমস্ত অঞ্চলগুলিতে কার্যকর করা হয়েছিল ৮ ই ডিসেম্বর ১৯৭৫ সাল থেকে। এই আইনটি কেন্দ্রীয় সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা দিয়েছিলো যেই কোনো প্রকাশনা যা বিদেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নষ্ট করতে পারে, ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার ক্ষতি করে, পাবলিক অর্ডার, শালীনতা, নৈতিকতার খণ্ডন করতে পারে বা প্রকাশনা যা আইন লঙ্ঘন করাকে প্ররোচিত করতে পারে তাকে নিষিদ্ধ করা হবে। এটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা দিয়েছিল প্রেসকে সতর্ক করা, তাদের কাছ থেকে সিকিউরিটি ডিপোজিট দাবী করা অথবা তাদের সিকিউরিটি ডিপোজিট বাজেয়াপ্ত করা সুরক্ষা জালিয়াতি ঘোষণা করা এবং যেই মুদ্রণকার বা প্রকাশকেরা আপত্তিজনক বিষয়গুলি ছাপছেন তাদের কাছ থেকে আরো সিকিউরিটি ডিপোজিট আদায় করা। এটি কেন্দ্রীয় সরকার বা সক্ষম কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা দিয়েছিলো মুদ্রণ বন্ধ বা বাজেয়াপ্ত করার যদি তারা প্রয়োজনীয় ডিপোজিট না দিতে পারে, আপত্তিজনক লেখালেখিকে বাজেয়াপ্ত করা এবং যারা নিয়ম লঙ্ঘন করবেন তাদের উপর জরিমানা লাগু কর ওহাব তাদেরকে জেলে পাঠানো। শুল্কভবনের অফিসারদের আপত্তিজনক উপকরণ বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল এবং রাজ্য পুলিশ আধিকারিকদের অননুমোদিত সংবাদপত্র এবং নিউজ-শিট বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। মহানগরের ম্যাজিস্ট্রেটদের, প্রধান বিচারপতি ম্যাজিস্ট্রেটদের এবং প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটদের মুদ্রণ প্রেসগুলির ভিতরে ঢুকে সেইটা বাজেয়াপ্ত করার পরোয়ানা জারি করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

কমপক্ষে তিন রকমের কার্যপদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল খবরের কাগজগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য: (১) সরকারী বিজ্ঞাপনের বন্টন ; (২) সংবাদ সংস্থাগুলির একত্রীকরণ এবং (৩) সংবাদপত্র প্রকাশকদের, সাংবাদিকদের এবং স্বতন্ত্র শেয়ারহোল্ডারদের উপর ভয়-উদ্দীপনার কৌশল ব্যবহার। দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ও দি স্টেটসম্যান এর মতো কাগজগুলি, যারা সরকারি সেন্সরশিপ এর বিরোধিতা করেছিল, তাদের কাছ থেকে সরকারি বিজ্ঞাপন ছিনিয়ে নেওয়া হয়। আবার

চারটি ভারতীয় নিউস এজেন্সিদেরকে একত্রিত করে দেওয়া হয় যাতে এক জায়গা থেকে সমস্ত খবরকে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ভয়-উদ্দীপনার কৌশল ব্যবহারে কাশক, সম্পাদক, সংবাদদাতা ও শেয়ারহোল্ডারদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভয় দেখানো হয়েছিল যেমন মিথ্যে ভাবে করের বকেয়া দেখানো, নিউজপ্রিন্ট কোটা কমিয়ে দেওয়া, প্রকাশকদের ও তাদের পরিবারদের কারাবাসে পাঠিয়ে দেওয়া, তাদের ছাপাখানা বন্ধ করে দেওয়া প্রভৃতি কার্যক্রম সরকার করেছিল।

যখন জনতা পার্টির সরকার ভারতের রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আসলো এবং মোরারজি দেশাই প্রধানমন্ত্রী পদের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তখন তিনি তিনটি স্বতন্ত্র পদক্ষেপের দিকে মানুষের দৃষ্টিপাত করেছিলেন যাতে ভারতীয় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করা যায়। এগুলি ছিল: (১) অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা চলাকালীন সময়ে গণমাধ্যমের অপব্যবহার অধ্যয়ন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা (২) অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং দূরদর্শন (টেলিভিশন) স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার বিষয়টা দেখার জন্য একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা এবং (৩) একটি কমিটি স্থাপন করা যা সেই সময় বিদ্যমান থাকা সংবাদ সংস্থা (সমাচার) এর পুনর্গঠনের সম্ভাব্যতা অধ্যয়ন করবে।

১.৪.৫ উপসংহার

ভারতবর্ষে প্রতিদিন ১১০ মিলিয়ন কপির ও বেশি সংবাদপত্র বিক্রি হয় যেই কারণে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সংবাদপত্রের বাজার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সমীর জৈন বি সি সি এল এর কর্মকর্তা হওয়ার পর সাধারণ বিপণন নীতি এবং ভাল ব্যবসায়িক বোধ ব্যবহার করে তার লস এ পরিচালিত প্রকাশনা সংস্থাকে প্রফিট এর মুখ দেখিয়েছিলেন। মার্কেট উদারীকরনের পরবর্তী সময় সংবাদমাধ্যমের কাছে অনেক সুযোগ উন্মুক্ত হয়ে যায়। ১৯৯২ সালে, উভয় নিউজপ্রিন্ট এবং মুদ্রণ যন্ত্রপাতিকে ওপেন জেনারেল লাইসেন্সের আওতায় রাখা হয় যার ফলে তার আমদানি সহজ হয়ে যায়। ১৯৯০ এর দশকে, বিভিন্ন সংস্থা ইচ্ছা প্রকাশ করে ভারতে বিদেশী মুদ্রণ সংস্থাদের নিয়ে আসার এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়ার কিন্তু সরকার সেই ইচ্ছে পূরণ হতে দেয়নি। অবশেষে, ২০০২ সালের জুনে মন্ত্রিসভা একটি প্রস্তাব পাস করে যার ফলে প্রিন্টে ২৬ শতাংশ এফ ডি আই (ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট) এর অনুমতি দেওয়া হয়। এটি ২০০৫ এ সংশোধন করা হয়েছিল অনুমতি দেওয়ার জন্য এফ আই আই (ফরেন ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টমেন্ট) এবং আরও সংশোধন ২০০৬ সালের মার্চ মাসে করা হয়েছিল। এখনকার মিডিয়া সংস্থাগুলির কাজ বিষয়বস্তু তৈরি করা; বাকি ব্যাপারটা প্যাকেজিং এবং বিপণন এর মাধ্যমে হয়। বিষয়বস্তু ভাল হলে, ব্যবসা সাধারণত ভাল চলে। ভারতে আঞ্চলিক ভাষার সংবাদপত্রগুলি মানুষজনদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। হিন্দি, বাংলা, মালায়ালাম এবং অন্যান্য ভাষার সংবাদপত্রগুলির বিকাশ অব্যাহত রয়েছে এবং সংবাদপত্রগুলো একেঅপরের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করছে যাতে ভারতের বিভিন্ন স্তরের শহরগুলিতে তারা জায়গা করে নিতে পারে। আঞ্চলিক ভাষার সংবাদপত্রের বৃদ্ধি প্রমাণ করেছে মানুষজনদের আঞ্চলিক ভাষার সংবাদপত্রের চাহিদা। আজকের অনেক শীর্ষস্থানীয় প্রকাশনাগুলির মধ্যে অনেকগুলিই স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গিয়ে আমাদের কাছে এখনো রয়েছে। অন্যান্য খবরের কাগজের মধ্যে, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় থেকে আমাদেরকে খবর সরবরাহ করে চলেছে, সেই কাগজগুলি হলো, টাইমস অফ ইন্ডিয়া (টি ও আই), মুম্বাই সমাচার, মলয়ালা মনোরমা, আনন্দবাজার পত্রিকা (এ বি পি) এবং দ্য হিন্দু।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গঠনে সংবাদমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। রাজা রামমোহন রায় থেকে কেশব চন্দ্র সেন, গোখলে, তিলক, ফিরোজশাহ মেহতা, সুভাষ চন্দ্র বসু, সি আর দাস, দাদাভাই নওরোজি, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সি ওয়াই চিন্তামণি, মতি লাল নেহরু, মদন মোহন মালাভিয়া, এম.কে. গান্ধী এবং জওহরলাল নেহেরুর মতো নেতারা সংবাদমাধ্যমকে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন এবং জাতীয়তাবাদী জনমত সংহত করা এবং জাগ্রত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তারা সরকারের নীতিগুলির সমালোচনা করেছিল এবং জনসাধারণকে রাজনৈতিক সমস্যাগুলি প্রেসের মাধ্যমে বোঝানোর জন্য শিক্ষিত করল। তারা তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং সংগ্রামের পদ্ধতি জনগণদের জানিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করলো। এই জন্য সেই সময়ে দৈনিক এবং সাময়িকী উভয় ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গেল। জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রেসের অবদান মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

নতুন শতাব্দীর আগমনে সংবাদপত্রের সংখ্যা আরো বেড়েছিল বিশেষত ভার্নাকুলার প্রেস যা জাতীয় চেতনা জাগানোর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলো সর্বদা সরকারী ব্যবস্থা এবং নীতি সমর্থন করে চলেছিল যার ফলে ভারতীয় এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সংবাদমাধ্যমের মধ্যে পার্থক্য আরো বেশি জোরদার রূপ নিলো। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পক্ষে কথা বলছিলো আবার অন্যদিকে আংলো ইন্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলো সরকারের পক্ষে কথা বলা চালু রেখেছিলো। সরকারও সেই জন্য অ্যাংলো-ইন্ডিয়ার কাগজপত্রের পক্ষে ছিল এবং ভারতীয় সংবাদপত্রের বিরোধিতা করেছিল।

১.৪.৬ সারাংশ

গত দুই শতাব্দীর সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ইতিহাস থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে ১৭৮০ সাল থেকে আজ অব্দি ভারত সরকার সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় হ্রাস আন্তে অনেকরকমের পদক্ষেপ নিয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতার আগে অনেক গভর্নর জেনারেল এবং ভাইসরয়রা প্রেসের স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করার জন্য অনেক রকমের আইন পাস করেছিলেন। স্বাধীনতার পরেও, প্রেস এর উপর কিছু বিধিনিষেধ অব্যাহত থাকে।

স্বাধীনতা আগে ও পরে, সর্বদাই ,সরকার ও প্রেসের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ও লড়াই আমরা দেখে আসছি। অনেক প্রতিকূলতা পেরিয়েও ভারতে প্রেসের সংখ্যার পাশাপাশি তার প্রভাব ও দিনে দিনে বেড়েছে। এর কারণ হিসেবে আমরা ধরে নিতে পারি যে প্রথম থেকেই প্রেস জনমত তৈরী করতে সক্ষম ছিল এবং ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোও প্রেসকে নিজের অধিকার ব্যবহার করার সুযোগ এনে দিয়েছে।

১.৪.৭ অনুশীলনী

১. গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকা থাকাকালীন কোন সংবাদপত্রের সাথে যুক্ত ছিলেন ?

২. কোন সালে ভারতে অব্যন্তরীন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয় ?

৩. প্রেস কাউন্সিলের গঠন কোন সালে হয়েছিল ?

৪. যুগান্তর নামক সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা কে করেছিলেন ?

৫. অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টটি কোন ভাইসরয় পাস করেছিল ?

১.৪.৮ গ্রন্থপঞ্জি

- *দি প্রেস ইন ইন্ডিয়া: পার্সপেক্টিভ এন্ড রেলেভেন্স*, এস.কে.পাধ্যা, এন. আর. সাহু, কনিষ্ক পাবলিশার্স এন্ড ডিস্ট্রিবিউটর্স।
- *প্রেস এন্ড সোশ্যাল চেঞ্জ*, জি. পি. পাণ্ডে। মানাক পাবলিকেশন লিমিটেড।
- *দি প্রেস ইন ইন্ডিয়া*, এম. চালাপাতি রাও। এলিয়েড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
- *জার্নালিজম ইন ইন্ডিয়া :ফ্রম টি অর্লিয়েস্ট টাইম টু দি প্রেসেন্ট ডে*, রঙ্গস্বামী পার্থসারথি। স্টার্লিং পাবলিশার্স।
- *মাস মিডিয়া টুডে*, সুবীর ঘোষ। প্রোফাইল পাবলিশার।
- *সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত :* ড: নন্দলাল ভট্টাচার্য। (লিপিকা)

মডিউল - ২ ◻ সংবাদ সংস্থা

একক : ১ ◻ সংবাদ সংস্থার বিকাশ (Development of News Agency)

২.১.০ গঠন

২.১.১ উদ্দেশ্য

২.১.২ প্রস্তাবনা

২.১.৩ সংবাদসংস্থা এবং সাংবাদিকতা

২.১.৪ সংবাদ সংস্থার ইতিহাস

২.১.৫ পৃথিবীর বিখ্যাত কয়েকটি সংবাদ সংস্থা

২.১.৬ এজেন্সি ফ্রান্স প্রেসে (AFP)

২.১.৭ রয়টার্স (Reuters)

২.১.৮ অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (AP)

২.১.৯ সারাংশ

২.১.১০ অনুশীলনী

২.১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

২.১.১ উদ্দেশ্য

এই এককে গণমাধ্যমের একটি বিশেষ দিক, সংবাদ সংস্থা এবং তার কর্মপরিধি বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এর ফলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম বিশেষ করে প্রতিটি সংবাদপত্র, রেডিও এবং টেলিভিশন কীভাবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে বিস্তারিত পেয়ে যায়, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। কোনও সংবাদ মাধ্যমের পক্ষেই পৃথিবীর প্রতিটি দেশের প্রতিটি শহরে নিজস্ব প্রতিনিধি রাখা সম্ভব নয়। এই কাজটি করে নির্দিষ্ট কিছু সংবাদসংস্থা। বার্ষিক কিছু অর্থের বিনিময়ে সংবাদমাধ্যমগুলি সেই সংবাদসংস্থার গ্রাহক হয় এবং ফলে সংবাদ সংগ্রহে সুবিধা হয়। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার পাঠ নিতে গেলে অবশ্যই সংবাদসংস্থায় কাজ শিখতে হবে। এই এককের মূল আলোচ্য বিষয় হল—

- সংবাদসংস্থা ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা
- বিশ্বের সংবাদ সংস্থার ইতিহাস
- পৃথিবীর বিখ্যাত কয়েকটি সংবাদ সংস্থা
- এজেন্সি ফ্রান্স প্রেসে

- রয়টার্স
- অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস

২.১.২ প্রস্তাবনা

সংবাদমাধ্যমের ক্ষেত্রে সংবাদ সংস্থার বিপুল প্রভাব। একমাত্র নামকরা সংবাদ সংস্থার বিপুল প্রতিনিধিরাই পৃথিবীর পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি প্রান্তিক এলাকায় সংবাদ, নিজস্ব নেটওয়ার্ক এবং নিজস্ব প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরাসরি সংগ্রহ করে আনেন এবং সেটি পরদিন সংবাদপত্রে ছাপা হয়। এই এককে তাই সংবাদসংস্থার ইতিহাস, পৃথিবীর কয়েকটি নামকরা সংবাদসংস্থার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। জানা যাবে, পৃথিবীর কোন দেশে কোন সংবাদসংস্থা কাজ করছে।

২.১.৩ সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকতা

বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা এবং সংবাদ সংস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। কারণ প্রতিটি সংবাদপত্রের নির্দিষ্ট কিছু বাধ্যবাধকতা থাকে। কিন্তু সংবাদ সংস্থা হল এমন একটি সংস্থা, যাকে প্রতিটি সংবাদ অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে প্রকাশ করতে হয়। যে যে সংবাদমাধ্যম তার কাছ থেকে সংবাদ কিনছে, প্রত্যেকে একই সংবাদ পায়। পরবর্তীকালে প্রতিটি সংবাদ মাধ্যম নিজের মত করে সেই সংবাদ পরিবেশন করে। এক কথায় সংবাদ সংস্থা হল সেই ধরণের সংবাদ বিক্রির এজেন্সি, যারা নিজের সাংবাদিকদের মাধ্যমে বা চুক্তিভিত্তিক অন্য সংবাদসংস্থা থেকে খবর সংগ্রহ করে এবং বার্ষিক গ্রাহক মূল্যের বিনিময়ে প্রতিটি সংবাদ মাধ্যমে সেই খবর প্রেরণ করে। প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে এখন প্রায় প্রতিটি সংবাদসংস্থা খবরের সঙ্গে ছবিও বিক্রি করে থাকে। পৃথিবীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংবাদসংস্থা হল—রয়টার্স, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি), এজেন্সে-ফ্রান্স-প্রেসে (এ এফপি) ইত্যাদি। প্রতিযোগিতার বাজারে একটি সংবাদসংস্থায় টিকে থাকার মূল মন্ত্র হল—বস্তুনিষ্ঠ নিরপেক্ষ সত্য তথ্য পরিবেশন। ভারতের ২টি উল্লেখযোগ্য সংবাদসংস্থা হল পিটিআই (PTI) এবার ইউ এন আই (UNI)।

২.১.৪ সংবাদ সংস্থার ইতিহাস

সংবাদসংস্থার ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, ফ্রান্সে উনবিংশ শতকের শুরুতেই বেশ কিছু ছোট ছোট সংবাদসংস্থা ছিল। ১৮৩০ সালে ফ্রান্সে বেশ কয়েকটি সংবাদসংস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৩৫ সালে ফ্রান্সে তৈরি হয় হাভাস এবং আমেরিকায় ১৮৪৬ সালে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস তার যাত্রা শুরু করে। এরপর হাভাসের প্রাক্তন বেশকিছু কর্মী ব্রিটেনে ১৮৫১ সালে তৈরি করে আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংবাদসংস্থা রয়টার্স। জার্মানিতে ১৯৪৯ সালে তৈরি হয় ডি পি এ সংবাদসংস্থা। এই ৪টি সংবাদসংস্থাই পৃথিবীর ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য, যাদের সম্পর্কে আমরা পরে জানব।

১৮৩৭ সালে টেলিগ্রাফ আবিষ্কার হওয়ার পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংবাদসংস্থার ভূমিকা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৮৬৯ সালের ব্রিটিশ টেলিগ্রাফ আইন এবং ১৮৭৮ সালের ফ্রান্সের টেলিগ্রাফ আইন সংবাদসংস্থার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ব্রিটিশ ভারতে বিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই শুরু হয় অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া (১৯০৫)-র যাত্রা—যা পরে স্বাধীন ভারতে প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া (পিটিআই) কর্তৃক অধিগৃহীত হয়। অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয় হল—ভারতের বর্তমানে দুটি নামকরা নিউজ এজেন্সি পিটিআই এবং ইউ এন আই-এর যাত্রা শুরু হয়েছিল দুই বাঙালির হাত ধরে। এদের সম্পর্কেও বারে বিস্তারিত জানতে পারব।

২.১.৫ পৃথিবীর বিখ্যাত কয়েকটি সংবাদসংস্থা

পুরো নাম	সংক্ষিপ্ত নাম	দেশ
● এজেন্সি ফ্রান্স প্রেসে	AFP	ফ্রান্স
● অ্যাগেনপার্লে	—	ইতালি
● আলক্যিরিয়া প্রেস সার্ভিস	APS	আলজিরিয়া
● অল হেড লাইনস নিউজ	AHN	আমেরিকা
● এশিয়ান নিউজ ইন্টারন্যাশনাল	ANI	ভারত
● অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস	AP	আমেরিকা
● অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস সার্ভিস	APS	পাকিস্তান
● অস্ট্রেলিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস	AAP	অস্ট্রেলিয়া
● অস্ট্রিয়া প্রেসে অ্যাজেস্টুর	APA	অস্ট্রিয়া
● বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা	BSS	বাংলাদেশ
● বুলগেরিয়ান টেলিগ্রাম এজেন্সি	BTA	বুলগেরিয়া
● চায়না নিউজ সার্ভিস	CNS	চীন
● ডয়সে প্রেসে অ্যাজেন্টুর	DPA	জার্মানী
● ইউরোপিয়ান নিউজ এজেন্সি, বেলজিয়াম	ENAB	ইউরোপ
● ফার্স্ট নিউজ এজেন্সি	FNA	ইরান
● ইরানীয়ান স্টুডেন্টস নিউজ এজেন্সি	ISNA	ইরান
● কেনিয়া নিউজ এজেন্সি	KNA	কেনিয়া
● নিউজ এজেন্সি অব নাইজেরিয়া	NAN	নাইজেরিয়া
● পাকিস্তান প্রেস ইন্টারন্যাশনাল	PPI	পাকিস্তান
● প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া	PTI	ভারত
● রয়টার্স	GBR	ব্রিটেন
● রাশিয়ান নিউজ এজেন্সি	TASS	রাশিয়া
● সৌদি প্রেস এজেন্সি	SPA	সৌদি আরব
● ইউনাইটেড নিউজ অব ইণ্ডিয়া	UNI	ভারত

● জিনহুয়া নিউজ এজেন্সি	XINHUA	চীন
● ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশানাল	UPI	আমেরিকা
● ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ	UNB	বাংলাদেশ
● ভিয়েতনাম নিউজ এজেন্সি	TTXVN	ভিয়েতনাম
● সিরিয়ান আরব নিউজ এজেন্সি	SANA	সিরিয়া

২.১.৬ এজেন্সি ফ্রান্স প্রেসে (AFP)

এ এফ পি হল পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো সংবাদ সংস্থা। তৈরি হয়েছিল ফ্রান্সে। ১৮৩৫ সালে চার্লস লুই হাভাস যখন এটি প্রথম তৈরি করেন, তখন এর নাম ছিল হাভাস। পরবর্তীকালে এর নাম পরিবর্তিত হয় এবং এখান থেকেই দুজন সংবাদকর্মী, পল জুই রয়টার এবং বার্নার্ড উলফ, হাভাস থেকে বেরিয়ে এসে লণ্ডন এবং বার্লিনে দুটি পৃথক সংবাদ সংস্থা তৈরি করেন। বর্তমানে এফপি-র সদর অফিস ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত হলেও সাইপ্রাসের রাজধানী নিকোসিয়া, উরুগুয়ের রাজধানী মন্টেভিডিও, হবে কবে এবং ওয়াশিংটন ডিসি—এই ৪টি শহুরে আঞ্চলিক অফিস এবং ১৫১টি দেশের ২০০টি শহুরে নিউজ ব্যুরো রয়েছে। ইংরাজি, ফরাসী, আরবি, পর্তুগীজ, স্প্যানিস এবং জার্মানি—এই ৬টি ভাষায় এএফপি-র সমস্ত ধরনের সংবাদ প্রেরণের পরিষেবা চালু রয়েছে।

১৯৪০ সালে জাতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান সেনা ফ্রান্স দখল করে নিলে এই সংবাদ সংস্থার নাম পরিবর্তিত হয়ে রাখা হয় 'ফ্রেঞ্চ ইনফর্মেশন অফিস'। পরবর্তীকালে ১৯৪৪ সালের ২০ আগস্ট সংযুক্ত বাহিনী প্যারিস পৌঁছলে, একদল সাংবাদিক প্রেস ইনফরমেশন অফিস দখল করে নেয় এবং সর্বপ্রথম এজেন্সি ফ্রান্স-প্রেসের সংবাদ সংস্থার নামে, এখান থেকে সংবাদ পরিবেশন শুরু হয়। ১৯৫৭ সালের ১০ জানুয়ারি ফ্রান্সের সংসদ এই সংবাদসংস্থাকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করে। বলা যায়, সেই থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বহু বিখ্যাত সংবাদের উৎস এই সংবাদসংস্থা।

১৯৮২ সালে এই সংবাদসংস্থা সিদ্ধান্ত নেয়, সম্পাদকীয় ক্ষেত্রে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে এবং সেই ভাবনা থেকে ৫টি শহুরে আলাদা সংবাদের অফিস তৈরি হয়। প্রতিটি অফিসের নিজস্ব সম্পাদকীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। সারা পৃথিবীতে উচ্চমানের সংবাদ পরিবেশনের জন্য ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বরে এএফপি ফাউন্ডেশন তৈরি হয়।

২.১.৭ রয়টার্স (Reuters)

পৃথিবীর অন্যতম নাম করা সংবাদ সংস্থা হল ব্রিটেনের রয়টার্স। ২০০৮ সাল পর্যন্ত এই সংবাদসংস্থা, রয়টার্স গ্রুপের অন্যতম একটি কোম্পানি হিসেবে যুক্ত থাকলেও সেই বছর থমসন রয়টার, এই সংবাদসংস্থাকে কিনে নেয়। সেই থেকে এখনও পর্যন্ত থমসন রয়টার্স সংস্থায় অধীন সংবাদসংস্থা হিসেবে রয়টার্স কাজ করছে।

১৮৫১ সালে তৈরি হয় রয়টার্স সংবাদ সংস্থা। উদ্যোগী ছিলেন পল রয়টার। তিনি বার্লিনে একটি প্রকাশনা সংস্থায় কাজ করতেন এবং পরবর্তীকালে এ এফ পি-তে যোগ দেন। সেখান থেকে বেরিয়ে এসেই তৈরি হয় রয়টার্স। প্রথম থেকেই সুনামের সঙ্গে কাজ করতে থাকে এই সংবাদ সংস্থা। লন্ডনের তৎকালীন প্রায় প্রতিটি বড় সংবাদপত্র সে সময় রয়টার্সের সংবাদ গ্রাহক হয়ে ওঠে। রয়টার্সের প্রথম গ্রাফে ১৮৫৮ সালে, লন্ডন মর্নিং অ্যাডভার্টাইজার সংবাদপত্র। ১৮৭২ সালে রয়টার্স প্রথম দেশের বাইরে, একেবারে পূর্বদিকে এবং দক্ষিণ আমেরিকায় তাদের সংবাদসংস্থার অফিস খোলে। এই দুই

বিস্তার সম্ভব হয়, কারণ মাটির ওপর দিয়ে ও সমুদ্রের নীচ দিয়ে টেলিগ্রাফ তার নিয়ে যাওয়ার প্রযুক্তি আবিষ্কার হয়ে গেছে।

১৯১৬ সালে রয়টার্স সংবাদ সংস্থায় সম্পূর্ণ বেসরকারিকরণ ঘটে এবং রডরিক জোনস ও মার্ফ নেপিয়ের যৌথভাবে এই সংবাদসংস্থা কিনে নেন। নাম পাল্টে হয় রয়টার্স লিমিটেড। ১৯২৩ সালে রয়টার্স প্রথম রেডিও-র মাধ্যমেও আন্তর্জাতিক খবর পরিবেশনের পৃথিবীতে পা রাখে।

ভেতরের সুপ্ত-গুপ্ত সংবাদ পেয়ে বা সংবাদের সূত্র পেয়ে সেটিকে সকলের আগে প্রকাশ করাকে বলে 'স্কুপ নিউজ'। রয়টার্স তার দীর্ঘদিনের সংবাদসংস্থায় ইতিহাসে বহু স্কুপ খবর প্রকাশ করেছে, সবার আগে। এর মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য হল, আমেরিকার ১৬তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের, হত্যাকাণ্ডের খবর। আরও একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ হল, ১৯৬১ সালে রয়টার্স প্রথম বার্লিন প্রাচীর তৈরির সংবাদ প্রকাশ করে। ১৯৮৯ সালে আবার রয়টার্সই প্রথম বার্লিন প্রাচীর ভেঙে ফেলার সংবাদ প্রকাশ করেছিল।

ইরাক থেকে তুরস্ক কিংবা সিরিয়া কিংবা চীন থেকে মায়ানমার—পৃথিবীর বহু প্রান্তে রয়টার্স সংবাদসংস্থায় সাংবাদিকরা কখনও বন্দি থেকেছেন। কখনও আটকে রেখেও ছাড়া হয়নি। কখনও হত্যা করা হয়েছে বলেও সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে প্রায় ৬০০টি জায়গায় রয়টার্সের প্রায় ৬০০ জন চিত্র সাংবাদিক এবং ২৫০০ জনের বেশি সাংবাদিক নিরন্তর সংবাদ সংগ্রহ করে চলেছেন।

২.১.৮ অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (AP)

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস বা এপি-র মূল সদর শহর হল আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে। ১৮৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এই সংবাদ সংস্থা বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম নামকরা সংস্থা। ১৯১৭ সালে পুলিৎজার পুরস্কার চালু হওয়ায় পর অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ৫৬টি পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছে। এর মধ্যে ৩১টিই চিত্র সংবাদিকতায়। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস প্রথম ১৮৪৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের সমস্ত খবর পরিবেশন করে। বর্তমানে পৃথিবীর ১০৬টি দেশে ২৬৩টি নিউজ ব্যুরো অফিস রয়েছে, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এর। এপি.র রেডিও নেটওয়ার্কও রয়েছে। ইংরেজি, স্প্যানিশ এবং আরবী—৩টি ভাষায় বর্তমানে এই সংবাদসংস্থা সংবাদ সরবরাহ করে। ছবিও পরিবেশন করে।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস যখন তৈরি হচ্ছে, তখন মেক্সিকো—আমেরিকার যুদ্ধ চলছে। মূল উদ্দেশ্য ছিল, যুদ্ধের সংবাদ পরিবেশন। ফলে সেই সময়ের ৪টি নামকরা সংবাদপত্র—নিউইয়র্ক ক্যুরিয়ায় অ্যান্ড এনকোয়ারার, জার্নাল অব কমার্স, নিউইয়র্ক ইভনিং প্রেস, দ্য নিউইয়র্ক হেরাল্ড এবং দ্য সান একত্রিত হয়ে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস সংবাদসংস্থাটি তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। পরবর্তীকালে কেন্ট কুপার (১৯২৫-৫৮) যখন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস-এর দায়িত্বে ছিলেন, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, সেই সময় দক্ষিণ আমেরিকা—ইউরোপ—মধ্যপ্রাচ্যে এই সংবাদসংস্থার শাখা বিস্তৃত হয়। একই সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নানা শহর, যেমন শিকাগো ও সান ফ্রান্সিসকোতে, এই সংবাদসংস্থা তার ব্যুরো অফিস খোলে। একবিংশ শতকের প্রথম দিকে সিদ্ধান্ত হয়—ইয়াহু, এম এস এন, গুগল নিউজ-এও এপি-র সমস্ত সংবাদ পাওয়া যাবে এবং এই ব্যাপারে ওই সংস্থাগুলির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে ইউটিউবের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এর বাণিজ্যিক চুক্তি রয়েছে।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস-এর আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর কাছ থেকে ১৯৪১ সালে ওয়াইড ওয়ার্ল্ড নিউজ ফটো সার্ভিস সংস্থাটি কিনে নেওয়া।

২.১.৯ সারাংশ

সংবাদসংস্থার একজন সাংবাদিকের কাছে একটি মিনিটের অর্থ হল 'ডেডলাইন'। সংবাদসংস্থার একজন সাংবাদিক যেন সবসময় পায়ের আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন। নিকটতম টেলিফোন বুথ বা নিজের কমপিউটার-ল্যাপটপ থেকে দ্রুততম পদ্ধতিতে, সমস্ত বাধা অতিক্রম করে অফিসে সংবাদ পাঠানোটাই তাঁর একমাত্র কাজ। সবসময় তাঁদের মাথায় রাখতে হয়, কোনও একটি সংবাদমাধ্যম কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় নিজস্ব প্রতিনিধি পাঠাতে পারছে না বলেই সংবাদসংস্থায় খবর কিনে, পরদিন প্রকাশ করে, পাঠক শ্রোতার মনের খিদে মেটাচ্ছে। সেইজন্য গোটা দেশের সংবাদ মাধ্যম যখন যে সংবাদ চেয়েছে, সংবাদসংস্থা সেই চাহিদা পূরণ করেছে। এককথায় বলা যায়, পাইকারি দরে বিশ্ববাজারে নিরপেক্ষ সংবাদ বিক্রি করে সংবাদ সংস্থা। ফলে সংবাদ সংস্থাগুলির ভূমিকাও বাড়ছে। পরবর্তীকালে ইন্টারনেট পরিষেবা অনেকটা স্বাভাবিক হওয়ায় সংবাদ সংস্থার ওপর নির্ভরশীলতা বেড়েছে। এ এফ পি, এপি, রয়টার্স-এর মতো বিশ্বখ্যাত সংবাদসংস্থা সেই উদ্দেশ্য নিয়েই শুরু করেছে পথ চলা।

২.১.১০ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন :

সংক্ষিপ্ত নোট :

রয়টার্স, এ এফ পি, এপি, হাভাস।

বড় প্রশ্ন :

১) সংবাদসংস্থা কাকে বলে?

২) পৃথিবীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংবাদসংস্থার নাম ও দেশ বলুন :

৩) পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো সংবাদসংস্থা কী এবং সেটি থেকে পরবর্তীকালে কোন কোন সংবাদসংস্থা তৈরি হয়?

৪) রয়টার্সের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ পরিবেশনের কথা উল্লেখ করুন।

৫) অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস—সংবাদসংস্থা তৈরির নেপথ্যে কোন্ কোন্ সংবাদপত্রের বিশেষ ভূমিকা ছিল?

৬) পৃথিবীর কটি দেশে এবং কটি শহরে রয়টার্স এবং এ এফ পি-র অফিস রয়েছে?

৭) সংবাদসংস্থা তৈরির ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে লিখুন।

২.১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১। News Agencies from Pigeon to Internet — KM Srivastava.

২। The Power of New — Donald Read.

৩। International News Agencies — Oliver Boyel–Barrett.

৪। News Agency Journalism — Dr. Madhuri Madhok

৫। সংবাদ প্রতিবেদন—ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

৬। New Agency Manual — IIMC, New Delhi

একক : ২ ◻ ভারতে সংবাদসংস্থার বিকাশ (Development of News Agencies in India)

২.২.০ গঠন

২.২.১ উদ্দেশ্য

২.২.২ প্রস্তাবনা

২.২.৩ পিটিআই (P.T.I) :

২.২.৪ ইউএনআই (UNI)

২.২.৫ হিন্দুস্থান সমাচার

২.২.৬ আই এ এন এস (IANS — ইন্দো এশিয়ান নিউজ সার্ভিস)

২.২.৭ সমাচার ভারতী (SB)

২.২.৮ সারাংশ

২.২.৯ অনুশীলনী

২.২.১০ গ্রন্থপঞ্জি

২.২.১ উদ্দেশ্য

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি এ এফ পি-র মত নামকরা সংবাদ সংস্থার জন্ম হলেও ভারতের সংবাদমাধ্যমে কিন্তু তার ঢেউ এসে লেগেছিল অনেক পরে। বলা চলে, টেলিগ্রাফ আবিষ্কার এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্সে টেলিগ্রাফ আইনের ব্যবহার করে নতুন সংবাদসংস্থায় জন্ম তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতকে নিজস্ব সংবাদসংস্থা তৈরির কথা ভাবতে বাধ্য করেছিল। এর ফল হল, ১৯০৫ সালে তৈরি হয় অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া (API)। উদ্যোগী পুরুষ, সে সময়ের বিশিষ্ট সাংবাদিক কে সি রায়। তিনি কাজ করতেন ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ-এ এবং টেলিগ্রাম মারসৎ অফিসে সংবাদ পাঠাতেন। উষা নাথ, কলকাতায় সেই সংবাদ সংগ্রহ করতেন এবং এপিআই নিউজ এজেন্সির নামে বিভিন্ন সংবাদপত্রে পাঠিয়ে দিতেন। 'দ্য হিন্দু' এবং 'স্বদেশ মিত্র' এই দুই সংবাদপত্রের সহযোগিতায় মাদ্রাজে একটি অফিসও খুলেছিলেন উষা নাথ। স্বাধীনতা লাভের পর এই সংস্থাই প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া নামে পরিচিত হয় এবং কয়েক বছর পর রয়টার্স থেকে এপিআই-কে কিনেও নেয় পিটিআই। সুতরাং ভারতের সাংবাদিকতা সম্পর্কে জানতে হলে ভারতীয় সংবাদসংস্থাগুলি সম্পর্কে জানতে হবে।

এই এককের মূল আলোচ্য বিষয় হল—

* প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া

* ইউনাইটেড নিউজ অব ইণ্ডিয়া

* হিন্দুস্থান সমাচার

* আই এ এন এস

* সমাচার ভারতী

২.২.২ প্রস্তাবনা

স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে পুরনো সংবাদসংস্থা পিটিআই এবং বহু ভাষায় সংবাদ প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রথম সংবাদসংস্থা ইউ এন আই। এছাড়াও রয়েছে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। কীভাবে প্রতিটি সংবাদসংস্থা বেড়ে উঠল, সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এই এককে।

২.২.৩ পিটিআই (P.T.I) :

১৯৪৭ সালের ২৭ আগস্ট পথ চলতে শুরু করা প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া আজ ভারতের সবচেয়ে বড় নিউজ এজেন্সি। বর্তমানে এদের মূল কার্যালয়টি রয়েছে নয়াদিল্লিতে এবং এটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি অলাভজনক সংস্থা হিসেবে নথিভুক্ত। বর্তমানে ভারতের প্রায় ৫০০-র বেশি সংবাদপত্র পিটিআই থেকে সরাসরি সংবাদ সংগ্রহ করে এবং প্রকাশিত হয়। বলা যায়, ভারতের সংবাদমাধ্যমের প্রায় ৯০ শতাংশ বাজার দখল করে রয়েছে পিটিআই। ভারতের মূল প্রধান রাজধানী শহরগুলিতে প্রায় সব জায়গাতেই এদের অফিস রয়েছে এবং প্রতিটি অফিস থেকেই প্রয়োজনে পৃথিবীর প্রতি প্রান্তে যোগাযোগ করা সম্ভব। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর, পিটিআই, রয়টার্স থেকে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়া-কে কার্যও কিনে নেয় এবং পিটি আই-এর সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়া মিশে যায়। ইংরেজি এবং হিন্দি দুটি ভাষাতেই বর্তমানে সংবাদ সরবরাহের ব্যবস্থা বর্তমানে রয়েছে। ১৯৯৯ সালে পিটিআই-এর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে লোগো-সহ ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছে।

ভারতের প্রথম নিউজ এজেন্সি হল অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়া (API)। তৈরি করেছিলেন প্রথম এক বাঙালি, কে সি রায়। সেটা ১৯০৫ সাল। সেই সময় কিছু সমস্যা তৈরি হলেও ১৯১৯ সালে রয়টার্স, এপিআই-এর দায়িত্ব নেয়। কিন্তু ক্রেডিট লাইন হিসেবে এপিআই-এর নামই নানা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৭ এর ২৭ অগাস্ট, মাদ্রাজ শহরে পিটিআই আত্মপ্রকাশ করে এবং নতুন করে পথ চলা শুরু করে। ১৯৫৩ সাল থেকে রয়টার্সের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে পিটিআই একক ভাবে কাজ করতে থাকে। ১৯৭৬ সালে এই নিউজ এজেন্সির ইকোনমিক সার্ভিস অর্থাৎ অর্থনীতি-বাজার সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশনের কাজ শুরু হয়। ১৯৮০ সালের জুলাই মাসে পিটিআই ফিচার সার্ভিস, ১৯৮১ এর অক্টোবরে পিটিআই সায়েন্স সার্ভিস, ১৯৮৬ এর ফেব্রুয়ারিতে পিটিআই টিভি, ১৯০৭-র অক্টোবরে পিটিআই ফটোগ্রাফি, ১৯৯২ এর আগস্টে পিটিআই গ্রাফিক্স সার্ভিস-এর শাখাগুলি একের পর এক চালু হতে থাকে।

বর্তমানে ভারতের প্রায় প্রতিটি সংবাদ মাধ্যম অর্থের বিনিময়ে পিটিআই থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে থাকে। পিটিআই-এর ছবিও বহু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—দ্য হিন্দু, টাইমস অব ইন্ডিয়া, দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, দ্য হিন্দুস্থান টাইমস, দ্য স্টেটস্‌ম্যান, দ্য ট্রিবিউন, দ্য অল ইন্ডিয়া রেডিও, দূরদর্শন প্রভৃতি। ভারতের নানা প্রান্ত ছাড়াও বেজিং, ব্যাঙ্কক, কলম্বো, দুবাই, ইসলামাবাদ, কুয়ালালামপুর, মস্কো, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ডিসি ইত্যাদি আন্তর্জাতিক শহরেও পিটিআই এর কার্যালয় এবং সাংবাদিক রয়েছে।

২.২.৪ ইউএনআই (UNI)

ভারতবর্ষ এক বহু ভাষার দেশ। তাই প্রয়োজন বহু ভাষার নিউজ এজেন্সি। ভারতের সংবাদ মাধ্যমের ইতিহাসে বহু ভাষার নিউজ এজেন্সি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ইউনাইটেড নিউজ অব ইন্ডিয়া (ইউ.এন.আই)। সেটা ১৯৫৯-এর ডিসেম্বর। প্রথমে ইংরাজিতেই সংবাদ সরবরাহ শুরু হলেও পরবর্তীকালে হিন্দি এবং উর্দুতেও সংবাদ পাঠাতে শুরু করে ইউ.এন.আই ১৯৬১ এর ২১ মার্চ বাণিজ্যিকভাবে যাত্রা শুরু করে এই সংবাদ সংস্থা। সেইসঙ্গে এর হিন্দি ভাষার সংবাদ সংস্থা, ইউনি বার্তা (Univerta)-ও কাজ করতে শুরু করে। এর ৩০ বছর পর ১৯৯২ এর ৫ জুন, উর্দু ভাষায়, পৃথিবীতে প্রথম সংবাদ সংস্থা হিসেবে, ইউ.এন.আই-এর নতুন শাখা চালু হয়। এর ফলে এই সংস্থা পৃথিবীতে প্রথম উর্দু ভাষায় সংবাদ সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ভারতের বহু শহর এবং মূলত রাজধানী শহরগুলিতেই এর অফিস রয়েছে। বিশ্বের নানা প্রান্তের বেশ কিছু নাম করা সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (AP আমেরিকা), ডয়্যেসে-প্রেসে-অ্যাগেস্টুর (Dentsche-Press-Agentur — জার্মানি), অ্যাজেনজিয়া ন্যাজনেল স্ট্যাম্পা অ্যাসোসিয়াটা (Agenzia Nazionale stamp a Associata— ইতালি), অ্যাজের প্রেস (Ager Press রোমানিয়া)-র সঙ্গে ইউ.এন.আই-এর বাণিজ্যিক চুক্তি রয়েছে এবং সেভাবে পৃথিবীর সংবাদ পরিবেশন করে।

কিন্তু ইউ.এন.আই-এর মত দ্বিতীয় সংবাদ সংস্থা তৈরির প্রয়োজন কেন হল? প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া, ১৯৫২-৫৪ সালের মধ্যে প্রথম প্রেস কমিশন যে রিপোর্ট জমা দেয়, তাতেই পিটি আই-এর সমান্তরাল দ্বিতীয় সংবাদ সংস্থা তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। মূল উদ্দেশ্য, একটি সংবাদ সংস্থা কোনও কারণে ভুল সংবাদ পরিবেশন করলে অপর সংবাদ সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সংবাদ দেখে যেন সেটি সংশোধন করে নেওয়া সম্ভব হয়। উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে এগিয়ে আসেন পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. বিধানচন্দ্র রায়। সাংবাদিক বিধুভূষণ সেনগুপ্ত ছিলেন পরিচালক। সেই সময়ের ৭টি নামকরা সংবাদপত্র—দ্য হিন্দু, দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, দ্য স্টেটসম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান টাইমস, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, ডেকান হেরাল্ড।

বর্তমানে ইউ.এন.আই-এর অনেকগুলি শাখা রয়েছে, যেগুলির মাধ্যমে নানা ধরণের সংবাদ পরিবেশনের সুযোগ বেড়েছে। তৈরি হয়েছে ইউ এন আই ফটো সার্ভিস, ইউ এন আই গ্রাফিক্স, ইউ এন আই এনার্জি নিউজ সার্ভিস, ইউ এন আই ব্যাক গ্রাউন্ডার সার্ভিস, ইউ এন আই ফিনান্স সার্ভিস, ইউ এন আই এগ্রিকালচার সার্ভিস, এন আই স্ক্যান সার্ভিস ইত্যাদি।

২.২.৫ হিন্দুস্থান সমাচার

স্বাধীনতায় এক বছর পর ১৯৪৮ সালে একটি নিউজ এজেন্সি বা সংবাদ সংস্থা তৈরি হয় এবং বর্তমানে এর প্রধান কার্যালয় নয়ডা-তে। শিবরাম শঙ্কর আপতে ছিলেন এই সংবাদ সংস্থায় প্রতিষ্ঠাতা। যদিও বহু ভাষায় সংবাদ সংগ্রহ এবং প্রেরণের পরিকাঠামো রয়েছে, তবুও সংবাদ পত্রগুলি হিন্দি ভাষায় সংবাদ সংগ্রহের জন্য অনেকেই এই সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। বর্তমানে ১০টি ভাষায় এদের সংবাদ প্রেরণের কাজ চালু রয়েছে—বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, তেলেগু, মালয়লম, উর্দু, পাঞ্জাবি, গুজরাটি, হিন্দি এবং মারাঠী। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থায় প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল—পিটিআই, ইউ.এন.আই, সমাচার ভারতী এবং হিন্দুস্থান সমাচার—এই ৪টি সংবাদ সংস্থা জুড়ে যাবে এবং সমাচার

নামে নতুন একটিই সংবাদসংস্থা গোটা দেশে কাজ করবে। পরবর্তীকালে এই ৪টি সংবাদ সংস্থা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়।

২.২.৬ আই এ এন এস (IANS) — ইন্দো এশিয়ান নিউজ সার্ভিস

১৯৮৬ সালে তৈরি হওয়া এই সংবাদ সংস্থা মূলত ভারত এবং উত্তর আমেরিকায় মধ্যে সংযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে এটি স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি সংবাদ সংস্থা এবং ভারত সহ দক্ষিণ এশিয়ার সংবাদ সরবরাহের অন্যতম মাধ্যম। বর্তমানে এর ৬টি শাখায় রয়েছে—আই এ এন এস ইংরাজি, আই এ এন এস হিন্দি, আই এ এন এস পাবলিশিং, আই এ এন এস বিজনেস কনসালটেন্সি, আই এ এন এস সলিউশনস্ এবং আই এ এন এস মোবাইল।

২.২.৭ সমাচার ভারতী (SB)

ভারতের অন্যতম আর একটি সংবাদ সংস্থা হল সমাচার ভারতী। ১৯৬৭ সালে এটি পথ চলা শুরু করে এবং সেই সময় বেশ কয়েকটি রাজ্য সরকার বিশেষভাবে আর্থিক সাহায্য করেছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—বিহার, গুজরাট, রাজস্থান এবং কর্নাটক। এবং এদের ৫০ শতাংশ শেয়ারের দাবিদার এই ৪টি রাজ্য। জয় প্রকাশ নারায়ণ ছিলেন এর প্রথম চেয়ারম্যান। এই সংবাদ সংস্থার একটি হিন্দি শাখায়—'দেশ অউর দুনিয়া' এবং একটি ফিচার শাখা 'ভারতী' রয়েছে। ক্রীড়া সাংবাদিকতার ওপর এই সংবাদ সংস্থা একটু বেশি জোর দিয়ে সারা পৃথিবীর নানা ধরণের খোলার সংবাদ, সংবাদপত্রগুলিতে, টেলি প্রিন্টারের মাধ্যমে প্রেরণ করতে থাকে।

২.২.৮ সারাংশ

ভারতের সংবাদ মাধ্যমকে সরকার বা সরকারি বিজ্ঞাপনের ওপর যতটা নির্ভর করতে হয়, পৃথিবীর বহু দেশে তা হয় না। অন্যদিকে রয়েছে সংবাদ পরিবেশনের তাড়না। পিটি আই এবং ইউ এন আইনে তাই অনেকটাই সরকারি সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। দু'টি সংবাদসংস্থাই ভীষণভাবে চেষ্টা করছে, নিজেদের গ্রাহক ধরে রাখতে। কয়েক বছর ধরেই পিটি আই এবং ইউ এন আই, বিশ্বের নামকরা সংবাদসংস্থা রয়টার্স, এ.এফ.পি এবং এপি-র সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ, যাতে তাদের সমস্ত খবর আমাদের দেশের সংবাদ সংস্থা পেতে পারে। আর এটাও উল্লেখযোগ্য, দুটি সংবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠার নেপথ্যেই ছিলেন দুই বাঙালি। একজন বাঙালি সাংবাদিক কে সি রায়। অপরজন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়। পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি সংবাদ সংস্থায় জন্ম হয়েছে ভারতে। কিন্তু একাধিক সংবাদ সংস্থায় প্রয়োজন কেন, সেটাও বলা রয়েছে প্রথম প্রেম কমিশনের সুপারিশে। দেশে শুধুমাত্র একটিই সংবাদ সংস্থা থাকলে একছত্র আধিপত্য তৈরি হবে এবং ভুল সংবাদ প্রেরিত হলেও তা পরীক্ষার অবকাশ থাকবে না। সম্পূর্ণ এককটি তাই ভারতীয় সংবাদ সংস্থাগুলি নিয়েই আলোচনা হয়েছে।

২.২.৯ অনুশীলনী

ক) সংক্ষিপ্ত নোট

পিটিআই, ইউ এন আই, আই এ এন এস

খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক

১। ভারতের কয়েকটি সংবাদ সংস্থায় পূর্ণ নাম এবং সংক্ষিপ্ত নাম লিখুন।

২। ভারতের সবচেয়ে পুরনো সংবাদ সংস্থাটি কী?

৩। ভারতের বাইরে কোন কোন হরে পিটিআইএর ব্যুরো অফিস রয়েছে এবং পিটিআই-এর বর্তমানে সংবাদ পরিবেশন সংক্রান্ত কটি শাখা রয়েছে?

৪। হিন্দুস্থান সমাচার এবং সমাচার ভারতী সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

৫। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে বর্তমানে ২টি উল্লেখযোগ্য সংবাদ সংস্থার ভূমিকা বর্ণনা করুন।

২.২.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১। *Mass Communication in India,* Keval J Kumar.

২। *Profesional Journalism,* M V Kaunath.

৩। *News Agency Journalism,* R. Hakemulder Jau.

৪। *Understanding Journalism,* Lynethe Sheridan.

৫। *India Journalism in a New Era,* Oxford University Press.

৬। *আধুনিক গণমাধ্যম*, ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য।

৭। *সংবাদ বিদ্যা,* ড: পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

মডিউল - ৩ ◻ স্বাধীনতার পরে প্রধান প্রবণতা

একক : ১ ◻ স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে বেতার, টেলিভশন, স্যাটেলাইটে টিভি ও ইন্টারনেট-এর সম্প্রসারণ

৩.১.০ গঠন

৩.১.১ উদ্দেশ্য

৩.১.২ প্রস্তাবনা

৩.১.৩ স্বাধীনতার পরে বেতার সম্প্রচার

৩.১.৪ ভারতে টেলিভিশন সম্প্রচার

৩.১.৫ স্যাটেলাইট টেলিভিশন সম্প্রচার

৩.১.৬ ভারতে ইন্টারনেটের প্রসার

৩.১.৭ সারাংশ

৩.১.৮ অনুশীলনী

৩.১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৩.১.১ উদ্দেশ্য

এই এককে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমগুলি কিভাবে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল দিয়ে প্রভাবিত হয়েছে ও রূপান্তরিত হয়েছে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হবে। বেতার, টেলিভশন, কেবল টিভি ও ইন্টারনেট স্বাধীনতা পরবর্তী কালে বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান পরিকল্পনা, রূপায়ণ ও পরিবেশনের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কখনো সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কাজে, আবার কখনো বাজার কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের প্রবল দাবিতে গণমাধ্যমকে কাজে লাগানো হয়েছে, আর সেই মতো নীতি নির্ধারণও হয়েছে। এই এককে বাধীনতা পরবর্তী গণমাধ্যমের পরিবর্তন ও প্রবণতাকেই বিশ্লেষণ করা হবে।

৩.১.২ প্রস্তাবনা

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারতীয় গণমাধ্যম একাধিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে। ঠিক স্বাধীনতা পরবর্তী বছরগুলো দেশ গড়ার আদর্শে গণমাধ্যমকে কাজে লাগানোর উৎসাহ থাকলেও আস্তে আস্তে ভারতীয় গণমাধ্যম বাজারমুখী হয়েছে। প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনও গণমাধ্যমের দিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন এবং পরবর্তীকালে ইন্টারনেট যেমন জনমানসে প্রভাব ফেলেছে, ঠিক তেমনই এই গণমাধ্যমগুলিও

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সরকারি বিভিন্ন নীতির দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছে। গণমাধ্যম সম্পর্কে যথার্থ ধারণা গড়ে তোলার জন্য স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এই গণমাধ্যমগুলো নানান চড়াই উতরাই ধরে কিভাবে এগিয়ে চলেছিলো, সেই সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

৩.১.৩ স্বাধীনতার পরে বেতার সম্প্রচার

১৯৩০ এর দশকে ভারত ভূখণ্ডে সংবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে অল ইন্ডিয়া রেডিওপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই গণমাধ্যমটি সেই সময় প্রশাসন কর্তৃক কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল, কিন্তু তা সত্বেও তৎকালীন বহু ভারতীয় এবং বিপ্লবীদের কাছে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে রেডিও সচ্ছল পরিবারগুলিতে সংবাদ শোনার অভ্যাস তৈরী করে দিয়েছিলো এবং বিখ্যাত ভাষণ, নির্বাচনের ফলাফল, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ইত্যাদির মতো বহু ঐতিহাসিক ঘটনাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলো। সময়ের সাথে সাথে রেডিও মাধ্যমটিও ভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৩৮ সালে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে শর্ট-ওয়েভ সার্ভিস চালু হওয়ার প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রেডিওকে 'আকাশবাণী' নামকরণ করেন এবং ওই শিরোনামে একটি কবিতাও লেখেন। আকাশবাণী ছিল সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রধান এবং একমাত্র সংবাদ মাধ্যম। রেডিও স্বাধীনতার লাভের পরেই নতুন সরকার এবং তার জনগণের মধ্যে প্রথম সেতু হয়ে ওঠে যা বেশিরভাগ কর্মসূচি রেডিও নিউজ বুলেটিনগুলির মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলো। বেতারে প্রচারিত জওহরলাল নেহেরু এবং ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের বক্তৃতা সদ্য বিভক্ত ভারতে আশাবাদ বজায় রাখতে সহায়তা করেছিল। ষাটের দশকে যুদ্ধের সময় এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও রেডিও ভারতের সার্বিক মনোবল বাড়াতে সাহায্য করেছিল।

ছবি সৌজন্যে- Wikipedia

১৯৫২ সাল থেকে শুরু করে বেশ কয়েক বছরের জন্য, অল ইন্ডিয়া রেডিও হিন্দি চলচ্চিত্রের গান সম্প্রচার বন্ধ করে দেয় কারণ তৎকালীন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বি ভি কেশকার, যিনি অল ইন্ডিয়া রেডিওর দায়িত্বে ছিলেন, তিনি বিশ্বাস করতেন যে চলচ্চিত্রের গানগুলি অশ্লীল এবং পাশ্চাত্য প্রভাবযুক্ত হয়ে উঠেছে। তিনি প্রথমে চলচ্চিত্রের গানের ওপর ১০ শতাংশ কোটা চাপিয়ে দিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ফিল্ম প্রোডিউসার গিল্ড অফ ইন্ডিয়াতে আলোচনায় সমাধান না হওয়ায়, অল ইন্ডিয়া রেডিওতে বেশ কয়েক বছর ধরে পুরোপুরি হিন্দি চলচ্চিত্রের গান সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় হিন্দি চলচ্চিত্রের সংগীত শোনার জন্য লোকে রেডিও সিলোন শুনতে শুরু করে। কয়েক মাসের মধ্যেই অনেক শ্রোতাই জনপ্রিয় হিন্দি গানের টানে রেডিও সিলোনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরে। এই পটভূমিতেই

রেডিওর জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'বিনাকা গীতমালা', বিখ্যাত সঞ্চালক আমিন সায়ানির সঞ্চালনায় প্রচারিত হতো। অবশেষে, ১৯৫৭ সালে বিবিধ ভারতী স্টেশনের মাধ্যমে অল ইন্ডিয়া রেডিও তার হারানো জনপ্রিয়তা ফিরে পেতে চেয়েছিলো।

১৯৭৮ সালের পরে ট্রানজিস্টরাইজড রেডিওর উদ্ভবের ফলে সাধারণ মানুষদের মধ্যে রেডিওর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল, যদিও সেই সময়ও রেডিও কেবলমাত্র এআইআরেই সীমাবদ্ধ ছিল। কৃষিকাজ এবং স্বাস্থ্যের মতো বিষয়গুলিতে জনসাধারণকে শিক্ষিত করতে রেডিওতে শিক্ষামূলক বিভাগ এবং সাক্ষাৎকার সম্প্রচার করা হত। বেতারে বিবিধ ভারতী নামে বিনোদনমূলক সম্প্রচারও ছিল যেখানে জনপ্রিয় হিন্দি ছবির গান বাজানো হত, এটি বেতারকে পপুলার কালচারের অঙ্গ করে তুলেছিল, যা আজ অবধি প্রচলিত। ১৯৯০ এর দশকে ভারতীয় শ্রোতারা ক্রমশ বেতার থেকে মনোযোগ সরিয়ে টেলিভিশনের দিকে আকৃষ্ট হতে শুরু করেন এবং রেডিও সেট বিক্রিও কমে গেছিলো। তবে, ২০০০ সাল থেকে আবার রেডিওর জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এর পর থেকে বেতারের শ্রোতা ও আয় গড়পড়তা একটানা বৃদ্ধি পেয়ে গেছে। সম্ভবত বেতারের জনপ্রিয়তা পুনরায় বৃদ্ধি পাওয়ার পেছনে দায়ী ছিল, মোবাইল ফোনের বিকাশ ও এফএম সম্প্রচারের সূচনা। বেতার খুব সহজেই পোর্টেবল প্লেয়ার ও মোবাইল ফোনের সাথে সংযুক্ত হয়ে যেতে পেরেছিলো, আগের গণমাধ্যমগুলির মধ্যে যে সুবিধা ছিল না। এমনকি রেডিও রিসিভারগুলি, বাড়তি ব্যয় না করেই, যানবাহনের ভিতরেও সহজেই যুক্ত করে নেওয়া যেতে পারে,—এই সমস্ত সুবিধাগুলোই ক্রমশ বেতারকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। তদুপরি, ২০০০ সালে বেসরকারী সম্প্রচারকদের কাছে ১০৮টি এফএম ফ্রিকোয়েন্সি বিক্রি করার পরে ভারতীয় বেতার সম্প্রচারে আমূল পরিবর্তন আসে। যদিও ১৯৯০ এর দশকের গোড়া থেকেই টাইমস এফএমের উপস্থিতি ছিল, তবে সরকারের নিষেধাজ্ঞাগুলির জন্য এক দশক ধরেও প্রতিযোগিতামূলক বাজারে রেডিও স্থান তৈরি করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ২০০১ সালে রেডিও সিটি বেঙ্গালুরু বেসরকারি এফএম সম্প্রচারের এক নতুন ঘরানা শুরু করল যার সাথে আমরা এখন যথেষ্ট পরিচিত। বেশিরভাগ শহরে, এফএম-কে কেন্দ্র করে অল্প সময়ের মধ্যেই বেতার বেশ লাভজনক হয়ে উঠল আঞ্চলিক বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য।

৩.১.৪ ভারতে টেলিভিশন সম্প্রচার

১৯৫৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ভারতে টেলিভিশন সম্প্রচার চালু হয় প্রাথমিকভাবে দিল্লি থেকে পরীক্ষামূলক শিক্ষাবিষয়ক পরিষেবা হিসাবে। ইউনেস্কোর কাছ থেকে কুড়ি হাজার ডলার এবং ১৮০টি টিভি সেট, ফিলিপস কর্তৃক প্রদত্ত সরঞ্জাম, ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানি কর্তৃক প্রদত্ত প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম এবং ফোর্ড ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে পাওয়া দশ বছরের জন্য আর্থিক সহায়তায় ভারতে টিভি সম্প্রচার চালু হয়েছিল। প্রথম দিকে অল ইন্ডিয়া রেডিও দ্বারা পরিচালিত হয়ে, ২৫কিলোমিটার ব্যাপ্তি সহ এটি প্রতি সপ্তাহে দু''বার এক ঘন্টার জন্য প্রোগ্রাম সম্প্রচার হত। ১৯৬৫ সালে দৈনিক সম্প্রচার শুরু হয়েছিল এবং ১৯৭০ সালের মধ্যে দেশে প্রায় ২২০০০ টিভি সেট ছিল। ১৯৭২ সালে দ্বিতীয় শহর মুম্বাইতে টিভি সম্প্রচার শুরু হয়েছিল। ১৯৭৫ সালের মধ্যে কলকাতা, চেন্নাই, শ্রীনগর, অমৃতসর এবং লখনউতে টিভি স্টেশন চালু হয়ে গিয়েছিলো। ১৯৭৫-৭৬ সালে স্যাটেলাইট ইন্সট্রাকশনাল টেলিভিশন এক্সপেরিমেন্ট (ছজ্জ্বৈক্) এক বছরের জন্য, সফলতার সাথে, ভারতের অন্যতম দুর্গম ও স্বল্পোন্নত অঞ্চলের ২৪০০টি গ্রামে টেলিভিশন সম্প্রচারকে পৌঁছে দিয়েছিলো।

১৯৮২ সালে দিল্লি এবং অন্যান্য অঞ্চলের ট্রান্সমিটারগুলির মধ্যে নিয়মিত উপগ্রহ সংযোগ স্থাপন করা হয় ও তার সাথেই জাতীয় প্রোগ্রামের সূচনা হয়। এর পাশাপাশি স্বল্প ক্ষমতার ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে টিভি পরিষেবাগুলির দ্রুত

সম্প্রসারণের যুগটিরও সূচনা হয়েছিল। ১৯৮২ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমস দূরদর্শনের রঙিন সম্প্রচার চালু করার জন্য অনুপ্রেরণা এবং যথাযথ পরিকাঠামো দুটোই জুগিয়ে ছিলো।

ছবি সৌজন্যে-indianexpress.com

এই সময়েই দিল্লি দূরদর্শন এবং অন্যান্য রাজ্যের দূরদর্শন কেন্দ্রগুলির মধ্যে নিয়মিত উপগ্রহ সংযোগ স্থাপন করা হয়েছিল। দুই বছর পরে, ডিডি -২ নামে একটি দ্বিতীয় চ্যানেল চালু হয়েছিল এবং পরিষেবাগুলি মুম্বাই, কলকাতা এবং চেন্নাইয়ে প্রসারিত করা হয়েছিল। যেহেতু চারটি মহানগর শহরগুলি সংযুক্ত ছিল সেই জন্যই চ্যানেলটিকে "মেট্রো চ্যানেল" নামকরণ করা হয়েছিল তবে, এটি সাধারণত বিনোদন চ্যানেল হিসাবেই বর্ণনা করা হয়। তৃতীয় চ্যানেল, ডিডি -৩ চালু করতে দূরদর্শনের তের বছর সময় লেগেছে। ১৯৯৫ সালে এটি একটি ইনফোটেইনমেন্ট চ্যানেল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে তবে, ততক্ষণে সরকারী গণমাধ্যম বেসরকারী কেবলটিভি এবং স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলির তীব্র প্রতিযোগিতার চাপে পড়েছিল। কেবল টেলিভিশন এই সময়ে সারা ভারতবর্ষে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল, বিশেষত দেশের শহুরে এবং আধা-শহুরে অঞ্চলে। এমনকি বেশকিছু বিদেশী চ্যানেলগুলিও ভারতীয় দর্শকদের মনে গভীরভাবে জায়গা করে নিয়েছিল।

সময়ের সাথে সাথে ভারতে টেলিভিশন তার প্রসার এবং জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছে। দূরদর্শন হ''ল পাবলিক টেলিভিশন প্রতিষ্ঠান যা প্রসার ভারতী কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন। বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেলগুলি ভারতে টেলিভিশন সম্প্রচারের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জ তৈরি করে দিয়েছিল। বর্তমান সময়ে, প্রায় এক হাজার বিদেশী এবং দেশীয় টেলিভিশন চ্যানেল রয়েছে যা দূরদর্শনের সাথে প্রতিদিন প্রতিযোগিতা করে চলেছে। ভারতে টেলিভিশন শিল্প বেশ

কয়েকটি কারণ এবং পরিস্থিতির জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। জাতীয় টেলিভিশন সিস্টেমগুলির বাণিজ্যিকীকরণ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দূরদর্শনের বাণিজ্যিকীকরণ এবং স্পন্সররশিপ-এর দিকে ঝোঁক অর্থনৈতিক উদারিকরণের নতুন যুগের ক্রমবর্ধমান নব্য-উদারপন্থী নীতির দ্বারা প্রভাবিত ছিল। উদারিকরণ কেবলমাত্র টেলিভিশনের ক্ষেত্রেই নয়, বরং এটি সংবাদ, মুদ্রণ, সম্পাদনা এবং পরিবেশন করার ক্ষেত্রেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল।

বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি নিয়ে পর্যালোচনা করার জন্য এবং পরিবর্তিত সময় ও প্রয়োজন অনুসারে সম্প্রচার পরিষেবা সংশোধন করার জন্য স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে বেশ কয়েকটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। যার নিরিখে পরবর্তীকালে সম্প্রচার ব্যবস্থার সংস্কারও করা হয়েছে। ১৯৯০ সালে ভারত সরকার সম্প্রচার-সংস্থা প্রতিষ্ঠা ও তার ক্ষমতা ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা করার জন্য প্রসার ভারতী আইন প্রণয়ন করে। ভারত সরকার বিশ্বায়নের যুগে গণমাধ্যমকে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখার জন্য সম্প্রচারনীতিকে উদারিকরনের দিকে এগিয়েছিলেন। ১৯৯৭ সালে অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং দূরদর্শনকে প্রসার ভারতী কর্পোরেশনের আওতায় আনা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের রায় (১৯৯৫) এর পরে ভারতে বৈদ্যুতিন মিডিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি পরিবর্তন ঘটেছিলো; সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল যে এয়ারওয়েভ-এর ওপর অধিকার সরকারের একচেটিয়া হতে পারে না বরং এয়ারওয়েভ-এর ওপর অধিকার সকল নাগরিকের। এই রায়ের পর এফএম সম্প্রচার থেকে শুরু করে, কমিউনিটি রেডিও ও কেবল টেলিভিশনের প্রসার ও জনপ্রিয়তা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

টেলিভিশন পরিষেবাগুলির দ্রুত সম্প্রসারণ বিনোদন এবং বিজ্ঞাপন পরিষেবাকে অনেক বেশি পরিমানে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। ১৯৮০-এর দশক থেকেই টেলিভিশন আধা-বাণিজ্যিক মাধ্যম হয়ে ওঠে এবং বিশ্বায়নের পরে ভারতীয় সম্প্রচারের দ্রুত বাণিজ্যিকীকরণ হয়। ক্রমশ টেলিভিশনকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের উৎসাহে ভাটা পড়তে থাকে ও বিদেশী স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলির প্রবেশের ফলে বাণিজ্যিকীকরণের চাপ থাকার ফলে জাতীয় ইলেকট্রনিক মিডিয়া আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য যা কিছু করছিল তা আরও হ্রাস পেয়ে যায়। অর্থাৎ, বাজার-অর্থনীতির প্রভাব টেলিভিশনের বিষয়বস্তু এবং ভূমিকাটিকে উন্নয়ন থেকে বিনোদন-মুখী করে তুলেছে। সারা পৃথিবীজুড়ে বিশ্বায়ন ভোগবাদী সংস্কৃতিকে আরও প্রসারিত করেছে টেলিভিশনের সহায়তাতেই।

৩.১.৫ স্যাটেলাইট টেলিভিশন সম্প্রচার

ভারতে গণমাধ্যমের উদারিকরণ বিভিন্ন পরিসরে যথেষ্ট পরিবর্তন এনেছে। ভারতে বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেলগুলির উত্থান দেশে সম্প্রচার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নিয়ে আসে। পৃথিবীর বিখ্যাত মিডিয়া সংস্থাগুলি, যেমন নিউজ কর্প, ডিজনি, রয়টার্স ভারতীয় সম্প্রচারের বাজারে আগ্রহ দেখিয়েছে এবং ভারতীয় টেলিভিশন চ্যানেলগুলির সাথে সংযুক্তও হয়েছে। এই পরিবর্তনগুলি কিছু সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ভারতে প্রতিযোগিতামূলক সম্প্রচারের যুগ এনেছে। স্যাটেলাইট টেলিভিশনের প্রসার দূরদর্শনে আরও উন্নতমানের ও নানা ধরণের অনুষ্ঠানের অভাব, পেশাদারিত্ব এবং পরিবেশনায় বৈচিত্রের অভাবের জন্যও ঘটেছে। অপরদিকে বেসরকারি টেলিভিশনে প্রচারিত সংবাদের সংবেদনশীলকরণ এবং তুচ্ছকরণ জনসাধারণের সমালোচনাও আকৃষ্ট করেছে।

ছবি সৌজন্যে-vectorstock.com

নব্বই দশকের গোড়ার দিকেই একাধিক অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হয়েছিল উদারিকরণের নীতিকে কেন্দ্রে রেখে, এর মধ্যেই সম্প্রচার শিল্পকে উদারিকরণ ও কেবল টিভি সম্প্রচারকে উৎসাহ দেওয়ার মতো একাধিক অর্থনৈতিক সংস্কারও ছিল। এটি ভারতীয় কেবল টিভি শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায় এবং রুপার্ট মারডকের স্টারটিভি নেটওয়ার্ক, এমটিভি এবং সিএনএন-এর মতো অনেক বিদেশী প্রতিষ্ঠান ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করে। ভারতে কেবল টিভি সম্প্রচারের একেবারে প্রথম যুগে, হংকং-ভিত্তিক স্টার টিভি নেটওয়ার্ক বেশ কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেল ভারতে সম্প্রচার শুরু করেছিলো। যে সম্প্রচার পরিসর তখনও অবধি ভারত সরকার পোষিত দূরদর্শন দ্বারা একচেটিয়াবদ্ধ ছিল। কয়েক বছরের মধ্যেই কেবলের মাধ্যমে সম্প্রচারকারী প্রথম ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ভারতীয় চ্যানেল জি টিভি চালু হয় ও এশিয়া টেলিভিশন নেটওয়ার্ক (এটিএন) এর সম্প্রচার শুরু হয়। বেশ কিছু বছরের মধ্যেই ডিসকভারি চ্যানেল, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল ও স্টার টিভি নেটওয়ার্ক স্টার ওয়ার্ল ইন্ডিয়া, স্টার স্পোর্টস, ইএসপিএন, চ্যানেল-ভি এবং স্টার গোল্ড প্রচারের সাথে সাথে দর্শকদের বিনোদন ও সংবাদের বৈচিত্রকে আরও প্রসারিত করে। নব্বইয়ের দশকে, হিন্দি ভাষার চ্যানেলের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক এবং ইংরেজি ভাষার চ্যানেলও সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ২০০১-এর মধ্যে আন্তর্জাতিক চ্যানেল এইচবিও এবং হিস্ট্রি চ্যানেল পরিষেবা সরবরাহ শুরু করে। আরও দুই বছরের মধ্যে অন্যান্য আন্তর্জাতিক চ্যানেল যেমন নিকেলোডিয়ন, কার্টুন নেটওয়ার্ক, ভিএইচ ১, ডিজনি এবং টুন ডিজনি ভারতের সম্প্রচার পরিসরে প্রবেশ করেছিল। ২০০৩ সাল থেকে বিভিন্ন ভাষায় চব্বিশ ঘন্টার সংবাদ চ্যানেলের সম্প্রসার ঘটেছে; তাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হ''ল এনডিটিভি, সিএনএন আইবিএন এবং আজতক। একই সাথে জেনেরাল এন্টারটেইনমেন্ট চ্যানেল (ওক্কু)- এর তালিকা যেমন, ইউটিভি মুভিজ, ইউটিভি বিন্দাস, জুম, কালার্স, নাইন-এক্স, প্রায় দৈনিকভাবেই বেড়ে চলেছে।

কেবলটিভি ব্যবসায়ে লাভ দেখে, প্রচুর সংখ্যক মানুষ খুব অল্প সময়ের মধ্যে কেবলটিভি নেটওয়ার্ক স্থাপন করে ফেলেছিল। ১৯৯৫-৯৬ সাল নাগাদ এমন পর্যায়ে চলে যায় যে দেশে আনুমানিক ষাট হাজার কেবল অপারেটর বিদ্যমান ছিল। তাদের অনেকেরই গ্রাহক সংখ্যা ছিল পঞ্চাশজন থেকে এক হাজারের মধ্যে। এই সময় বেশিরভাগ নেটওয়ার্কগুলি কেবল ৬ থেকে ১৪টি চ্যানেল রিলে করতে পারতো, কেননা আরও বেশি সংখক চ্যানেল রিলে করার জন্য উচ্চ মানের প্রযুক্তির প্রয়োজন ছিল যা আরও বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং সেই সময় কেবল অপারেটররা এতটা বিনিয়োগ করতে সক্ষম ছিল না। এই সমস্যার সমাধানের জন্যই, একাধিক কেবল অপারেটর একসাথে হয়ে মাল্টি সিস্টেম অপারেটর (MSO)-এর সূচনা করে। এই এমএসও পরবর্তী কালে স্যাটেলাইট ও

কেবল টিভির ক্ষেত্রে অন্যতম অঙ্গ হিসাবে নিজেদের জায়গা করে নেয়। বর্তমানে সিটি কেবল, মন্থন, হ্যাথওয়ে-এর মতো ১১০০-এরও বেশি এমএসও আছে যারা এক লক্ষ্যেরও বেশি কেবল অপেরাটরকে পরিষেবা দিয়ে থাকে।

২০০১ সালে থেকেই কন্ডিশনাল অ্যাক্সেস সিস্টেম (ক্যাস)-এর মাধ্যমে টেলিভিশন সম্প্রচারের নীতি আলোচিত হতে থাকে। কন্ডিশনাল অ্যাক্সেস সিস্টেম হ''ল সেট-টপ বক্স (এসটিবি) এর মাধ্যমে ডিজিটাল উপায়ে টিভি চ্যানেলগুলির সম্প্রচার। সম্প্রচারের সিগন্যাল এনক্রিপ্ট করা থাকে এবং দর্শকদের সিগন্যালটি গ্রহণ ও ডিক্রিপ্ট করার জন্য একটি সেট-টপ বক্স কিনতে বা ভাড়া করতে হয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে চ্যানেলগুলি এবং তারপরে কেবল অপারেটরদের দ্বারা মূল্য বাড়ানোর বিষয়ে সমস্যা দেখা দেওয়ায় ক্যাসের পরিকল্পনাটি ধীরে ধীরে খারিজ হয়ে যায়। সেই জায়গায় আসে ডিজিটাল এড্ডেসেবেল সিস্টেম। তবে সেই দিক থেকে দেখতে গেলে, ক্যাসের মাধ্যমেই ভারতীয় কেবল সম্প্রচারের ডিজিটালকরণের ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে ক্যাস পরিষেবা ও ডিটিএইচ (ডাইরেক্ট টু হোম) পরিষেবার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কেবল টিভি এবং ডিটিএইচ, টেলিভিশনের সিগন্যাল পৌঁছে দেওয়ার দুটি আলাদা পদ্ধতি। যেখানে, কেবল টিভি তারের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গ্রাহকের ঘরে পৌঁছে যায়, ডিটিএইচটি একটি ছোট ডিশ এন্টেনা এবং একটি সেট-টপ বক্সের মাধ্যমে গ্রাহকের কাছে সরাসরি পৌঁছে যায়। রিলায়েন্সের মালিকানাধীন বিগ টিভি, ডিডি-ডাইরেক্ট প্লাস, ডিশটিভি, সান ডিরেক্ট, টাটা স্কাই, এয়ারটেল টিভি, ভিডিওকন ডিটুএইচ- এর মতো একাধিক সংস্থা ডাইরেক্ট টু হোম সার্ভিস দিয়ে থাকে। বর্তমানে ভারতে পাঁচ কোটিরও বেশি বাড়িতে ডিটিএইচ পরিষেবা আছে।

আবার ডিজিটাল এড্ডেসেবেল সিস্টেম (ঙ্গজ্ছ), যা ২০১২ সাল থেকে বাস্তবায়িত করা শুরু হয়েছিল তা সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল। অর্থাৎ ক্যাস-এর ক্ষেত্রে ফ্রি-টু এয়ার (এফটিএ) চ্যানেলগুলি এনালগ হিসাবে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বহন করা হলেও পে চ্যানেলগুলি এনক্রিপ্টড এবং ডিজিটালি মডিউলেটেড ফর্মে বহন করা হয় যার জন্য একটি এসটিবি প্রয়োজন হয়। কিন্তু ডিজিটাল এড্ডেসেবেল সিস্টেম-এর ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বহন করা সমস্ত চ্যানেলগুলি এনক্রিপ্ট করা হয় এবং ডিজিটালি মডিউলেট করা হয়, ফলে ফ্রি-টু এয়ার এবং পে-চ্যানেল, উভয় চ্যানেলগুলিই পাওয়ার জন্য একটি এসটিবি আবশ্যক। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ২০১২ সাল থেকে শুরু করে, বাধ্যতামূলকভাবে চারটি পর্যায়ে, ধাপে ধাপে সমগ্র ভারতের সমস্ত কেবলটিভিকেই ডিজিটাল এড্ডেসেবেল সিস্টেম-এর আওতার মধ্যে আনতে হবে। এই 'সুইচওভার' সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পরে কেবল টিভি পরিষেবা কেবলমাত্র ডিজিটাল ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই গ্রাহকের কাছে পৌঁছবে।

২০১৬ সালের হিসাবে, ভারতে ১৬০০ টিরও বেশি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল সম্প্রচারিত হয়। এর মধ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন দূরদর্শন ছাড়াও স্টার টিভি, সনি মালিকানাধীন সনি টেলিভিশন, জি টিভি, সান নেটওয়ার্ক, এশিয়ানেটের মতো কয়েক হাজার বেসরকারি চ্যানেল আছে। স্যাটেলাইট টেলিভিশন, ভারতের মতো বৃহৎ রাষ্ট্রে, বিশেষত যে সমস্ত জায়গায় টেরিস্ট্রিয়াল সিগন্যাল পৌঁছনো যথেষ্ট অসুবিধাজনক, সেই সব অঞ্চলে বিনোদন, তথ্য ও সংবাদের বৈচিত্রময় জগৎ খুলে দিয়েছে। জিও-স্টেশনারি কক্ষপথে একটি উপগ্রহ মারফত টেলিভিশন সম্প্রচার করা একটি উপযুক্ত উপায় বলে মনে করা হয়। টেলিভিশন সিগন্যালের ফুট-প্রিন্ট পৃথিবীর পৃষ্ঠের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে আছে। ১৯৯১ সালের আগে মাত্র দুটি চ্যানেল থেকে, ভারতীয় দর্শকরা পাঁচ বছরের মধ্যে ৫০টিরও বেশি চ্যানেলের সুবিধা পেয়ে যান। সফটওয়্যার প্রযোজকরা প্রায় রাতারাতি প্রোগ্রামিংয়ের ঘাটতি পূরণে নিজেদের জায়গা করে নেন ও প্রভূত মুনাফাও লাভ করেন। টেলিভিশন সম্প্রচারের এই পরিবর্তন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, বিজ্ঞাপন জগৎ এবং কিছুটা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলেছিলো।

৩.১.৬ ভারতে ইন্টারনেটের প্রসার

ভারতে প্রথম সর্বজনীনভাবে উপলব্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিদেশ সঞ্চার নিগম লিমিটেড (বিএসএনএল) দ্বারা ১৫ই আগস্ট ১৯৯৫ সালে চালু হয়েছিল। ১৯৯৫ সালে ভারতে ইন্টারনেটের পরিষেবা কয়েকটি প্রধান শহরে মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল আর সব নিয়ন্ত্রণই সরকারের হাতে ছিল। সেই সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানাধীন ভিএসএনএল, ইন্টারনেট পরিষেবা সরবরাহের জন্য দায়বদ্ধ ছিল। ল্যান্ডলাইনের মাধ্যমে অনিয়মিত সংযোগ এবং খুব অল্প ব্যান্ডউইথ গ্রাহকের কাছে পৌঁছতো। ইন্টারনেটে সার্ফিং-এর সময় প্রায়সই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত এবং এই পরিষেবার মূল্য তখনকার সময়ে বিশ্বের মধ্যে প্রায় সর্বোচ্চ ছিল। ফলস্বরূপ, ১৯৯৮-এর শেষদিকে, ভারতে তখন কেবলমাত্র দেড় লক্ষ্য ইন্টারনেট সংযোগ ছিল। যদিও এই কম সংখ্যক গ্রাহক ও পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা উদ্যোক্তাদের উৎসাহকে কমিয়ে দেয়নি যারা প্রথম থেকেই ইন্টারনেট পরিষেবার বাণিজ্যে নেমেছিলেন। এইসময়, রিডিফ ডটকম, সান্টাবান্টা ডটকম, নৌকরি ডটকম, খেল ডটকম, বাজী ডটকম থেকে শুরু করে হটমেল ইমেল পরিষেবা (যা পরে মাইক্রোসফট কিনে নেয়) অবধি চালু হয়ে যায়। উল্লেখযোগ্য যে এই সময়ে ইন্টারনেট ব্যবসায়ের জন্য অর্থের প্রাপ্যতার অভাব ছিল না। বহু বিদেশী মূলধনি সংস্থাগুলি ভারতে তাদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছিলো। ২০০০ সালের মধ্যেই বিনিয়োগকারীদের ইতিবাচক ধারণার ফলস্বরূপ বিবাহ, গেমস, গসিপ, কাজকর্ম, রান্না করা, খবর ইত্যাদি সমস্ত ধরণের ওয়েবসাইটের সম্প্রসারণ ঘটে। ১৯৯৬ সালের মধ্যেই টাইমস অফ ইন্ডিয়া, দা হিন্দু, টি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, হিন্দুস্তান টাইমস ইত্যাদি সংবাদপত্র তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরী করে ফেলে। ১৯৯৮ সালে সিফি প্রথম বেসরকারি ইন্টারনেট পরিষেবার অনুমতি পায়। পাড়ায় পাড়ায় ব্যাঙের ছাতার মতো 'সাইবার ক্যাফে' গজিয়ে উঠতে থাকে ১৯৯৮ সাল থেকেই। এই সময়টিকে 'ডট-কম বাবল' বলা

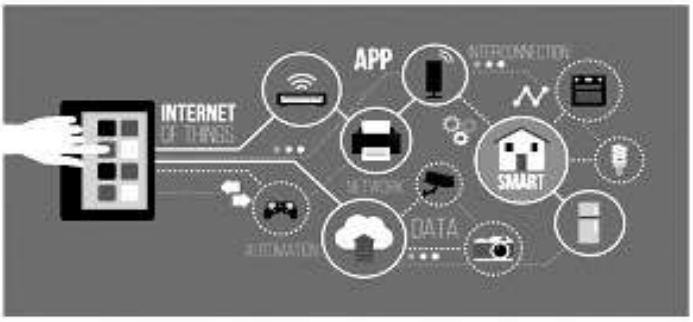

ছবি সৌজন্যে-shtterstock.com

হয় কেননা নব্বই দশকের শেষদিকে ইন্টারনেট-সম্পর্কিত সংস্থাগুলি নিয়ে অতিরিক্ত আশা করে স্টক মার্কেট ফুলে ফেঁপে ওঠে যার ফলে ইন্টারনেট ভিত্তিক ব্যবসায় ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে। তবে ২০০১ সালের মধ্যেই এই ডট-কম বাবলটি বিদীর্ণ হয়। অবশেষে ২০০১ সালেই বিনিয়োগের তুলনায় খুবই অল্প পরিমান উপার্জন, অলাভজনক ব্যবসা পদ্ধতি ও অযৌক্তিক শেয়ার মূল্যায়নের ফলে 'ডট-কম ক্র্যাশ' ঘটে সারা বিশ্বজুড়েই। ইন্টারনেট ব্যবসার পতন বাজারে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। এই পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগকারীরা মুখ ফিরিয়ে নেয় আর আস্তে আস্তে ইন্টারনেট ব্যবসায় মূলধনের প্রবাহ শুকিয়ে যায়। এই সময়ে, বেশ কয়েকটি ওয়েব ব্যবসা রাতারাতি উঠে যায় বা আর্থিক কষ্টে নিজেকে গুটিয়ে নেয়।

ইন্টারনেটের সাথে সাথে বিশ্বজুড়ে মোবাইল ইন্টারনেটের জনপ্রিয়তাও বেড়েছে। টেলিফোন, সংগীত, চলচ্চিত্র, এবং টেলিভিশন সহ বেশিরভাগ যোগাযোগ মাধ্যমগুলি মোবাইল ইন্টারনেটের মাধ্যমে পুনরায় নিজেদের ঢেলে সাজিয়ে নিচ্ছে। ভয়েস ওভার মোবাইল ইন্টারনেট প্রোটোকল (ভিওআইপি) এবং মোবাইল ইন্টারনেট প্রোটোকল টেলিভিশন (আইপিটিভি) এর মতো নতুন পরিষেবাগুলির জন্ম দিয়েছে। আবার মুদ্রণ প্রকাশনা, ওয়েবসাইট প্রযুক্তি কিংবা ব্লগিং-এর কাঠামোর সাথে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। মোবাইল ইন্টারনেট তাৎক্ষণিক বার্তাপ্রেরণ, মোবাইল ইন্টারনেট ফোরাম এবং সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের মধ্যে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার রূপগুলিকে নতুনত্ব দিয়েছে। বড় বড় খুচরা বিক্রয়কেন্দ্র এবং ছোট কারিগর এবং ব্যবসায়ী উভয়ের জন্যই অনলাইনে শপিং বিভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থাও নিয়ে এসেছে।

ইন্টারনেটের জনসংখ্যার দিক থেকে ভারত এখন দ্রুততম প্রবৃদ্ধির দিকনির্দেশ করছে। ভারতের ইন্টারনেট জনসংখ্যা জেট সেট গতিতে উর্ধমুখী হয়েছে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুসারে, আমেরিকাকে পিছনে ফেলে ভারত, চীনের পরেই বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইন্টারনেট ব্যবহারকারী দেশ হিসাবে নথিভুক্ত হয়েছে। তরুণ সমাজের কাছে ইন্টারনেটের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশন হ''ল সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং বা সোশ্যাল মিডিয়া। বিভিন্ন ধরণের যোগাযোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে উদ্ভুত হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া যা তথ্য বিতরণের ক্ষমতা, মতামতকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা, ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে সংযোগ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের সুবিধা দেওয়ার ক্ষমতায় বলীয়ান। ভারতে সক্রিয়ভাবে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে এমন লোকের সংখ্যা প্রায় তিরিশ কোটি আর সস্তা ব্রডব্যান্ড সংযোগ এবং ইন্টারনেট সক্ষম হ্যান্ডসেটের সহজলভ্যতার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার আরও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩.১.৭ সারাংশ

এই এককে আমরা বুঝতে চেষ্টা করেছি কিভাবে বিভিন্ন গণমাধ্যমগুলো স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল দিয়ে প্রভাবিত হয়েছে ও রূপান্তরিত হয়েছে। বেতার স্বাধীনতা পরবর্তী কালে সংবাদ শোনার অভ্যাস তৈরী করে দিয়েছিলো এবং বহু ঐতিহাসিক ঘটনাকে শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলো। সময়ের সাথে সাথে, বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠান ও স্টেশনের প্রসার ঘটে ও বেতার মাধ্যমটিও ভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তবে ১৯৯০ এর দশক থেকে ভারতীয় শ্রোতারা ক্রমশ বেতার থেকে মনোযোগ সরিয়ে টেলিভিশনের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যদিও, ২০০০ সাল থেকে মূলত মোবাইল ফোনের বিকাশ ও এফএম সম্প্রচারের সূচনার জন্য আবার রেডিওর জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, শুরু থেকেই টেলিভিশনের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বেড়েছে। বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেলগুলি ভারতে টেলিভিশন সম্প্রচারের ক্ষেত্রটি বেশ প্রতিযোগিতামূলক করে তুলেছে। অর্থাৎ, বাজার-অর্থনীতির প্রভাব টেলিভিশনকে ক্রমশ বিনোদন-মুখী করে তুলেছে। ১৯৯১ সালের আগে মাত্র দুটি চ্যানেল দেখার সুযোগ দর্শকরা পেলেও বর্তমানে ভারতীয় দর্শকরা ১৬০০টিরও বেশি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল দেখতে পারেন। টেলিভিশন সম্প্রচারের এই পরিবর্তন অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। বর্তমানে, বাধ্যতামূলকভাবে চারটি পর্যায়ে, ধাপে ধাপে সমগ্র ভারতের কেবলটিভিকেই ডিজিটাল এড্ডেসেবেল সিস্টেম-এর আওতার মধ্যে আনতে হচ্ছে যার ফলে কেবল টিভি পরিষেবা কেবলমাত্র ডিজিটাল ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই গ্রাহকের কাছে পৌঁছবে। একই রকম ভাবে, ভারতে প্রথম ইন্টারনেট পরিষেবা সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও, ধীরে ধীরে এই পরিষেবার বেসরকারিকরণ হয়েছে। ১৯৯৮ সালের 'ডট-কম বাবল' ও ২০০১-এর ডট-কম ক্র্যাশকে পেরিয়ে এসে বর্তমানে ইন্টারনেট এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষের জীবনে। মোবাইল ইন্টারনেটের জনপ্রিয়তার

ফলে অন্যান্য মাধ্যমগুলিও নিজেদের এই নব্যমাধ্যমের সাথে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। বর্তমানে, ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইন্টারনেট ব্যবহারকারী দেশ হিসাবে, ইন্টারনেটকে সামাজিক, বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করছে।

৩.১.৮ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন :

১. DTH-এর পুরো কথা কী?
২. ডটকম বাবল বলতে কী বোঝেন?
৩. সোশাল মিডিয়া কী?
৪. ডিজিটাল মিডিয়া কী?

বড় প্রশ্ন :

১) স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে বেতারের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
২) এফএম ভারতে বেতারকে নতুন জীবন দান করেছে—তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।
৩) ভারতে ১৯৭০-৮০র দশকে টেলিভশন সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দুটি পদক্ষেপের সম্পর্কে লিখুন।
৪) ভারতীয় কেবল টিভির ডিজিটাইজেশন সম্পর্কে লিখুন।
৫) CAS এবং DTH-এর মধ্যে পার্থক্যগুলি কি কি ?
৬) ডটকম বাবল বলতে কি বোঝেন?
৭) আপনি কি মনে করেন মোবাইল ফোন ইন্টারনেট ব্যবহারকে বাড়িয়ে দিয়েছে? —ব্যাখ্যা করুন।
৮) টীকা লিখুন : (ক) ডিজিটাল এড্ডেসেবেল সিস্টেম (খ) সোশ্যাল মিডিয়া (গ) স্যাটেলাইট চ্যানেল।

৩.১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১) *মাস কমুনিকেশন ইন ইন্ডিয়া,* কেবল জে কুমার, জাইকো পাবলিশিং হাউস, ২০১৩।
২) *হ্যান্ডবুক অফ জার্নালিজম এন্ড মাস কমুনিকেশন,* বীর বলা আগরওয়াল, নেহা পাবলিশার্স, ২০১২।
৩) *মাস কমুনিকেশন ইন ইন্ডিয়া,* জে. ভি. ভিলানিলম, সেজ পাব্লিকেশন্স, ২০০৫।
৪) *ইন্ডিয়ান মিডিয়া: গ্লোবাল এপ্রোচেস,* এড্রিয়ান এথিক, পলিটি প্রেস, ২০১২।
৫) *Mass Communication in India,* Dr. Baidyanath Bhattacharjee, Lipika.

একক : ২ □ প্রেস কমিশন এবং প্রেস কাউন্সিল

৩.২.০ গঠন

৩.২.১ উদ্দেশ্য

৩.২.২ প্রস্তাবনা

৩.২.৩ প্রথম প্রেস কমিশনের উদ্দেশ্য

৩.২.৪ প্রথম প্রেস কমিশনের সুপারিশ

৩.২.৫ প্রথম প্রেস কমিশনের কৃতিত্ব

৩.২.৬ দ্বিতীয় প্রেস কমিশন

৩.২.৭ দ্বিতীয় প্রেস কমিশনের উদ্দেশ্য

৩.২.৮ দ্বিতীয় প্রেস কমিশনের সুপারিশ

৩.২.৯ প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (পিসিআই)

৩.২.৯.১ পিসিআই এর উদ্দেশ্যসমূহ

৩.২.৯.২ প্রেস কাউন্সিল-এর কাঠামো

৩.২.৯.৩ পিসিআই এর কার্য

৩.২.৯.৪ সেন্সর করার ক্ষমতা

৩.২.৯.৫ কাউন্সিলের সাধারণ ক্ষমতা

৩.২.১০ সারাংশ

৩.২.১১ অনুশীলনী

৩.২.১২ গ্রন্থপঞ্জি

৩.২.১ উদ্দেশ্য

এই এককে প্রেস কমিশন ও প্রেস কাউন্সিল বিষয়ে আলোচনা করা হবে। ভারতের মতো উন্নয়নশীল, গণতান্ত্রিক দেশে সংবাদমাধ্যম একটি অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও নৈতিকতাকে সঠিক পথে চালিত করার জন্য অবশ্যই কোনো বিশেষ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এই এককে, প্রেস কমিশন ও প্রেস কাউন্সিলের কার্যকারিতা, কাঠামো, উদ্দেশ্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে ভারতের গণমাধ্যমের মান উন্নয়নের ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হবে।

৩.২.২ প্রস্তাবনা

স্বাধীনতার আগে বেশিরভাগ জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র ও পত্রিকা সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে একটি মিশন হিসাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভূমিকা রেখেছিল। তবে স্বাধীনতার পরে বেশ কিছু সংবাদমাধ্যমের সামনে সঠিক দিশা বা উদ্দেশ্যের বিষয়ে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিলো। অনেক মালিক কিংবা সম্পাদক তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির যন্ত্র হিসাবে সংবাদমাধ্যমকে ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। এই সময় অনেকগুলি সংবাদপত্র ও পত্রিকাই তাদের নীতিগত দিক থেকে সরে এসে, সংবাদমাধ্যমকে ব্যক্তিগত আক্রমণ, মানহানি ও অশোভনতার পরিসর হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। কিছু সংবাদপত্র ক্রমশ হলুদ সাংবাদিকতাকেও সাগ্রহে গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিল বলে মনে করা হয়। সুতরাং, সংবাদমাধ্যমের অসদাচরণগুলিকে বন্ধ করার জন্য এবং সাংবাদিকতার পেশাদারি মান উচ্চতর করার জন্য প্রেসের তৎকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য আহরণ করা ও পরিকল্পনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। প্রেস কমিশন এবং প্রেস কাউন্সিল এই উদ্দেশ্যগুলিকেই চরিতার্থ করতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এই উদ্দেশ্যগুলি নিয়ে ১৯৫২ সালে প্রথম প্রেস কমিশন নিয়োগ করা হয়েছিল। বিচারপতি জি এস রাজাধ্যক্ষ ছিলেন প্রথম প্রেস কমিশনের সভাপতি। এটি ১৯৫২ সালের ২৩ শে সেপ্টেম্বর তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক দ্বারা গঠিত হয়েছিল। দশ সদস্যের ওয়ার্কিং গ্রুপের অন্য সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন হলেন ডঃ সি.পি.রামাস্বামী আইয়ার, আচার্য নরেন্দ্র দেও, ডাঃ জাকির হুসেন, এবং ডঃ ভি.কে.ভি. রাও। প্রেস কমিশনের সুপারিশ এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের জমা দেওয়া নোট বিবেচনা করার পরে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ ১৯৫৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন, যা ভারতীয় প্রেসের ক্ষেত্রে নীতি নির্দেশক নথিতে পরিণত হয়েছিল।

৩.২.৩ প্রথম প্রেস কমিশনের উদ্দেশ্য

প্রথম প্রেস কমিশনের মূল উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপঃ

১) বাকস্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করা।

২) হলুদ সাংবাদিকতা, উত্তেজনাপূর্ণ সংবাদ প্রকাশ, জনসাধারণের উপর বিদ্বেষপূর্ণ আক্রমণ, অশোভন ও অমার্জিত সংবাদ প্রকাশ রোধ করা, সংবাদ উপস্থাপনে পক্ষপাতিত্ব বন্ধ করা এবং মন্তব্যের মাধ্যমে দায়বদ্ধতা প্রকাশ করা।

৩) নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা, মালিকানা এবং আর্থিক কাঠামো পাশাপাশি দেশের সংবাদপত্র শিল্পের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অনুসন্ধান করা।

৩.২.৪ প্রথম প্রেস কমিশনের সুপারিশ

প্রথম প্রেস কমিশনের সুপারিশগুলিই প্রথম একটি দায়িত্বপূর্ণ প্রেসের কেমন হওয়া উচিত তার ধারণা দেয়ঃ

ক) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করতে এবং সাংবাদিকতার উচ্চমান বজায় রাখতে একটি প্রেস কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

খ) সংবাদপত্রের প্রকাশনার হিসাব রাখার জন্য এবং প্রতি বছর সংবাদপত্রের অবস্থান নির্ধারণের জন্য সংবাদপত্রের নিবন্ধক (আরএনআই) নিযুক্ত হওয়া উচিত।

গ) ভয়াবহ প্রতিযোগিতা থেকে ছোট সংবাদপত্রগুলিকে রক্ষা করতে মূল্য-পৃষ্ঠার পরিকল্পনা চালু করা উচিত

ঘ) সরকার ও প্রেসের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য একটি প্রেস পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করতে হবে।

ঙ) কর্মজীবী সাংবাদিক আইন কার্যকর করতে হবে।

চ) এটি সংবাদপত্র এবং সংবাদ সংস্থাগুলির আর্থিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করার জন্য একটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি গঠনের সুপারিশ করেছিল।

ছ) সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার মূল নীতিগুলি রক্ষার জন্য এবং একচেটিয়া ব্যবসার প্রবণতার বিরুদ্ধে নতুন সংবাদপত্রগুলিকে সাহায্য করার জন্য একটি ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন গঠন করা উচিত।

জ) পিটিআইকে একটি সরকারী সংস্থাতে রূপান্তর করা প্রয়োজন।

ঝ) বিশেষতঃ উচ্চস্তরে, মূলধন এবং কর্মীদের উভয়েরই আঞ্চলিকীকরণ হওয়া উচিত; তাছাড়াও মূলত ভারতীয়দের হাতেই সংবাদপত্রের মালিকানার ভার থাকে প্রয়োজন।

৩.২.৫ প্রথম প্রেস কমিশনের কৃতিত্ব

প্রথম প্রেস কমিশনের বেশ কিছু প্রশংসনীয় সাফল্য রয়েছে। এই কমিশন সংবাদপত্র শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল।

প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া ১৯৬৬ সালে প্রেসের উপর কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ আনার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে প্রকাশনা এবং সংবাদপত্রের নামের হিসাব সংরক্ষণের জন্য আরএনআই নিয়োগ করা হয়েছিল।

একই সালে, মূল্য-পৃষ্ঠার পরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়েছিল; তবে, পরে এটি আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী বাতিল করা হয়।

প্রেস পরামর্শদাতা কমিটি ১৯৬২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর গঠিত হয়েছিল।

১৯৫৫ সালে কর্মজীবী সাংবাদিক আইনটি গৃহীত হয়।

১৯৭২ সালের ১৪ই এপ্রিল সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার আর্থিক অবস্থান সম্পর্কিত একটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এটি ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৭৫ সালে তার প্রতিবেদন জমা দেয়।

সংবাদপত্রের ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনের প্রয়োজনীয়তা নীতিগতভাবে গৃহীত হয়েছিল; ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে এই বিষয়ক একটি বিলও লোকসভায়ও উপস্থাপিত হয়েছিল, তবে তা আইন হিসাবে বলবৎ হাওয়ার আগেই, সেই বিল পাশ করার সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়।

৩.২.৬ দ্বিতীয় প্রেস কমিশন

১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা চলাকালীন, স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতীয় প্রেসের উপর প্রথম সরকারি নিষেধাজ্ঞার অভিজ্ঞতার ঠিক ১৫ মাস বাদেই দ্বিতীয় প্রেস কমিশন গঠিত হয়। জরুরি অবস্থা উঠিয়ে নেওয়ার পরই ভারত সরকার ১৯৭৮ সালের ২৯শে মে দ্বিতীয় প্রেস কমিশন গঠন করে। দ্বিতীয় প্রেস কমিশন চেয়েছিল যে সংবাদমাধ্যম যেন কেবলমাত্র নির্বোধের মতো বিরোধী অথবা প্রতিবাদহীন মিত্র না হয়ে ওঠে। কমিশন চেয়েছিল, উন্নয়ন প্রক্রিয়াতে সাংবাদিকতার একটি দায়িত্বশীল ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। জনগণের কাছে তাদের আকাঙ্ক্ষা ও সমস্যাগুলি প্রতিফলিত করার জন্য প্রেস যেন সাধারণ মানুষের সহজ নাগালের মধ্যেই থাকে।

দুটি প্রেস কমিশনেই সংবাদমাধ্যমের বেশ কয়েকজন সম্মানিত সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। দ্বিতীয় প্রেস কমিশন সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেছিল যে উন্নয়নই যে কোনও দেশের গণমাধ্যমের কেন্দ্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত, যা একটি স্বনির্ভর ও সমৃদ্ধশালী সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। কমিশন ঘোষণা করেছিল যে দায়িত্বশীল গণমাধ্যমের ধারণার সাথে স্বাধীন গণমাধ্যমের ধারণার কোনো বিরোধিতা নেই। স্বাধীনতা এবং দায়িত্ব একে অপরের পরিপূরক, বিপরীতমুখী শর্ত নয়। সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে শহরের প্রতি পক্ষপাতিত্বর প্রশ্নটিও কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কমিশন উল্লেখ করেছিল যে উন্নয়ন হওয়ার জন্য জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার মতো অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কমিশন সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব রোধ করার জন্য গণমাধ্যমের ভূমিকা এবং দায়িত্বও তুলে ধরেছিল।

৩.২.৭ দ্বিতীয় প্রেস কমিশনের উদ্দেশ্য

- দ্বিতীয় প্রেস কমিশন যে সমস্ত উদ্দেশ্যগুলিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিল, সেগুলি হলো ঃ
- উন্নয়নশীল এবং গণতান্ত্রিক সমাজে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা।
- বর্তমান সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি বাক-স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কিত; এবং এই স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য আইন, বিধি ও নিয়মগুলির যথাযোগ্যতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করার পক্ষে এটি পর্যাপ্ত কিনা।
- মালিকপক্ষের তরফ থেকে আসা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপের বিরুদ্ধে প্রেসের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়।
- রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক নীতির প্রতি সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা এবং দায়িত্ব গ্রহণ।
- মালিকানার কাঠামো, পরিচালনার রীতি এবং সংবাদমাধ্যমের আর্থিক কাঠামোর সাথে বৃদ্ধি, সম্পাদকীয় স্বাধীনতা এবং পেশাদারিত্বের সম্পর্ক।
- একজাতীয় বহুসংখক খবরের কাগজ এবং তাদের সাথে বাজার অর্থনীতির যোগাযোগ কিভাবে প্রতিযোগিতা ও পাঠকের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পাওয়া ও মন্তব্য করার অধিকারের উপর প্রভাব বিস্তার করে।
- সংবাদপত্র শিল্পের সাথে জড়িত অর্থনীতির আলোচনা।

৩.২.৮ দ্বিতীয় প্রেস কমিশনের সুপারিশ

দ্বিতীয় প্রেস কমিশন সরকারের দায়বদ্ধ ও গঠনমূলক সমালোচক হিসাবে সংবাদ মাধ্যমকে দেখতে চেয়েছিলো। কমিশন অনুভব করেছিল যে কেবল বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু অবধি সম্পাদকদের কর্তৃত্ব সীমিত থাকা উচিত নয়, বরং বিজ্ঞাপনের জন্য কতটা স্থান সংবাদপত্রে রাখা হবে সে বিষয়েও সম্পাদকদের মতামতের অধিকার থাকা উচিত। প্রেস কমিশনের ধারণায়, জনগণের কাছে সংবাদ মাধ্যমের একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং দায়িত্ব রয়েছে এবং ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে এটি অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে না। এই সকল ধারণার নিরিখে, দ্বিতীয় প্রেস কমিশনের মূল সুপারিশগুলি ছিল ঃ

- সরকার ও সংবাদমাধ্যমের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা উচিত।
- ছোট ও মাঝারি সংবাদপত্রের উন্নতির জন্য সংবাদপত্র বিকাশ কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- সংবাদপত্র শিল্পকে অন্যান্য শিল্প ও বাণিজ্যিক বিষয় থেকে পৃথক ভাবে ভাবা উচিত।
- পত্রিকার সম্পাদক এবং মালিকপক্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য বোর্ড অব ট্রাস্টি নিয়োগ করতে হবে।
- মূল্য-পৃষ্ঠার পরিকল্পনা চালু করা উচিত।
- ছোট, মাঝারি ও বড় সংবাদপত্রগুলিতে সংবাদ এবং বিজ্ঞাপনগুলির একটি নির্দিষ্ট অনুপাত থাকতে হবে।
- সংবাদপত্রের শিল্পকে বিদেশী মূলধনের প্রভাব থেকে মুক্ত করা উচিত।
- কোন ভবিষ্যদ্বাণী সংবাদপত্র এবং পত্রিকাতে প্রকাশ করা উচিত নয়।
- বিজ্ঞাপন-চিত্রের অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে।
- সরকারের উচিত একটি দৃঢ় বিজ্ঞাপন নীতি প্রস্তুত করা।
- প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো পুনর্গঠন করতে হবে।
- সাংবাদিকতা শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা।

৩.২.৯ প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (পি.সি.আই)

প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (পিসিআই) একটি স্বায়ত্তশাসিত, স্ব-নিয়ন্ত্রক, আইনী সংস্থা, যা গণমাধ্যমের প্রয়োগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য গঠিত হয়েছিল। ১৯৬৬ সালের ৪ জুলাই প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া গঠিত হয় এবং ১৬ই নভেম্বর থেকে এই সংস্থা কাজ শুরু করে (সেই কারণে এই তারিখেই জাতীয় প্রেস দিবস উদযাপিত হয়) পিসিআইয়ের প্রথম সভাপতি ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি জাস্টিস জে.আর. মুধোলকর।

পিসিআইয়ের মূল কাজটি প্রেসের স্বাধীনতা যাতে বজায় থাকে তা নিশ্চিত করা। তবে অভিযোগ প্রাপ্তির পরে শুনানি এবং যথাযথভাবে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। দোষী সাব্যস্ত হলে, পিসিআই অভিযুক্ত সাংবাদিকদের সতর্ক করতে পারে বা সেন্সরও করতে পারে।

৩.২.৯.১ পি.সি.আই-এর উদ্দেশ্যসমূহ

প্রেস কাউন্সিল আইন, ১৯৬৫ অনুসারে প্রেস কাউন্সিল-এর মূল উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ:

সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা বজায় রাখা।

যথার্থ পেশাদারিত্বের মান অনুসারে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের জন্য আচরণবিধি তৈরি করা।

সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের পক্ষে উচ্চমানের জন-রুচির রক্ষণাবেক্ষণ এবং নাগরিকত্বের অধিকার এবং দায়িত্ব উভয়ের যথাযথ বোধ জাগ্রত করা।

সাংবাদিকতার পেশায় নিয়োজিত সকলের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও জনসেবায় নিজেকে নিয়োগ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া।

- জনস্বার্থের সাথে জড়িত সংবাদের সরবরাহ ও প্রচারকে সীমাবদ্ধ করতে পারে এমন যে কোনও বিষয়কে নজরে রাখা।
- কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী, ভারতের যে কোনও সংবাদপত্র বা নিউজ এজেন্সি যদি বিদেশী উৎস থেকে কোনো সাহায্য পেয়ে থাকে, তাহলে এই সম্পর্কিত বিষয়টিও নজরে রাখা।
- সঠিক সময়ে সংবাদপত্রগুলিতে সংবাদ সরবরাহ ও প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করা।
- সাংবাদিকতার পেশার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা প্রদান।
- সংবাদপত্রের প্রকাশনাতে নিয়োজিত সকল শ্রেণির ব্যক্তির মধ্যে যথাযথ ও কার্যকরী সম্পর্ককে উৎসাহিত করা
- যে সমস্ত প্রবণতাগুলির জন্য সংবাদপত্রের মালিকানা একচেটিয়া বাণিজ্যের দিকে ঝুঁকতে পারে, সেই সমস্ত বিষয়গুলিকে পর্যবেক্ষণ করা; এর মধ্যে থাকতে পারে সংবাদপত্রের মালিকানা ও তার আর্থিক কাঠামো বিষয়ে অনুসন্ধান; প্রয়োজনে প্রেস কাউন্সিল প্রতিকারের পরামর্শও দিতে পারে।

৩.২.৯.২ প্রেস কাউন্সিল-এর কাঠামো

শুরুতে পিসিআইয়ের ২৫ জন সদস্যের একটি কমিটি ছিল। বর্তমানে, এটি চেয়ারম্যানসহ ২৮ জন সদস্যের একটি কমিটি। নিম্নলিখিত তালিকা অনুসারে এই ২৮ জন সদস্য নির্বাচিত করা হয়েছে। প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার সভাপতিত্ব

করেন চেয়ারম্যান, যিনি ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক। বিচারপতি চন্দ্রমৌলী কুমার প্রসাদ বর্তমানে এই কাউন্সিলের সভাপতি হিসাবে নিয়োজিত আছেন। তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য নিয়োগ পেয়েছেন। ২০১৪ সাল পর্যন্ত, তাঁর পূর্বসূরি ছিলেন বিচারপতি মার্কান্দ কাটজু। বর্তমানে, কাউন্সিলের ২৮ জন সদস্য রয়েছে যার মধ্যে ২০ জনকে প্রেস সংস্থা, এজেন্সি এবং অন্যান্য সংস্থা মনোনীত করে প্রেসের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। সংসদের ২ টি হাউস দ্বারা ৫ জন সদস্য মনোনীত হন এবং ৩ জন সাংস্কৃতিক ও আইনী ক্ষেত্রের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ভারতের বার কাউন্সিলের একজন মনোনীত হন। তারা তিন বছর মেয়াদের নির্দিষ্ট অধিবেশনের জন্য মনোনীত হন।

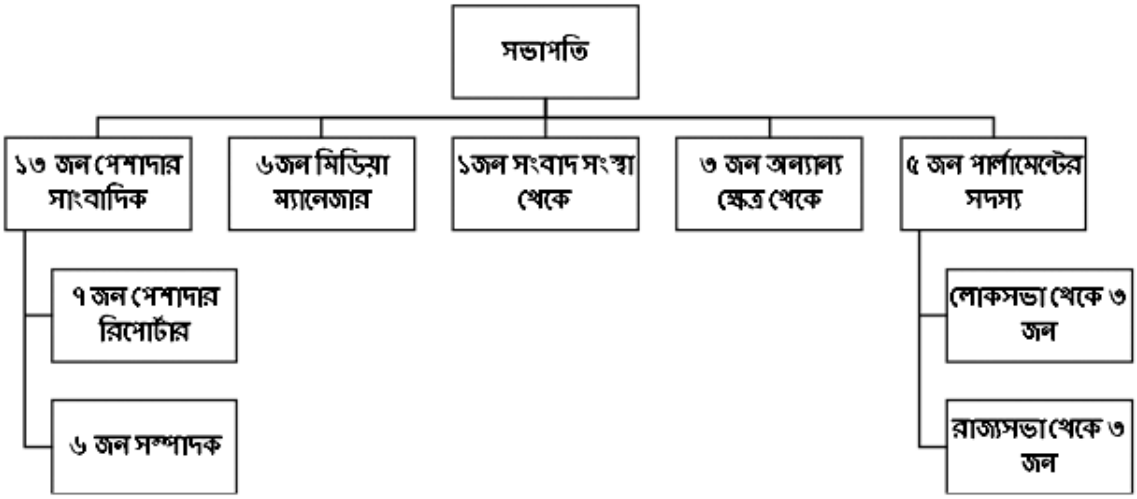

৩.২.৯.৩ পিসিআই এর কার্য ঃ

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, পিসিআইয়ের মূল কাজটি হ''ল গণমাধ্যমকে পর্যবেক্ষণ করা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যাতে খর্ব না হয় সেই দিকে নজর রাখা। এই সমস্ত বিষয়গুলি প্রেস কাউন্সিল আইন, ১৯৬৫-এর ১৪ এবং ১৫ নম্বর ধারায় দেওয়া রয়েছে। সেন্সর করার ক্ষমতা বর্ণিত হয়েছে ১৪ নং ধারায় ও ১৫ নং ধারায় ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে কিছু সাধারণ ক্ষমতার।

৩.২.৯.৪ সেন্সর করার ক্ষমতাঃ

সাংবাদিকতার নীতি, শোভনতা বা পেশাদারি আচরণের বিরুদ্ধাচারণ করার দোষ প্রমাণিত হলে সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা যে কোনও সাংবাদিকের বিরুদ্ধে তদন্ত করার, সতর্ক করার অথবা সেন্সর করার অধিকার পিসিআইয়ের রয়েছে। এই বিষয়ে অভিযোগ পাওয়ার পরে পিসিআই নিয়মানুবর্তিতামুলক ব্যবস্থা নিতে পারে। এই সমস্ত মামলার চূড়ান্ত রায় দেওয়ার আগে, কাউন্সিল সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা সাংবাদিককে তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে পারে। সভাপতির মতামত অনুসারে, তদন্ত করার জন্য যথার্থ ক্ষেত্র না থাকলে কাউন্সিল কোনও অভিযোগের উপর নজর নাও দিতে পারে। কাউন্সিল সংবাদপত্র, সংবাদসংস্থা, সম্পাদক বা সাংবাদিককে নাম সহ যে কোনও তদন্ত সম্পর্কিত যে কোনও বিবরণ প্রকাশ করতে বলতে পারে। কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং তার বিরুদ্ধে কোনো আইন আদালতে কোনও প্রশ্ন তোলা যায় না। এবং তাই পিসিআই প্রেসের স্বাধীনতা বিষয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতা উপভোগ করে তবে মনে রাখা প্রয়োজন, এর কোনও দন্ডবিধায়ক ক্ষমতা নেই।

৩.২.৯.৫ অধীনে কাউন্সিলের সাধারণ ক্ষমতা ঃ

(১) ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধির অনুসারে, পিসিআই ভারতের দেওয়ানি আদালতে ন্যস্ত ক্ষমতাগুলি বেশ কয়েকটি উপভোগ করে। পিসিআই নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নিতে পারেঃ

- ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের তলব করা ও তাদের উপস্থিত হতে বাধ্য করা; শপথ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের উত্তর দিতে বলা।
- বিভিন্ন কাগজপত্র দেখতে চেয়ে পাঠানো ও প্রদর্শন করার নির্দেশ
- হলফনামা নিয়ে প্রমাণ দাখিল করানো
- কোনও আালত বা অফিস থেকে যে কোনও পাবলিক রেকর্ড-এর অনুলিপি অধিগ্রহণ।
- সাক্ষীদের বিষয়ে তদন্ত, নথিপত্র পরীক্ষা, বা অন্য কোনও নির্ধারিত বিষয়ের জন্য কমিশন গঠন করতে পারে।

(২) উপ-ধারা (১) এর কোন কিছুই সংবাদপত্র, সংবাদসংস্থা, সম্পাদক বা সাংবাদিককে সেই সংবাদপত্র দ্বারা প্রকাশিত বা সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা সাংবাদিক কর্তৃক প্রতিবেদনে যে কোনও সংবাদ বা তথ্যের উৎস প্রকাশ করতে বাধ্য করতে পারবে না।

(৩) কাউন্সিল কর্তৃক সংঘটিত প্রতিটি তদন্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৯৩ এবং ২২৮ ধারা অনুযায়ী বিচার বিভাগীয় কার্যকলাপ বলে গণ্য করা হবে।

৩.২.১০ সারাংশ

সংবাদ মাধ্যম আজকের বিশ্বে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদগুলির মান অত্যন্ত উন্নত হওয়া উচিত কারণ ভারতের বৃহদ সংখ্যক নাগরিক সংবাদপত্র পড়ে এবং এটি তাদের দৈনন্দিন জীবনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। স্বভাবতই, সংবাদপত্রে কোনও অস্পষ্ট, অসত্য ও পক্ষপাতপূর্ণ সংবাদ প্রকাশ করা অনুচিত। প্রেস কমিশন ও প্রেস কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর ভারতের সংবাদ মাধ্যমের পরিস্থিতি অনেকটাই উন্নত হয়েছে। কোনও ভুয়া বা পক্ষপাতপূর্ণ সংবাদ প্রকাশের আগে সাংবাদিকরা এখন ভয় পান কারণ এটি তাদের কর্মজীবনে প্রভাব ফেলতে পারে এবং তাঁদের লাইসেন্সও বাতিল হতে পারে। একটি শক্তিশালী এবং সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য, সংবাদ মাধ্যমের সবরকম স্বাধীনতা উপভোগ করা উচিত, তবে তার সাথে থাকা উচিত যথার্থ দায়বদ্ধতা। গণমাধ্যমের বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে যখন নিয়মভঙ্গ হয় অথবা অপেশাদারী আচরণের জন্য যখন সংবাদমাধ্যম সমালোচিত হয়, তখন তাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ও সঠিক পথে চালিত করার জন্য অবশ্যই একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এই নিয়ন্ত্রণটি সরকার বা কোনও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে না এসে, এই পেশার মধ্যে থেকেই উঠে আসা উচিত। এবং এই কাজগুলিই প্রেস কমিশন ও প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার দায়িত্ব।

৩.২.১১ অনুশীলনী

১) প্রথম প্রেস কমিশনের সুপারিশগুলি একটি দায়িত্বপূর্ণ প্রেসের কেমন হওয়া উচিত তার ধারণা দেয়- ব্যাখ্যা করো।

২) প্রথম প্রেস কমিশনের কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ সম্পর্কে লেখ।

৩) দ্বিতীয় প্রেস কমিশনের উদ্দেশ্যগুলি কী ?

৪) দ্বিতীয় প্রেস কমিশনের সুপারিশগুলি সংক্ষেপে লেখো।

৫) রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রেস কাউন্সিল-এর কাঠামো ব্যাখ্যা করো।

৬) প্রেস কাউন্সিলের সাধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে যা জানো লেখো।

৭) প্রেস কাউন্সিল আইনে বিবৃত উদ্দেশ্যগুলি কী ?

৮) টীকা লেখো: (ক) প্রেস কাউন্সিলের সেন্সর করার ক্ষমতা (খ) প্রেস কাউন্সিলের গঠন কাঠামো।

৩.২.১২ গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১) *ভারতের প্রেস আইন,* বংশী মান্না, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১১।

২) *ল অফ দ্যা প্রেস,* দুর্গা দাস বসু, লেক্সিস নেক্সিস, ২০১০।

৩) *মিডিয়া ল অ্যান্ড এথিকস,* এম নীলামালার, প্রেন্টিস হল ইন্ডিয়া, ২০০৯।

৪) *মিডিয়া ল, ডঃ এস আর মাইনেনি,* এশিয়া ল হাউস, ২০১৭।

৫) *ক্রাইসিস অফ ইন্ডিয়ান প্রেস,* ইকোনমিক এন্ড পলিটিকাল উইকলি, সংখ্যা ১৭(২৩), ১৯৮২।

একক : ৩ □ ভারতীয় গণমাধ্যম ও বিশ্বায়ন

৩.৩.০ গঠন

৩.৩.১ উদ্দেশ্য

৩.৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩.৩ বিশ্বায়ন ও গণমাধ্যম

৩.৩.৪ উদারীকরণ ও বিশ্বায়নঃ ভারতের প্রেক্ষিতে

৩.৩.৫ প্রিন্ট মিডিয়ায় বিশ্বায়নের প্রভাব

৩.৩.৬ টেলিভিশনের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব

৩.৩.৭ চলচ্চিত্র শিল্পের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব

৩.৩.৮ এফডিআই ও ভারতীয় গণমাধ্যম

৩.৩.৯ সারাংশ

৩.৩.১০ অনুশীলনী

৩.৩.১১ গ্রন্থপঞ্জি

৩.৩.১ উদ্দেশ্য ঃ

এই এককে ভারতীয় গণমাধ্যমের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব ও গণমাধ্যমে বিদেশী বিনিয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। বিশ্বায়নের ফলে ভারতের গণমাধ্যমে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। প্রিন্ট মিডিয়া ও টেলিভিশন থেকে শুরু করে চলচ্চিত্র পর্যন্ত গণমাধ্যমের সমস্ত ক্ষেত্রেই আমূল পরিবর্তন এসেছে বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের ফলে। বিশেষ করে গণমাধ্যমে বিদেশি বিনিয়োগের দরজা খুলে দেওয়ার ফলে ভারতীয় গণমাধ্যমের পরিকাঠামো, অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও বাজেট বিষয়ে একাধিক পরিবর্তন এসেছে। এই এককে বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের গণমাধ্যমের যে রূপান্তরগুলি ঘটেছে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

৩.৩.২ প্রস্তাবনা

বিশ্বায়ন হল বিশ্ব বাণিজ্য ও যোগাযোগের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্কৃতি, সমাজ এবং অর্থনীতিকে একীভূত করার প্রক্রিয়া। এটি মূলত অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে। বিশ্বায়নের প্রভাব অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। এই প্রক্রিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে যাতে নানা ধরণের পরিবর্তন আসতে পারে। বিশ্বায়ন কেবল দেশের আর্থিক অবস্থাকেই প্রভাবিত করে না, শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রও বিশ্বায়ন দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিশ্বায়ন, বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্য বিভিন্ন বৈদেশিক পণ্য সরবারহের পথও সুগম করে দেয়।

গনমাধ্যমের উপর বিশ্বায়নের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবেই তার প্রভাব সাধারণ মানুষের উপরও পরে। বিশ্বায়নের সর্বাধিক দৃশ্যমান প্রভাব হ''ল যোগাযোগ ব্যাবস্থার আসামান্য সম্প্রসারণ। সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, ইন্টারনেট এবং টিভি তথ্য ও বার্তা ছড়িয়ে দিতে ব্যাপক সহায়তা করেছে এবং বিশ্বজুড়ে মানুষকে একত্রিত হতে সাহায্য করেছে। যদিও, সেই দিক থেকে দেখতে গেলে, এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের নিজস্ব কিছু অসুবিধা রয়েছে, আবার সুবিধাগুলিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

গনমাধ্যমের বিশ্বায়ন বিশ্বের সর্বত্র সমানভাবে অনুভূত হওয়ার মতো একটি অভিজ্ঞতা নয়। কলিন স্পার্কস যেমন যুক্তি দিয়েছে, কোনও গণমাধ্যমই সম্পূর্ণরূপে 'বিশ্বব্যাপী' নয়। তদুপরি, তথাকথিত গ্লোবাল মিডিয়াগুলির দর্শকবৃন্দ সংখ্যায় অল্প, বেশ ধনী এবং যথেষ্টভাবে ইংরাজী ভাষায় পারদর্শী। এক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী জন-পরিসর যে আদৌ প্রভাবশীল এমনটা প্রমাণ করা যথেষ্ট দুষ্কর এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জন-পরিসরের ধারণা এখনও রাষ্ট্র-কেন্দ্রিক। অর্থাৎ, বিশ্বায়ন অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক, উভয় গণমাধ্যমের সহায়তাতেই যে সম্ভব হয়েছে সে বিষয়ে কোনও প্রশ্ন নেই।

'বিশ্বায়নের' এই প্রক্রিয়াটি প্রায়শই একটি ইতিবাচক শক্তি হিসাবে চিত্রিত হয় যা বিভিন্ন সমাজকে একইসূত্রে বেঁধে চলেছে। বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতি একসাথে এসে একটি 'গ্লোবাল ভিলেজ' এ পরিণত হচ্ছে এবং এর ফলে সমাজ, অর্থনীতি ও বাণিজ্য সমৃদ্ধও হচ্ছে। বিশ্বায়নের প্রক্রিয়াটি যেন মানুষের বিবর্তন এবং অগ্রগতির একটি অনিবার্য ফল হিসাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে; যেন এটি একটি প্রাকৃতিক নিয়ম, প্রকৃতির আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, বিশ্বায়ন কিন্তু বিশ্বব্যাপী মানুষ ও সংস্কৃতির মধ্যের যোগাযোগ এবং মিথস্ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত একটি স্বাভাবিক অগ্রগতি নয়। বরং এটি হলো, শক্তিশালী দেশগুলি, বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি, এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির নিজস্ব কিছু নীতি নির্ধারণের ফল, যাতে অনেকসময়ই তাদের নিজেদের স্বার্থও জড়িত থাকে। বিশ্বায়নের ফলেই কিন্তু নতুন যোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি বিদেশী বাজারে প্রবেশ করে বৃহৎ কর্পোরেশনগুলির জন্য সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের পদ্ধতি সরবরাহ করেছে।

৩.৩.৩ বিশ্বায়ন ও গনমাধ্যম

'বিশ্বায়ন' নব্বইয়ের এর দশকে একটি অন্যতম পরিভাষা হিসাবে দেখা দিয়েছিলো। তবে, 'বিশ্বায়ন' এর অনেক অর্থ রয়েছে। সমসাময়িক মিডিয়া বিশ্বায়নের একটি অন্যতম প্রক্রিয়া। যার বৈশিষ্টগুলি হলো:

- বিশ্বব্যাপী (কেবল জাতীয় বা আঞ্চলিক নয়) পরিসরকে মাথায় রেখে উপস্থাপিত হয়।
- উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বিশ্বব্যাপী সংগঠিত হয়।
- কিছুটা আন্তঃনির্ভরতা জড়িয়ে থাকে, যাতে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতি একে অপরের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।
- প্রায়শই গণমাধ্যম এবং প্রযুক্তিগুলি কেবলমাত্র দ্রুত যোগাযোগের বদলে একেবারে তাৎক্ষণিক যোগাযোগের সুযোগ করে দেয়।

প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে চীনে পেপারমেকিং এবং মুদ্রণের উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে যোগাযোগ প্রযুক্তির শুরু হয়েছিল। কাগজের ব্যবহার বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং বই ও পত্রপত্রিকাগুলি যে জায়গাতে তৈরি করা হচ্ছিলো তার বাইরেও বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। তবে, 'বিশ্বায়ন' সাধারণভাবে উদারনৈতিক অর্থনীতি বা আমরা যে বিশ্বব্যাপী ভোক্তা পুঁজিবাদের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করছি তার একটা নির্দিষ্ট ধাপকেই বোঝায়।

সারা পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক পুনর্গঠন এখন কিছুটা হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক কর্তৃত্বকে কমিয়ে এনেছে। বিভিন্ন মার্কিন বাণিজ্য সংস্থার মালিকানা ও শেয়ারের অধিকারের উপর দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, অনেক মার্কিন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানই অন্যান্য বিভিন্ন দেশের কোম্পানি বা ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জাপানী সংস্থা সোনি ১৯৯৯ সালে আমেরিকার কলম্বিয়া এবং ট্রাইস্টার পিকচার্স কিনেছিল; জার্মান কর্পোরেশন বার্টেলসম্যান আরসিএ এবং র‍্যান্ডমহাউস প্রকাশনা কিনে নেয়; তৎকালীন অস্ট্রেলিয়ান রুপার্ট মারডক ১৯৮৬ সালে টোনটিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স কিনে নিয়েছিলেন; ২০০৮ সালে ভারতীয় মিডিয়া কর্পোরেশন রিলায়েন্স বিগ পিকচার্স স্টিভেন স্পিলবার্গের ড্রিম ওয়ার্কস স্টুডিওর একটি বড় অংশও কিনে নিয়েছে।

৩.৩.৪ উদারীকরণ ও বিশ্বায়নঃ ভারতের প্রেক্ষিতে

১৯৮০-র দশক অবধি ভারত সীমিত আন্তর্জাতিক চুক্তির মধ্যে থেকে নিজস্ব অর্থনৈতিক বিকাশ সাধন করেছিল। বিশ্বব্যাংকের সাথে চুক্তি করতে অস্বীকার করে, ভারত তৎকালীন অবিভক্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ঋণ নিয়ে পরিকাঠামো, তেল অনুসন্ধান ও পরিশোধন, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারী খাতের উদ্যোগকে উন্নত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এই নীতিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন কারণ রাষ্ট্র বিদেশী পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতাকে আটকে রেখেছিলো। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে রাজীব গান্ধী প্রশাসন সাময়িকভাবে অর্থনৈতিক উদারিকরণের প্রক্রিয়া শুরু করে। ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের সাথে যুক্ত হওয়া ব্যয় বৃদ্ধি এবং তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকট দেখা দেয়। এই সময় ভারত সরকার মাত্র দুই সপ্তাহের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থাকতে থাকতেই বেল-আউটের জন্য বিশ্বব্যাংকের দিকে ফিরে যায়। যে স্বনির্ভরতার পথ গান্ধী ও নেহেরুর মতো জাতীয়তাবাদী নেতারা দেখিয়েছিলেন, পরিকাঠামোগত অদলবদলের সাথে সম্পর্কিত শর্তগুলি ভারতকে সেই স্বনির্ভরতার পথ থেকে সরে আস্তে বাধ্য করে। আইএমএফের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে, সরকার ১৮টি শিল্প ব্যতীত সকলের জন্য লাইসেন্সিং বন্ধ করে দেয়, বহুজাতিক বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি অনেক সহজ করে দেয় এবং ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে বহুজাতিক সংস্থাগুলির অনুমোদিত অংশীদারিত্বও বাড়িয়ে দেয়। ১৯৯১ সালে প্রায় হঠাৎ করে ভারতীয় টাকার অবমূল্যায়ন করা হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রার উপর বেশিরভাগ নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করা হয়। এইভাবে ভারতে অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের সূচনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল আইএমএফ।

৩.৩.৫ প্রিন্ট মিডিয়ায় বিশ্বায়নের প্রভাব

গত পাঁচ বছরে এশিয়াতে সংবাদপত্রের প্রিন্ট সার্কুলেশনে অবিচ্ছিন্নভাবে ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে এবং একই সময়ে ভারতে মধ্যে প্রিন্ট সার্কুলেশন বৃদ্ধি পেয়েছে ৭.২ শতাংশ। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, বিশ্বের প্রায় অর্ধেকেরও বেশি বয়স্ক, শিক্ষিত জনগোষ্ঠী অন্তত একটি সংবাদপত্র পড়েন। ভারতে সংবাদপত্রের বৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদা সাক্ষরতার বৃদ্ধিরই

ফলস্বরূপ। দেশ বিভাগের সময় আমাদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ছিল ১২%, যা ২০১৩ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৫.৮%। লিখতে পড়তে পারা এই জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও ডিজিটাল মাধ্যমে খবরের অ্যাক্সেসের সীমাবদ্ধতা স্বাভাবিকভাবেই সংবাদপত্রের পাঠকদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছে। এটিই আঞ্চলিক সংবাদপত্রগুলির অভূতপূর্ব উত্থানেরও কারণ।

ছবি সৌজন্যে : financialexpress.com

আরএনআই-র প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, ভাষার ক্ষেত্রে, হিন্দি দৈনিক খবরের কাগজ বাজারে আধিপত্য বিস্তার করে, যার দিনে দেড় কোটি প্রচার রয়েছে, তারপরেই জায়গা করে নিয়েছে ইংরেজি সংবাদপত্রগুলি। আঞ্চলিক ভাষাগুলির মধ্যে প্রচার সংখ্যার ভিত্তিতে প্রথমে আসে মারাঠি সংবাদপত্রগুলি, তারপরে মালায়ালাম, তামিল, তেলেগু, বাংলা, কন্নড়, গুরুমুখী এবং উড়িয়া। ইন্ডিয়ান রিডারশিপ সার্ভের তথ্য অনুযায়ী সংবাদপত্রগুলির সামগ্রিক পাঠক সংখ্যা ২০১৭ সালে ৪০.৭ কোটি পাঠক থেকে ২০১৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৪২.৫ কোটি পাঠক সংখ্যায় দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে প্রায় সমস্ত আঞ্চলিক ভাষার সংবাদপত্রেরই অনলাইন সংস্করণ রয়েছে। বিশ্বায়নের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংবাদপত্রে ছবির ব্যবহার, সাপ্লিমেন্ট এর পরিমান ও পেজ-থ্রি সাংবাদিকতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞাপনের জন্য সংরক্ষিত জায়গাও ক্রমশ বেড়েছে আরো বেশি মুনাফার দিকে লক্ষ্য রেখে।

৩.৩.৬ টেলিভিশনের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব

অর্থনৈতিক উদারিকরণের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের সূচনা হয়। এর ফলেই কেবল টেলিভিশন সরকারী টেলিভিশনের সাথে এবং হলিউডের চলচ্চিত্রগুলির সাথে স্থানীয় হিন্দি চলচ্চিত্রগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে যায়। ১৯৯১ অবধি, ভারতীয় টেলিভিশন এবং ফিল্ম বিশ্বের অন্যতম সংরক্ষিত মিডিয়া মার্কেট গঠন করেছিল। রাষ্ট্র পরিচালিত দূরদর্শন ছাড়া

আর কোনো বিকল্প ছিল না আর আন্তর্জাতিক চুক্তির সীমাবদ্ধতা কার্যকরভাবে বিদেশী চলচ্চিত্রের প্রাপ্যতাকে কমিয়ে এনেছিল। উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণ পুরোপুরিভাবে ভারতীয় টেলিভিশনকে রূপান্তরিত করে দিয়েছিল। উন্মুক্ত ভারতীয় বাজারে দর্শকদের কাছে পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ বিজ্ঞাপনদাতাদের আর্থিক বিনিয়োগের উপর ভর করে একটিমাত্র সরকার পোষিত চ্যানেল থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যেই ৭০টি টেলিভিশন চ্যানেলে পৌঁছে যায়। ১৯৯১ সালের অক্টোবরে, রুপার্ট মারডকের নিউজ কর্পরেশনের অংশ হিসাবে হংকং ভিত্তিক স্টার টিভি, ভারতে এমটিভি, বিবিসি, প্রাইম স্পোর্টস এবং স্টার প্লাস (ইংরেজিতে একটি বিনোদন প্রোগ্রামের চ্যানেল)-এর একটি প্যাকেজ চালু করেছিল। বিশেষ করে প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ বিষয়ে আগ্রহ এবং ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘটনাপ্রবাহে আগ্রহী হয়ে, কেবল টেলিভিশনের প্রতি আগ্রহ ইংরেজী ভাষায় সাবলীল এলিটদের মধ্যে দ্রুত প্রসারিত হয়েছিল।

ছবি সৌজন্যে: factly.in

১৯৯২ সালের অক্টোবর মাসে, জি টিভি হিন্দি-ভাষায় প্রোগ্রামিং আরও বাড়ানোর জন্য একটি কেবল টেলিভিশন প্যাকেজ চালু করেছিল, যা বিদেশী চ্যানেলগুলির সংকীর্ণ সীমার বাইরে কেবলটিভি দেখাকে প্রসারিত করে। অল্প সময়ের মধ্যেই কেবলটিভির সম্প্রসারণ অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। ১৯৯১ সালে, এটি তিন লক্ষ্য বাড়িতে পৌঁছতো; ১৯৯৪ সালে এটি ১.২ কোটি বাড়িতে পৌঁছেছে; ১৯৯৯ সালে, এটি ২.৪ কোটি বাড়িতে পৌঁছেছিল। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সালে ৯০২ টি বেসরকারি স্যাটেলাইটে চ্যানেলের অনুমতি দেওয়া আছে ভারতে আর ১৫ কোটি বাড়িতে কেবল ও স্যাটেলাইটে টিভির সংযোগও আছে। ২০১৯ সালের ফিকি রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে তিন ভাগের দুইভাগ বাড়িতেই টিভি আছে। উদারীকরণের নিয়ম মেনে 'বাজারের উপর অধিক গুরুত্ব' এবং 'রাষ্ট্রের সীমিত হস্তক্ষেপ' নীতি ব্যবহার করে অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও গণমাধ্যমকে আমূল রূপান্তরিত করা হয়েছিল, যা বিশ্বায়নের সহায়ক । সবেমাত্র উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া বিশাল বাজারটি ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশন এবং ব্রডকাস্টারদের কাছে আকর্ষণীয় ছিল কেননা ভারতের সম্প্রসারণশীল কেবল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তারা ভারতের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি, ক্রমবর্ধমান ভোক্তা শ্রেণী ও বিদেশী দ্রব্যের জন্য উন্মুক্ত পণ্য-বাজারের অংশীদার হতে পারবে। ১৯৯৯ সালের মধ্যে এ দেশে বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যয় ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছায়, যা বিশ্বের ২০টি শীর্ষ দেশের মধ্যে চলে আসে। তবে, দূরদর্শন কিন্তু উদারীকরণের পরে বাজারের প্রতিযোগিতার তীব্রতা বুঝতে যথেষ্ট দেরি করেছিল। যদিও দূরদর্শন এখনও সর্বাধিক মানুষের বাড়িতে পৌঁছয় এবং ধনী ও গরিব উভয়ের কাছেই এটা সহজলভ্য।

অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন যেমন একদিকে ভারতের মিডিয়া পরিসরকে রূপান্তরিত করেছে, অপরদিকে স্থানীয় স্বার্থ, সংবেদনশীলতা এবং প্রতিরোধ এই রূপান্তরকে মধ্যস্থতা করেছে। বিশ্বায়নের একেবারে গোড়া থেকেই, ছোট আকারের কেবল অপারেটররা, মধ্যমানের প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করে বুঝতে পেরেছিলেন যে কেবলমাত্র ২০০টি বাড়িতে

কেবলটিভির সংযোগ দিয়েই তারা অনেকটা লাভ করতে পারেন। স্থানীয় চাহিদা মেটাতে, অল্প দিনের মধ্যেই হাজার হাজার ছোট-বড় কেবল অপারেটর এই ব্যবসা বেছে নিয়েছিল। প্রথম দিকে স্টার টিভির ইংরাজী-ভাষায় অনুষ্ঠান ভারতীয় দর্শককে ততটা টানতে না পারলেও, যখন জি টিভি ১৯৯২ সালের অক্টোবরে হিন্দিতে সম্প্রচার শুরু করে তখন থেকেই কেবল টিভির সম্প্রচার বৃদ্ধি পায়। বিদেশী অনুষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও জনপ্রিয় ভারতীয় চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্রের গান সমন্বিত প্রোগ্রামিংই কেবল টেলিভিশনের বৃহত্তম সাফল্য হিসাবে জায়গা করে নিয়েছিল। বিশ্বায়নের রীতি মেনে, স্যাটেলাইট টেলিভিশন এবং হলিউডের ছবিগুলির দৃশ্য, স্টাইল, এবং থিমগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই স্থানীয় চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন প্রোডাকশনকে রূপান্তরিত করেছে। স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলিতে প্রদর্শিত ভারতীয় সিরিয়ালগুলি আমেরিকান সোপ অপেরার বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনা পদ্ধতির দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত ছিল।

৩.৩.৭ চলচ্চিত্র শিল্পের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব

যদিও হলিউড ছবির বৃদ্ধি কেবল টিভির মতো অভূতপূর্ব ছিল না, কিন্তু ১৯৯০ এর দশকে ভারতের বাজারে বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়া হলিউডের ছবিগুলি ভারতের মিডিয়া ল্যান্ডস্কেপকে রূপান্তরিত করতে ভূমিকা নিয়েছে। ভারত বিশ্বের অন্যতম বড় বাজার হয়ে ওঠার কারণেই হলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর নিষেধাজ্ঞাগুলি হলিউডের ফিল্মগুলির ভারতীয় বাজারে প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা দীর্ঘকাল ধরে সীমাবদ্ধ রেখেছিলো। অপরদিকে সাধারণ দর্শকদেরও বিদেশী চলচ্চিত্রগুলির প্রতি উৎসাহের অভাব ছিল, কেননা যার মধ্যে গান এবং একশনের মতো জনপ্রিয় উপাদানগুলির অভাব ছিল। তবে, অর্থনৈতিক উদারিকরণের সাথে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নিষেধাজ্ঞাগুলি হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে ১৯৯১ সালেই মুম্বাই এবং অন্যান্য মহানগরে বেশ কিছু হলিউড ছবি বেশ জনপ্রিয়তা পায়। নব্বুই দশকের মাঝামাঝি সময়ে থেকেই হলিউডের ছবিগুলি হিন্দিতে ডাবিং করা শুরু হয়ে গিয়েছিলো এবং জুরাসিক পার্কের ডাব সংস্করণটি ভারতীয় শহরগুলিতে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিল। ১৯৯৫ সালে, টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স-এর মত ডিস্ট্রিবিউটররা আশাবাদী ছিল যে হলিউডের ছবিগুলির জনপ্রিয়তা ক্রমশ আরো বাড়বে এবং বিদেশী চলচ্চিত্রগুলি ভারতীয় শহরগুলিতে আরও ব্যাপকভাবে প্রদর্শিত হয়। তবে হিন্দি চলচ্চিত্রগুলি নিজেকে বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে ক্রমশ পরিবর্তন করে, ক্রমবর্ধমান শহুরে পাশ্চাত্য জীবনযাত্রা এবং ভোক্তাবাদকে সামনে রেখে হলিউডের বাজার দখলের চেষ্টাকে আটকে দিতে পেরেছিলো।

ছবি সৌজন্যে : softpowermag.com

রাষ্ট্রের নীতিগত উদ্যোগের সাথে মিডিয়া পরিসরের পরিবর্তনগুলি আরও একটি রূপান্তরকে ইন্ধন জুগিয়েছে যা নাটকীয়ভাবে চলচ্চিত্র শিল্পকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ১৯৯৯ সালে যখন সরকার চলচ্চিত্রকে "শিল্পের মর্যাদা" প্রদান করে তখন চলচ্চিত্র শিল্পও অন্যান্য শিল্পের মতো পরিকাঠামোগত ও আর্থিক সহায়তা পাবার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে ওঠে। পাশাপাশি, সিনেমাটোগ্রাফিক ফিল্মের কাস্টম শুল্ক হ্রাস, রফতানির লাভের উপর সম্পূর্ণ ছাড় ইত্যাদি সুবিধাও দেওয়া হয়। নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে, 'চলচ্চিত্রের কর্পোরেটাইজেশন' শব্দটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। নীতি-পরিবর্তনের মাধ্যমে শিল্প ক্ষেত্রে উদারিকরণ করার সাথে সাথে বিশেষত মুম্বাই, দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর, কলকাতা, হায়দরাবাদ এবং চেন্নাইয়ের শহরগুলিতে একক পর্দার সিনেমাহলগুলি প্রতিস্থাপন করে মাল্টিপ্লেক্সগুলি ব্যাবসা শুরু করে দেয়। ওয়েবসাইট-এর মাধ্যমে প্রচার চলচ্চিত্র এবং ফিল্ম ষ্টুডিওগুলির জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিপণনের পরিসর হয়ে উঠেছিল; জনপ্রিয় ফিল্মের গানগুলি সেল ফোন রিংটোন হিসাবে ডাউনলোড করার মতো মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি নেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিলো। টেলিভিশন এবং রেডিওতে আগ্রাসী বিজ্ঞাপন দেওয়া আরম্ভ হয়েছিল; টিকিটের মূল্য দ্রুততার সাথে বেড়েছে; এবং তারকারা সংবাদমাধ্যম সাক্ষাৎকার, এবং প্রচারের জন্য নিজেকে আরও বেশি করে তুলে ধরেছিলেন। বিশ্বায়নের পটভূমিতে প্রিন্ট, ফ্লাইয়ার, মোবাইল ফোন, মিউজিক ভিডিও, স্ট্রিমিং সাইটস, সিডি আকারে হাজার হাজার মিডিয়া অবজেক্টগুলি বলিউডকে কেন্দ্র করে একটা "উন্মাদনা" তৈরি শুরু করেছিলো, যা এখনও চলেছে। জনপ্রিয় ছবিগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে গ্লোবাল এবং লোকাল মিলিয়ে একটা হাইব্রিড সম্পর্কের উপস্থাপনার মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতির সাথে ভারতের পরিবর্তিত সম্পর্ককে চিত্রিত করতে শুরু করে। নব্বইয়ের দশকের অর্থনৈতিক উদারিকরণের পর থেকে প্রবাসী ভারতীয়রা মুম্বাই চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য বাজারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের প্রতিনিধিত্ব করে এসেছেন। উন্নত দেশে বসবাসরত ভারতের অভিজাত এবং ধনী ভারতীয়দের বাজারকেন্দ্রিক ভোগবাদী জীবনযাত্রা ছবিতে প্রায়শই চিত্রিত হয়েছে। দর্শকদের এই বিশ্বায়িত বাসনাগুলি ভারতীয়করণ ও স্থানীয়করণের মাধ্যমে জনপ্রিয় চলচ্চিত্রগুলিতে প্রদর্শিত হয়েছে।

৩.৩.৮ এফডিআই ও ভারতীয় গণমাধ্যম

বিশ্বায়নের একটি অন্যতম উপকরণ হল বিদেশী অর্থের বিনিয়োগ। ১৯৫৫ সালের মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে প্রিন্ট মিডিয়াতে বিদেশী বিনিয়োগের অনুমতি গৃহীত হয়নি। তবে সেই সময় বেশিরভাগ প্রকাশক তাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে বিদেশী মূলধনের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেননি কারণে তাদের অন্যান্য ব্যবসাগুলি থেকে সংবাদপত্র চালানোর মতো উদ্বৃত্ত আয় তখন ছিল। তবে নব্বুই-এর দশকের গোড়ার দিকে যখন বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে তখন বৈদেশিক মূলধনকে মঞ্জুরি দেওয়ার আবেদন পুনরায় শুরু হয়। ১৯৯৩ সালে, যখন এবিপি ফিনান্সিয়াল টাইমসের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের পরিকল্পনা করে সরকারকে একটি প্রস্তাব দেয় তখন থেকেই প্রিন্টে বৈদেশিক অর্থের অনুমতি দেওয়ার বিতর্কটি আবার শুরু হয়েছিল। অবশেষে অনেক প্রকাশকের চাপের মধ্যে দিয়ে সরকার ২০০২ সালের জুন মাসে ২৬ শতাংশ এফডিআই বিনিয়োগ করার অনুমতি দেয়। তবে যেহেতু এইসময় অনেকগুলি বিদেশী বিনিয়োগের উপর অনেক রকম বিধিনিষেধ ছিল, সেই জন্যই খুব বেশি বিনিয়োগকারীরা আগ্রহী হননি। তবে এই নিয়মকানুন ২০০৫ সালে অনেক শিথিল হয়ে যাবার পর ভারতীয় গণমাধ্যমে বিদেশী বিনিয়োগের দ্বার খুলে যায়।

ছবি সৌজন্যে: factly.in

অনেকগুলি ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্টভাবে, ১০০ শতাংশ অবধি বিদেশী বিনিয়োগের অনুমতি রয়েছে, যেমন চলচ্চিত্র শিল্পে; আবার রেডিওতে ২০ শতাংশ অবধি, সংবাদপত্র ও পত্রিকার ক্ষেত্রে ২৬ শতাংশ অবধি অনুমতি রয়েছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র প্রকাশের জার্নাল বা বিশেষ কোনো বিষয় নির্ভর পত্রিকার ক্ষেত্রে ৭৪ শতাংশ অবধি বিদেশী বিনিয়োগের অনুমতি মিলবে। সরকার প্রিন্ট মিডিয়ায় এফডিআই সীমা ২৬% থেকে বাড়িয়ে ৪৯% করার প্রস্তাব অনেকদিন ধরেই বিবেচনা করে আসছেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রনালয়ের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি এই পদক্ষেপের সুপারিশ করেছে। কমিটি এই বিষয়ে নীতিগত উদ্যোগের জন্য সরকারকে একটি রোডম্যাপ দেওয়ার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সরকারের নিজস্ব অনুমান অনুসারে, দেশে ৭৮০০০ এরও বেশি নিবন্ধিত সংবাদপত্র রয়েছে, যার বেশিরভাগই স্থানীয় ভাষায় প্রকাশিত, স্বল্প প্রচারের স্থানীয় সংবাদপত্র। কিছু মিডিয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রিন্ট মিডিয়ায় আরও এফডিআই যদি চালু হয় তবে এই ছোট, স্থানীয় খবরের কাগজগুলিকে নিরুৎসাহিত করবে। এমনকি ছোট সংবাদপত্রগুলো সংযুক্তি এবং অধিগ্রহণের শিকার হয়ে নিজস্বতা ও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার হারাতে পারে এবং কর্পোরেট স্বার্থ দ্বারা বিদেশী মিডিয়ার পক্ষে চালিতও হতে পারে।

বর্তমানে সরকার ব্রডকাস্ট পরিষেবাগুলিতে এফডিআই সিলিং ৪৯ শতাংশ থেকে ৭৪ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এটি ভারতের কেবল টিভি সেক্টরকে উৎসাহিত করবে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে টিভি সম্প্রচারের বিতরণকে পুরোপুরি ডিজিটালাইজ করার সাথে সাথে, এফডিআই সিলিং বাড়ানো কেবলমাত্র মিডিয়া এবং বিনোদন সেক্টরের বিস্তৃতিই বাড়াবে না বরং এই প্রক্রিয়া, অর্থনীতিকেও চাঙ্গা করতে পারে। গণমাধ্যমে এফডিআই সিলিং বৃদ্ধি করা কেবল অপারেটরদের জন্যও কিছুটা স্বস্তির, কারণ তাদের আরও সুসংহত ও শক্তিশালী করার সুযোগ আসবে আরও বিনিয়োগের সাথে সাথেই। ভারতে নিজস্ব ডিজিটাল পরিকাঠামো এবং নতুন প্রযুক্তির ভিত্তি তৈরি করতে বিদেশী বিনিয়োগ যে যথেষ্ট প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৩.৩.৯ সারাংশ

বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের পরে গণমাধ্যম ভারতে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে, কিন্তু এখনও মূলত ভারতীয় ভাষায় প্রচারটি অনুষ্ঠানই সিংহভাগ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আবার হলিউডের ফিল্মগুলির উপস্থিতি ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে, তবে তারা এখনও বাজারের ১০ শতাংশেরও কম জায়গা পেয়েছে ও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যারা বিদেশী চলচ্চিত্র দেখেন তারা ভারতীয় চলচ্চিত্রও দেখেন। প্রিন্ট মিডিয়া বিদেশে জনপ্রিয়তা হারালেও ভারতে যথেষ্ট উন্নতি করেছে। অর্থাৎ বিশ্বায়নের প্রভাব সম্পর্কে বোঝার জন্য আমাদের অবশ্যই বিশ্বব্যাপী প্রভাবগুলির মধ্যের পার্থক্য

এবং স্থানীয় মিডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান সম্পর্কে বিবেচনা করতে হবে। সামগ্রিকভাবে, বিশ্বায়নের মধ্যে থেকে গণমাধ্যমগুলিকে যেভাবে সাধারণ মানুষ তাদের ব্যাক্তিগত অবস্থান থেকে বোঝেন এবং অনুভব করেন সেগুলি পরস্পরবিরোধী হতে পারে। বিশ্বায়নকে অঞ্চলের ভিত্তিতে, নেটওয়ার্ক, প্রবাহ, বা এক ধরণের ''তরলতা'' বা জাল-এর মডেলের নিরিখে আলোচনা করা প্রয়োজন। কেবলমাত্র পাশ্চাত্যের প্রভাব বা আমেরিকার প্রভাব হিসাবে বিশ্বায়নকে বুঝতে চাইলে কিন্তু বোঝার মধ্যে গলদ থেকে যাবে।

৩.৩.১০ অনুশীলনী ঃ

১) বিশ্বায়ন বলতে কি বোঝো? গণমাধ্যম কিভাবে বিশ্বায়নের সহায়ক হিসাবে বিবেচিত হয়?

২) মিডিয়া বিশ্বায়নের বৈশিষ্টগুলি কি কি ?

৩) ভারতে উদারীকরণের সাথে বিশ্বায়ন কিভাবে জড়িত?

৪) বিশ্বায়নের ফলে ভারতের প্রিন্ট মিডিয়াতে কি কি পরিবর্তনে এসেছে?

৫) ভারতে সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের সূচনা কেবল টিভির মাধ্যমেই হয়েছে- তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৬) হিন্দি বানিজ্যিক চলচ্চিত্রে বিশ্বায়নের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করো।

৭) তুমি কি মনে কর যে এফডিআই ভারতীয় গনমাধ্যমে প্রয়োজনীয়? - যুক্তিসহ আলোচনা করো।

৮) টিকা লেখো: (ক) চলচ্চিত্রের কর্পোরেটাইজেশন (খ) সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন (গ) গ্লোবাল ভিলেজ

৩.৩.১১ গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১) *মিডিয়া সংস্কৃতি*, দীপঙ্কর সিনহা, কলকাতাঃ দেজ পাবলিশার্স, ২০১৪।

২) *মিডিয়া পলিসি এন্ড গ্লোবালাইজেশন*, পলা চক্রবর্তী, এডিনবরা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৬।

৩) *গ্লোবালাইজেশন ও দি গ্রাউন্ড*, স্টিভ ডার্নে, নিউ দিল্লি: সেজ, ২০০৮।

একক : ৪ □ ভারতে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন শিক্ষার বিকাশ

৩.৪.০ গঠন

৩.৪.১ উদ্দেশ্য

৩.৪.২ প্রস্তাবনা

৩.৪.৩ ভারতে সাংবাদিকতা এবং গণজ্ঞাপন শিক্ষার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

৩.৪.৪ গণমাধ্যম-শিল্প ও শিক্ষায়তনিক সম্পর্ক

৩.৪.৫ সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের পরিসরে কর্মসংস্থান

৩.৪.৬ ভারতে সাংবাদিকতার পাঠ্যক্রমগুলির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা

৩.৪.৭ সারাংশ

৩.৪.৮ অনুশীলনী

৩.৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৩.৪.১ উদ্দেশ্য ঃ

এই এককে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন শিক্ষার বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। ভারতবর্ষের পটভূমিতে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন শিক্ষা খুবই সীমিত পরিসর থেকে বর্তমানে শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে উঠেছে। সাংবাদিকতা শিক্ষার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত আলোচনার মাধ্যমে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের পট পরিবর্তনের কারণগুলির উপরও আলোকপাত করা হবে। একই সাথে এই পাঠ্যক্রমগুলিকে যে ধরণের সমস্যা ও জটিলতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তাও এই এককে আলোচিত হবে।

৩.৪.২ প্রস্তাবনা

সাংবাদিকতা শিক্ষা পেশাদারি শিক্ষা হিসাবে স্বীকৃত। সাধারণত বিষয়টি বিভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয়ে থাকে, যেমন, সাংবাদিকতা, গণজ্ঞাপন, গণযোগাযোগ, জনসংযোগ, মিডিয়া সায়েন্স এবং মিডিয়া স্টাডিজ। এই নামকরণ অনেক সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গণজ্ঞাপনের কোন দিকটির উপর বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছেন তার উপর নির্ভর করেও দেওয়া হয়ে থাকে। এই কোর্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ''ল শিক্ষার্থীরা এই পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। সাংবাদিকতার কোর্স পড়ানো হয় এমন মোট ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের অর্ধেকেরও বেশি কেবল এক বছরের ডিপ্লোমা দিয়ে থাকে এবং প্রায় এক-পঞ্চমাংশ বিভিন্ন কোর্সের শিরোনামের অধীনে স্নাতক ডিগ্রি প্রদান করে থাকে। অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরাল ডিগ্রির জন্য গবেষণারও সুযোগও ইদানিং খুলে দিয়েছে।

ছবি সৌজন্যে-massmediacareer.com

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের সাংবাদিকতার পাঠ্যক্রম পড়ানো হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে সম্প্রচার জ্ঞাপন, গ্রামীণ সাংবাদিকতা, কৃষি সাংবাদিকতা, ডিজিটাল মিডিয়া, মোবাইল সাংবাদিকতা, বিজ্ঞান সাংবাদিকতার মতো বেশ কিছু নতুন ধরণের বিষয় কোর্সের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মোবাইল ফোনের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোবাইল ফোনের ব্যাবহারের ব্যাপকতার ফলস্বরূপ স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মোবাইল সাংবাদিকতার মতো পাঠ্যক্রম চালু হয়েছে। আবার শিল্প, ব্যবস্থাপনা, অর্থনীতি, শেয়ার বাজার এবং মিডিয়াগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক বিবেচনা করে সাংবাদিকতার আরেকটি ধারা, অর্থাৎ ব্যবসায়িক সাংবাদিকতাও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এইরকম, নানান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সাংবাদিকতার পাঠ্যক্রমেরও পরিবর্তন এসেছে।

বর্তমানে, বিভিন্ন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে (কয়েকটি বেসরকারী ও ডিমড বিশ্ববিদ্যালয় সহ) প্রায় তিনশোটি সাংবাদিকতা এবং গণযোগাযোগ বিভাগ সাম্মানিক স্নাতক, স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, এমফিল, ডক্টরাল এবং স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম চালনায় নিযুক্ত রয়েছে। এছাড়াও অর্ধ-সহস্রাধিক প্রতিষ্ঠান সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগের বিভিন্ন শাখায় ডিপ্লোমা এবং শংসাপত্র দিচ্ছে। গত এক দশকের আরও একটি বৈশিষ্ট হ''ল বিভিন্ন বেসরকারী ও সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, স্নাতক স্তরের কলেজগুলিতেও সাংবাদিকতা এবং গণযোগাযোগ পাঠ্যক্রম চালু হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সেলফ-ফাইন্যান্সড কিংবা বৃত্তিমূলক কোর্সও পড়ানো হচ্ছে। এগুলি সমস্তই সাংবাদিকতার তাত্ত্বিক ভিত্তির সাথে হাতে-কলমে দক্ষতার দিকগুলিকেও গুরুত্ব দিয়েছে। বর্তমানে প্রিন্ট, বৈদ্যুতিন জনসংযোগ, বিজ্ঞাপন, ফিল্ম, মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট, মিডিয়া আইন এবং নীতিশাস্ত্র ইত্যাদিতে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বা স্পেশালাইজড হিসাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী প্রত্যেক বছর পাস করছে।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে দ্রুত বিকাশের জন্য সাংবাদিকতা এবং গণযোগাযোগ শিক্ষার গুরুত্ব এবং সাংবাদিকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিকতার পাঠ্যক্রম সামাজিক বিকাশকে অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যকেও নির্দিষ্ট করেছে। সাংবাদিকতা এবং গণযোগাযোগ শিক্ষা পেশাদারিত্বের বোধ দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে, মূলত চারটি প্রধান কারণে: এগুলি হলো:

(ক) কর্মজীবী সাংবাদিকরা ক্রমশ আরও সংগঠিত হয়েছেন;

(খ) সাংবাদিকতায় স্পেশালাইজড শিক্ষার গুরুত্বা বেড়েছে;

(গ) গণযোগাযোগের ও সাংবাদিকতার ইতিহাস, সমস্যা এবং কৌশলগুলি বিষয়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সহজ-লভ্যতা, এবং

(ঘ) সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্রমবর্ধমান অনুভূতি। যে কারণে আদর্শবাদী উদ্দেশ্যগুলি আধুনিক ভারতীয় সাংবাদিকতার বিকাশেও অনেক অবদান রেখেছে।

৩.৪.৩ ভারতে সাংবাদিকতা এবং গণজ্ঞাপন শিক্ষার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ভারতে, সাংবাদিকতার শিক্ষার সূচনা হয় ১৯৪১ সালে লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে (বর্তমানে পাকিস্তানে) প্রয়াত অধ্যাপক পি.পি. সিং-এর পৃষ্ঠপোষকতায়। সান্ধ্যকালীন পার্ট-টাইম এক বছরের সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা কোর্স হিসাবে কিছুটা অনিশ্চয়তার মধ্যেই লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমটি চালু হয়েছিল। তবে লাহোরের সাংবাদিকতা বিভাগটি সাত বছর পর ১৯৪৮ সালে নয়াদিল্লিতে চলে আসে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরে এই সাংবাদিকতা বিভাগটি দিল্লিতে পনেরো বছর ধরে চালু ছিল। পরে এটি ১৯৬২ সালে চন্ডীগড়ের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৪৭ সালে থেকে শুরু করে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত মাদ্রাস, কলকাতা, মহীশুর, নাগপুর এবং ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সাংবাদিকতায় আরও পাঁচটি একাডেমিক প্রোগ্রাম শুরু হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপনকে তার পাঠ্যক্রমের বিষয় হিসাবে অন্তর্গত করে। এর ঠিক পরেই ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (অন্ধ্র প্রদেশ) এবং নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় (মহারাষ্ট্র)-এ সাংবাদিকতার পাঠক্রম শুরু হয়। ১৯৫০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয় সাংবাদিকতার পাঠক্রম।

সাংবাদিকতা শিক্ষার একেবারে প্রথমদিকে বেশ কয়েকজন ভারতীয় শিক্ষার্থী যারা সাংবাদিকতায় উচ্চতর পড়াশুনার জন্য বিদেশে গিয়েছিলেন, তাঁরা দেশে ফিরে এসে পাঠ্যক্রম পুনর্বিবেচনার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ১৯৬৪ সাল থেকে শুরু করে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ২৩টি বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপনকে তাদের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে। এর মধ্যে রয়েছে - পুনা বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বেরহামপুর বিশ্ববিদ্যালয়, মাদুরাই কামরাজ বিশ্ববিদ্যালয়, গাড়ওয়াল বিশ্ববিদ্যালয়, রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়, মহর্ষি দয়ানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, সাগর বিশ্ববিদ্যালয়, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্দোর বিশ্ববিদ্যালয়। একই ভাবে ১৯৮৫ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত আরও অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় যেমন মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, মঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়, কুভেম্পু বিশ্ববিদ্যালয়, তিরুপতি বিশ্ববিদ্যালয়, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সিমলা বিশ্ববিদ্যালয়, অন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, হিমাচল প্রদেশ বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়, মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়, গোয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, আন্না বিশ্ববিদ্যালয়, জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি আঞ্চলিক মিডিয়া, সরকারী ও বেসরকারী প্রাতিষ্ঠানের প্রয়োজনের সাথে মিল রেখে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ডিগ্রি কার্যক্রম শুরু করে।

ছবি সৌজন্যে-Google

ভারত সরকার ১৯৬৫ সালে নয়াদিল্লিতে ভারতীয় জনসঞ্চার সংস্থান বা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মাস কমিউনিকেশন প্রতিষ্ঠা করেন মূলত জাতীয় উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়নের কাজে সাহায্য করার জন্য। ১৯৬৫ সালে ইউনেস্কোর সহায়তায় নয়াদিল্লিতে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যাস কমিউনিকেশন (আইআইএমসি) প্রতিষ্ঠা দেশে মিডিয়া এবং যোগাযোগ শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদানকে চিহ্নিত করেছে। ইনস্টিটিউটটি বর্তমানে একাধিক স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম, উন্নয়ন সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা, ও একাধিক শর্ট-টার্ম কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এগুলি ছাড়াও সরকারী মিডিয়া কর্মীদের সুবিধার জন্য সময়ে সময়ে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম এবং রিফ্রেশার্স কোর্সগুলিও আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক ও অন্যান্য মিডিয়া পেশাদারদের প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়ার জন্য ১৯৬৩ সালে প্রেস ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি নিয়মিতভাবে সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং কনফারেন্স আয়োজন করে। ভোপালের মাখনলাল চতুর্বেদী রাষ্ট্রীয় পত্রকারিতা এবং সঞ্চার বিশ্ববিদ্যালয়, প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা, কবি ও সাংবাদিক মাখনলাল চতুর্বেদীর নামানুসারে, ১৯৯০ সালে মধ্যপ্রদেশের আইনসভার নির্দেশ অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি সাংবাদিকতার জন্য এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে বিবেচিত হয়। মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট, গ্রাফিক্স, বিনোদন যোগাযোগ এবং বিজ্ঞাপন ও এম.বি.এ প্রোগ্রাম সহ পঁচিশটি মিডিয়া বিষয়ক একাডেমিক প্রোগ্রাম প্রদান করে এমন সাংবাদিকতার ও জ্ঞাপনের আটটি বিভাগ রয়েছে।

এর পাশাপাশি, বিপুল সংখ্যক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সারাদেশে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় একাধিক কোর্স চালিয়ে থাকে। তাদের মধ্যে অন্যতম হলো, ভারতীয় বিদ্যা ভবন, সেন্ট জেভিয়ার্স ইনস্টিটিউট অফ কমিউনিকেশন (মুম্বাই), সিম্বিওসিস ইনস্টিটিউট অফ ম্যাস কমিউনিকেশন (পুনে), এশিয়ান কলেজ অফ জার্নালিজম (চেন্নাই), মণিপাল ইনস্টিটিউট অফ কমিউনিকেশন (মণিপাল) এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ জার্নালিজম অ্যান্ড নিউ মিডিয়া (ব্যাঙ্গালুরু)। ভারতে বর্তমানে প্রায় কয়েকশো বিশ্ববিদ্যালয়, কুড়িটির বেশি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কয়েকশো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতার বিভিন্ন দিক থেকে প্রতিবেদন, সম্পাদনা, ফটোগ্রাফি, ভিডিওগ্রাফি, মুদ্রণ, ডিজাইনিং, বিজ্ঞাপন, জনসংযোগ এবং অন্যান্য বিষয়ে বার্ষিক কয়েক হাজার শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কৃষি যোগাযোগ, সম্প্রসারণ শিক্ষা এবং উন্নয়ন যোগাযোগের উপর গুরুত্ব দিয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ তাদের পরিকাঠামো প্রশিক্ষণের সাথে তাল মিলিয়ে আরও উন্নত করেছে।

ভারতে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন শিক্ষার আট দশক পার হয়েছে, এই সময়কালে, সাংবাদিকতা শিক্ষা সরবরাহকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, গুণমান এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে। শিক্ষাব্যবস্থায় পেশাদারি প্রশিক্ষণ থেকে তাত্ত্বিক আলোচনা ও গবেষণা, পশ্চিমি ধাঁচে শিক্ষা থেকে ক্রমশ ভারতীয় বিষয়, বৈশিষ্ট ও প্রবণতা সম্পর্কে ঝোঁক, সাংবাদিকতা এবং গণযোগাযোগ শিক্ষাকে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেছে। প্রাথমিক ভাবে খুব কম লোকই ভাবতে পেরেছিলেন যে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন বা তাদের আদৌ প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। এমনকি গণমাধ্যমের মালিকরাও বিশ্বাস করতেন যে "গণযোগাযোগকারীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরী করা যায় না"। তারাও এই ভুল ধারণার কারণে প্রথমদিকে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণকে আন্তরিকভাবে উৎসাহিত করেনি।

৩.৪.৪ গণমাধ্যম-শিল্প ও শিক্ষায়তনিক সম্পর্ক

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের কার্যক্রমগুলি নিম্নলিখিত কাঠামোর মধ্যে বিভক্ত করা যেতে পারে:

১. বিশ্ববিদ্যালয়, তাদের অনুমোদিত কলেজ এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান: ক্রমশ এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ছে। এর মধ্যে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়ার খরচ অনেকসময় বেশি হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার খরচের থেকে।

২. মিডিয়া-সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান: সাম্প্রতিক সময়ে টাইমস স্কুল অফ জার্নালিজম থেকে শুরু করে এশিয়ান কলেজ অফ জার্নালিজম (দ্য হিন্দু), মনোরমা স্কুল অফ কমিউনিকেশন (মালায়ালাম মনোরাম), ইনাডু গ্রুপ, থান্টি গ্রুপ ইত্যাদি। এমনকি টেলিভিশন নিউজ চ্যানেলগুলিও তাদের নিজস্ব কোর্স চালু করছে এবং তাদের কয়েকজন সুপরিচিত অ্যাঙ্কর এবং নিজস্ব ব্যবসায়িক আগ্রহের দ্বারা স্কুলগুলিকে শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

৩. অন্যান্য বেসরকারী উদ্যোগ যেমন পুনের সিম্বাইসিস, ক্রাইস্ট কলেজ, মনিপাল ইনস্টিটিউট এবং মুম্বইয়ের সোফায়া কলেজ এই সুপরিচিতদের মধ্যে রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষাদানের পরিকাঠামো অত্যন্ত উন্নত মানের হয়।

মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি বা গণমাধ্যম-শিল্প ও শিক্ষায়তনিক সম্পর্ককে কিভাবে আরো সুদৃঢ় করা যায় সেই বিবেচনাই সাংবাদিকতা শিক্ষার সংস্কারের পরিকল্পনাকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। যদিও গণমাধ্যম শিল্পের সাথে যুক্ত পেশাদাররা ক্লাসরুমগুলিতে মাঝে মধ্যে বিশেষ বক্তব্য রাখার জন্য আসেন কিন্তু তাঁরা সামগ্রিকভাবে ভারতে সাংবাদিকতা শিক্ষার গঠনে উল্লেখযোগ্যভাবে অংশ নেননি। তদুপরি, সমস্ত পেশাদাররাই তাদের প্রয়োগিক দক্ষতা বা অভিজ্ঞতাকে সবসময়ে ক্লাসরুমের পক্ষে উপযুগি তাত্ত্বিক কাঠামোতে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নন, যা সাংবাদিকতা, একাডেমিক বিষয় হিসাবে প্রায়শই দাবি করে। অপরদিকে, সব সাংবাদিকতার শিক্ষকদেরই যে মিডিয়ায় কাজ করার বা হাতে-কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকবে তাও আশা করা যায় না, যদিও সেসব বিষয়ে তাঁদের যথেষ্ট তাত্ত্বিক ধারণা থাকতেই পারে। এই কারণেই, ভারতে সাংবাদিকতা এবং গণযোগাযোগ শিক্ষাব্যবস্থাটি পক্ষে কোন পথ সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত হাতে কলমে শিক্ষার পথ নাকি একাডেমিক বা তাত্ত্বিক পড়াশোনার পথ তা নির্ধারণ করা সহজ হয়নি।

পি সাইনাথ (২০০১) এবং প্রসূন সোনওয়ালকর (২০০২) তাঁদের লেখায় ব্যক্ত করেছেন যে ভারতে মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি ক্রমশ বৃহৎ কর্পোরেটের মতো হয়ে উঠছে ফলে পশ্চিমি মিডিয়া''র 'মারডকাইজেশন' এর সাথে পাল্লা দিয়ে সাংবাদিকতা

এবং গণসংযোগ শিক্ষার পাঠ্যক্রমও পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও সাংবাদিকতা শিক্ষা ইন্ডাস্ট্রিকে আলিঙ্গন করার জন্য একাডেমিক দৃষ্টিকোণ ত্যাগ করার প্রচণ্ড চাপের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। বেশ কিছু মিডিয়া-শিক্ষাবিদদের মতে কেবলমাত্র সীমিত অর্থে ইন্ডাস্ট্রির চাহিদাই পূরণ করতে পারে এমন দক্ষতার উপর মনোনিবেশ করার চেয়ে শিক্ষার্থীদের ক্রমবর্ধমান সামাজিক সমস্যাগুলি বোঝার জন্য বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতার চর্চার উপর জোর দেওয়া উচিত।

৩.৪.৫ সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের পরিসরে কর্মসংস্থান

অসংখ্য প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত পাঠ্যক্রমগুলি পড়ে পাশ করার পর স্নাতক এবং ডিপ্লোমাধারীরা ঠিক কোথায় কর্মসংস্থান খুঁজে পাবে তা নিয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন থাকে। এর আগে, এটি লক্ষ করা গেছে যে মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে বিশেষত খবরের কাগজের দপ্তরে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিরও খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমস্যা হয়েছে। সাধারণভাবে, সাংবাদিকতার ছাত্রছাত্রীরা রিপোর্টিং এবং ডেস্ক-এর কাজে নিযুক্ত হন। সরকারী ক্ষেত্রে অনেকসময় জনসংযোগের কাজেও সাংবাদিকতার ছাত্রছাত্রীদের নিযুক্ত করা হয়। বেসরকারী ক্ষেত্রেও অনেক প্রতিষ্ঠান এই ধরনের চাকরি প্রদান করে সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের ছাত্র-ছাত্রীদের। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (ইউপিএসসি) মাধ্যমে অনেক ছাত্র-ছাত্রী অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং দূরদর্শনে প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ হিসাবেও নিয়োজিত হয়েছেন। অতীতে অনেক মিডিয়া সংস্থাই সাংবাদিকতা এবং গণজ্ঞাপনের ডিগ্রি / ডিপ্লোমাকে অন্যতম প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হিসাবে তালিকাভুক্ত করতে প্রস্তুত ছিল না। এখন অবশ্য, পরিস্থিতি পরিবর্তিত হচ্ছে এবং একটি ইতিবাচক প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মিডিয়াতে চাকরির জন্য বিশেষত সাংবাদিকতা এবং গণযোগাযোগের ছাত্র-ছাত্রীরাই অগ্রাধিকার পাচ্ছে। পাশাপাশি, বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেলগুলির প্রসার সংবাদ এবং বিনোদন জগতে আরও অনেক কাজের সুযোগ উন্মুক্ত করেছে। বর্তমান কর্মসংস্থানের হার এবং শিল্পের বিভিন্ন বিভাগে প্রত্যাশিত বৃদ্ধির বিষয়টি মাথায় রেখে মিডিয়া এবং বিনোদন শিল্পের জন্য ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের একটি প্রতিবেদন অনুমান করেছে যে মিডিয়া এবং বিনোদন শিল্পে মোট কর্মসংস্থান ২০২২ সালের মধ্যে প্রায় চল্লিশ লক্ষেরও বেশি হয়ে উঠবে। ২০০০ সালের ডটকম বুমের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল যে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি সাধারণত সাংবাদিকতা এবং গণজ্ঞাপনের স্নাতকদের কন্টেন্ট ডেভেলপার হিসাবে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করেছিল। এই চাহিদা মিডিয়া জগতের কয়েকটি সংস্থাকেও সেইসময় আকৃষ্ট করেছিল। এর পাশাপাশি টেকনিকাল রাইটিংয়ের ক্ষেত্রেও দক্ষতার চাহিদা এই সময় বেড়েছিল।

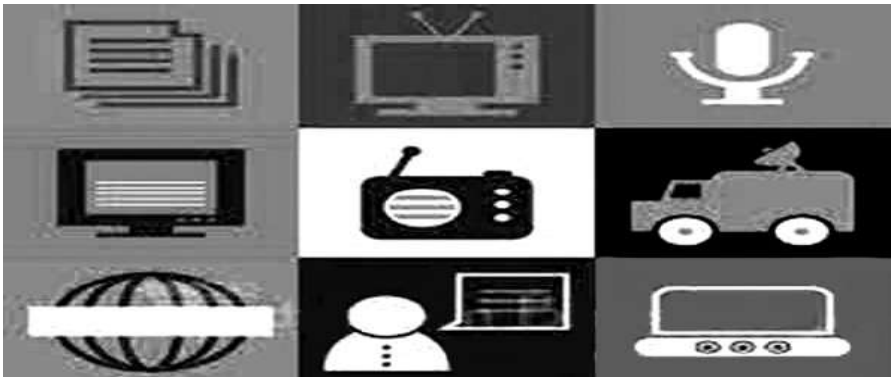

ছবি সৌজন্যে-educationbhaskar.com

বর্তমানে গণমাধ্যম শিল্পে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকলেও সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গণমাধ্যম শিল্পের সাথে সমান রকম যোগাযোগ স্থাপন করে চলতে পারে না। প্রাক্তনী সমিতিগুলি সম্ভবত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের অভিজ্ঞতা এবং সেই সময়কার কর্মক্ষেত্রের প্রবণতা সম্পর্কে জানাতে পারে, যার ফলে ইন্ডাস্ট্রি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটা সেতু নির্মাণ হতে পারে। আবার মিডিয়া পরিবেশে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য প্রশিক্ষণের বিভিন্ন বিকল্প সরবরাহ করছে। ইন্টারনেট-ভিত্তিক মিডিয়াগুলির আধিপত্য ক্রমশ সাংবাদিকতা এবং যোগাযোগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিউ মিডিয়ার উপর গুরুত্ব দিয়ে কোর্সগুলি ডিজাইন করতে উৎসাহিত করছে। এমনকি বর্তমানে গবেষণা কার্যক্রমগুলিও ডিজিটাল যোগাযোগ ও নিউ মিডিয়ার বিভিন্ন বিষয়ের উপরই বেশি করে আলোকপাত করছে।

৩.৪.৬ ভারতে সাংবাদিকতার পাঠ্যক্রমগুলির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা

এক সময় এরকম মনে করা হলেও যে সাংবাদিকতা শেখানো যায় না, বর্তমানে সাংবাদিকতা এক সময়কার আনকোরা নতুন বিষয়ের তকমা পেরিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়েছে। আরও মিডিয়া সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থাগুলি তাদের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপনের পাঠ্যক্রম নিয়ে প্রচার শুরু করেছে, আর এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির নগরকেন্দ্রিক উপস্থিতি দূরদূরান্তের শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি সাংবাদিকতা শিক্ষাকে তাদের ব্যবসা এবং উপার্জনের মডেলগুলির সাথে যুক্ত করার পাশাপাশি এটি শিক্ষার্থীদের নেটওয়ার্কিং এবং পেশাদারি যোগাযোগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানেরও সহায়তা করে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাদের সাংবাদিকতা এবং গণযোগাযোগ পাঠ্যক্রম তাদের আর্টস ও সোশ্যাল সাইন্স এর পরিধির মধ্যে চিহ্নিত করে এবং শিক্ষার্থীদের সুচিন্তিত ও বিশ্লেষণাত্মক মতামত তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়। কেননা সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপনের শিক্ষা কেবলমাত্র কিছু হাতে-কলমে কাজ করার দক্ষতার উপরই কেবল নির্ভর করে না, বরং সমাজ অর্থনীতি, রাজনীতি থেকে শুরু করে সংস্কৃতি, ক্রীড়া, পরিবেশ, বিনোদন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও উপলব্ধি অর্জনের উপরও নির্ভর করে; যার সাথে থাকতে হবে ভাষা জ্ঞান ও সৃজনশীল কিন্তু প্রাঞ্জল ভাবে লেখার ক্ষমতা।

ইউনেস্কো ২০০৭ সালে সাংবাদিকতার জন্য একটি মডেল কারিকুলাম প্রকাশ করেছিল যার উদ্দেশ্য ছিল মূলত সাংবাদিকতার দিকে মনোনিবেশ করা, জ্ঞাপনের দিকে নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পাঠ্যক্রম পরিকল্পনার জন্য প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রমটি একটি টেমপ্লেট হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (ইগনু) তার পাঠ্যক্রমগুলিতে মডেল কারিকুলামের অনেকগুলি সুপারিশকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। মডেল পাঠ্যক্রমের ভূমিকাতেই এটা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে সাধারণভাবে সাংবাদিকের মূল লক্ষ্য হলো জনসাধারণকে বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে সমাজসেবা করা। মডেল কারিকুলামে এটিও বলা হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কলেজে সাংবাদিকতার অধ্যয়নকে পেশাদার প্রশিক্ষণের বুনিয়াদ হিসাবে দেখা উচিত। ২০০০ সালের মার্চ মাসে ইউনেস্কো সমর্থিত একটি আলোচনাসভায় দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিকতাবিদরা এই মডেল কারিকুলাম নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাঁরাও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে উন্নয়নশীল দেশে সাংবাদিকতার পাঠ্যক্রমে ইউনেস্কোর সুপারিশগুলো যতটা সম্ভব অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া উচিত।

ভারতে সাংবাদিকতার পাঠ্যক্রমগুলির একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হ''ল পাঠদান এবং শেখার সাথে জড়িত সংস্থানগুলি অনেকসময়ই ভারতের নিরিখে প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনগুলি প্রতিফলিত করে না। ১৯৯০ এর দশকে সার্কভুক্ত দেশগুলির

পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার বিশ্লেষণের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল যে দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আঞ্চলিকভাবে প্রাসঙ্গিক পুস্তক, গবেষণাপত্র ও অধ্যয়নের জন্য জরুরি অন্যান্য উপাদানের যথেষ্ট অভাব আছে। তবে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উন্নত হচ্ছে, এবং আধুনিক শিক্ষাবিদদের দ্বারা রচিত এবং শীর্ষস্থানীয় প্রকাশক দ্বারা প্রকাশিত গ্রন্থে ও জার্ণালে সমকালীন উপাদানগুলি উপলব্ধ হয়ে উঠছে। যেমন, সেজ এবং অক্সফোর্ডের মতো শীর্ষস্থানীয় প্রকাশকদের বেশ কয়েকটি গ্রন্থ ও জার্নাল রয়েছে যা বিশেষত ভারতীয় গণমাধ্যমের সাথে সম্পর্কিত। তবে আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত বই ও জার্নালের অভাব এখনও ভীষণরকম ভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

একদিকে সাংবাদিকতা মূলত পেশাদারি দক্ষতার উপর জোর দেয়, অপরদিকে জ্ঞাপন প্রক্রিয়া সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ-এর উপর গুরুত্ব দেয়। অনেক গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞের মতে, এই দুটি অভিমুখ ভিন্ন হলেও একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ই দুটি অভিমুখই সমান গুরুত্ব দিয়ে পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত করার প্রচেষ্টা করার ফলে অনেকসময় শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নিয়োগকর্তাদের প্রত্যাশাগুলি সাংবাদিকতার ছাত্র-ছাত্রীরা পূরণ করতে পারে না।

৩.৪.৭ সারাংশ

যদিও ভারতীয় সাংবাদিকতা এবং গণযোগাযোগ শিক্ষা প্রায় আট দশক ধরে গড়ে উঠেছে, তবে এটি এখনও নানান পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে ক্রমশ নিজেকে পাল্টে পাল্টে নিচ্ছে। একেবারে প্রথমদিকে, সাংবাদিকতা শিক্ষা বলতে বোঝাতো কেবলমাত্র রিপোর্টিং, সম্পাদনা এবং ডিজাইনিংয়ের দক্ষতা অর্জন করা। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপনের শিক্ষা এখন অবিচ্ছিন্নভাবে প্রয়োজন-ভিত্তিক, ক্ষেত্র-ভিত্তিক, বৈজ্ঞানিকভাবে-পরীক্ষিত প্রক্রিয়ায় গতিশীল আধুনিক ভোক্তা এবং ক্লায়েন্টদের চাহিদা ও প্রবণতার প্রতিফলন। উদারীকরণের পরে, বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল এবং সম্প্রচার সংস্থাগুলির উত্থান গণযোগাযোগ শিক্ষার চাহিদা অনেকগুন বাড়িয়ে তোলে। তবে এখনও সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপনের অধ্যয়ন বেশ কয়েকটি সমস্যার দ্বারা সীমাবদ্ধ। এর মধ্যে মূল হলো, আঞ্চলিক ভাষায় বই ও গবেষণা পত্রের অভাব। মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগের অভাব, এবং পাঠ্যক্রম চলাকালীন ইন্টার্নশীপ বা কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার অভাব। দীর্ঘদিন অবহেলিত থাকার পর, ভারতে সাংবাদিকতা এবং গণযোগাযোগ কোর্সগুলি বর্তমানে শিক্ষার্থীদের মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে কর্মসংস্থানের পথ অনেকাংশে সুগম করেছে।

৩.৪.৮ অনুশীলনী:

ছোট প্রশ্ন :

১. প্রথম প্রেস কমিশন কবে গঠিত হয়েছিল?

২. প্রথম সভাপতি কে ছিলেন?

৩. দ্বিতীয় প্রেস কমিশন কবে গঠিত হয়েছিল?

৪. প্রথম প্রেস কাউন্সিলের সভাপতি কে ছিলেন?

৫. প্রেস কাউন্সিলে কি কারাদণ্ড দিতে পারে? অল্পকথায় লিখুন।

বড় প্রশ্ন :

১) আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সাংবাদিকতার পাঠ্যক্রমেরও পরিবর্তন এসেছে - ব্যাখ্যা করুণ।

২) ভারতে সাংবাদিকতা এবং গণজ্ঞাপন শিক্ষার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে আলোচনা করুণ।

৩) সারাদেশে সাংবাদিকতা এবং গণজ্ঞাপন শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির অবদান কী ব্যাখ্যা করুণ?

৪) সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের কার্যক্রমগুলি কি কি ভাগে ভাগ করা যায়?

৫) মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি ও সাংবাদিকতার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যের ব্যবধান সম্পর্কে আপনার মত কী? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করুণ।

৬) সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

৭) ভারতে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কয়েকটি সমস্যার কথা উল্লেখ করো।

৮) টীকা লেখো: (ক) আইআইএমসি (খ) ইউনেস্কোর মডেল কারিকুলাম (গ) মিডিয়া এবং বিনোদন শিল্পে কর্মসংস্থান।

৩.৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি :

১) *জার্নালিজম এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া,* সঞ্জয় পার্থসারথি ভার্থার, জার্নালিজম এন্ড মাস কমুনিকেশন এডুকেটর, সংখ্যা ৭২(৩), ২০১৭, পৃ: ২৮৫ - ২৯৬।

২) *জার্নালিজম এডুকেশন এন্ড টেক্সট বুকস ইন সার্ক কান্ট্রিস্,* কে.ই. এপ্পান, আইএএমসিআর রিপোর্ট, ১৯৯১।

৩) *মাস কমুনিকেশন ইন ইন্ডিয়া,* কেবল জে. কুমার, জাইকো পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৪।

৪) *জার্নালিজম এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া,* এস.আর.মুপ্পিড়ি, মিডিয়া এশিয়া, সংখ্যা ৩৫(২), পৃ: ৬৭-৮৩।

৫) *জার্নালিজম এন্ড মাস কমুনিকেশন এডুকেশন: এন অ্যাসেসমেন্ট,* বি.পি. সঞ্জয়, এশিয়া প্যাসিফিক মিডিয়া এডুকেটর, সংখ্যা ২২(১), পৃ: ১১৫ -১২৬।

৬) *আধুনিক গণমাধ্যম,* ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, বুকস্ অ্যান্ড এলায়েড।

মডিউল -৪ ◻ ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাস

একক : ১ ◻ ভারতীয় চলচ্চিত্রের ঐতিহাসিক বিকাশ- প্রধান চলচ্চিত্র প্রযোজনা কেন্দ্র - বোম্বাই, চেন্নাই, কলকাতা ইত্যাদি

৪.১.০ গঠন

৪.১.১ উদ্দেশ্য

৪.১.২ ভারতীয় সিনেমার যাত্রাপথ

৪.১.৩ দাদাসাহেব ফালকে

৪.১.৪ ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (ডি.জি)

৪.১.৫ কাহিনীনির্ভর চলচ্চিত্র এবং ম্যাডান

৪.১.৬ অন্যান্য স্টুডিও

৪.১.৭ প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া

৪.১.৮ স্টুডিও সিস্টেম

৪.১.৮.১ সবাক সিনেমা

৪.১.৮.২ নিউ থিয়েটার্স

৪.১.৯ সারাংশ

৪.১.১০ অনুশীলনী

৪.১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

৪.১.১ উদ্দেশ্য

আমরা এই এককে যে বিষয়ে আলোচনা করবো সেই গুলি হলো:

ভারতীয় সিনেমার যাত্রাপথ

দাদাসাহেব ফালকে

ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (ডি.জি)

কাহিনীনির্ভর চলচ্চিত্র এবং ম্যাডান

অন্যান্য স্টুডিও

প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া

স্টুডিও সিস্টেম

৪.১.২ ভারতীয় সিনেমার যাত্রাপথ

ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক আমল থেকেই সংস্কৃতি চর্চার অঙ্গ হিসেবে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছিল। সংবাদপত্র, বেতার ইত্যাদির পাশাপাশি গণমাধ্যমের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে গড়ে উঠেছিল। আধুনিক বিশ্বে সাংস্কৃতিক চর্চার সামাজিক গুরুত্বের সাথে তাল মিলিয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্র চর্চা শুরু হয়েছিল। তবে এটি কেবলমাত্র সংস্কৃতিক যোগাযোগের একটি মাধ্যম হিসেবে গড়ে ওঠেনি, সমাজের দর্পণ এবং পরিবর্তনের সংস্কৃতির মাধ্যম হিসেবে, ইতিহাসের উৎস ও আলোচ্য বিষয় হিসেবে গুরুত্ব লাভ করেছে। ১৮৯৮ সালে জনৈক আমেরিকান ব্যবসায়ী চিত্র প্রদর্শনের জন্য কোলকাতায় আসেন। তাঁর কাছ থেকেই এক বাঙালি আলোকচিত্র শিল্পী হীরালাল সেন একটি ফিল্ম প্রজেক্ট ক্রয় করেন। এই প্রজেক্ট দিয়ে তিনি কোলকাতার আশপাশে ও ভোলার এসডিও ডাক বাংলার সন্নিকটে কয়েকটি চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। হীরালাল সেন এই বিদেশী কলাকুশলীদের সহকারী হিসেবে প্রথম কাজ শুরু করেন এবং তার কাছ থেকে কিছুকাল কাজ শেখার পর তিনি নিজেই পরবর্তীতে একটি ক্যামেরা তৈরি করেন এবং ওই ক্যামেরা দিয়েই তিনি প্রথম ছবি তৈরির কাজ শুরু করেন। সে সময় 'আলিবাবা' নাটকের কয়েকটি দৃশ্য তিনি গ্রহণ করেন। নাটকের মাঝখানে এই দৃশ্যগুলো দেখানো হতো। এই শটগুলোই একসঙ্গে নিয়ে ভারতের প্রথম চলচ্চিত্র তৈরির প্রয়াস হিসেবে স্বীকৃতি পায়।হীরালাল সেন ১৯০০ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত ৪০টির মতো স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বানিয়েছিলেন বলে জানা যায়। ১৯১৭ সালে কলকাতায় মারা যাবার আগে পর্যন্ত তিনি বাংলা চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভারতীয় উপমহাদেশে চলচ্চিত্র নির্মাণের এভাবেই প্রথম সূত্রপাত হয়। এরই পথ বেয়ে পরবর্তীতে ভারতের প্রথম নির্বাক কাহিনী চিত্র তৈরি করেন বোম্বাইয়ের ডিজি ফালকে। ছবিটির নাম ছিল 'হরিশচন্দ্র'। ছবিটির দৈর্ঘ্য ছিল ৩৭,০০০ ফুট। এটি ভারতীয় প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য নির্বাক ছবি। ১৯১৩ সালে মোম্বাইয়ের করোনেশন সিনেমা হলে 'হরিশচন্দ্র' ছবিটি মুক্তিলাভ করে। এই ছবিতে স্ত্রীর ভূমিকায় পুরুষ শিল্পীদের অভিনয় করতে হয়েছিল। কারণ সেই সময়ে মহিলা শিল্পীদের ছবিতে অভিনয় করাটা রীতিমতো অসম্মানজনক বলে মনে করা হতো। ১৯১৩ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত দাদাসাহেব ফালকে ২৩টি নির্বাক ছবি তৈরি করেন।

ঔপনিবেশিক ভারতে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রথম পর্বে বিষয় নিয়ে খুব পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়নি, মূলত ধর্মীয় কাহিনী নির্ভর চরিত্র তুলে ধরার এক প্রথাগত প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছিল। শুরু থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ভারতে নির্বাক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হতো। ইউরোপীয় সংস্কৃতির তথ্যচিত্র নির্মাণের ঘরানা অনুসরণ করেই এদেশে চলচ্চিত্রের পথচলা শুরু হলেও পরবর্তী কালে চলচ্চিত্রের বিষয়গুলি ছিল সম্পূর্ণভাবে সনাতনী ভারতীয়।

ভারতের প্রথম চলচ্চিত্র ১৮৯৬ সালে প্রদর্শিত হয়েছিল এবং সম্পূর্ণ ভারতীয় উদ্যোগে যে প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছিল সেটি হল 'রাজা হরিশচন্দ্র'(১৯১৩) এবং তার নির্মাতা ছিলেন সিনেমাপাগল দাদাসাহেব ফালকে। এই চলচ্চিত্র নির্মাণের সাফল্যে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ১৯১৮ সালে 'শ্রীকৃষ্ণ জনম' নামক আরেকটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। যার বিষয় ছিল ভারতীয় দেবতা হিসেবে পূজিত শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ঘিরে গড়ে ওঠা এক প্রতিলৌকিক কাহিনী। প্রকৃতপক্ষে এটা লক্ষ্য ক্রলেই বোঝা যায় ভারতীয় জনজীবনে ধর্মের গুরুতর প্রভাব অনুভূত করেই এই ধরনের সিনেমা নির্মাণ করা হতো। প্রাথমিক বিদেশী সাহায্যের পর দাদাসাহেব ফালকের হাত ধরে ভারতের চলচ্চিত্র নির্মাণের স্বদেশী করন ঘটেছিল। পাশাপাশি 'রাজা হরিশচন্দ্র' সিনেমাটির চরিত্র রাজা হরিশচন্দ্রের সততা পরবর্তীকালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল। অবিভক্ত ভারতের প্রথম সবাক ছবি আলম আরা' ১৯৩১ সালের ১৪ মার্চ বম্বের ম্যাজিস্ট্রিক সিনেমা হলে মুক্তি পায়। ভারতীয় প্রথম সবাক ছবির পথিকৃৎ 'আলমআরা'র নির্মাতা ছিলেন আরদোশর ইরানী।

বাংলাও পিছিয়ে ছিল না। তৈরি হলো প্রথম নির্বাক কাহিনীচিত্র 'বিল্বমঙ্গল' ১৯১৯ সালে। এই সময় অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (ডি.জি)। 'বিলেত ফেরত' (১৯২১) তৈরি করা ছাড়াও ভদ্র শিক্ষিত পরিবারের মেয়েদের সিনেমায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি যা সে সময়ের সাপেক্ষে অভাবনীয় ঘটনা ছিল। আর একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হলেন প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া। বাংলা সিনেমার একটি সময়কে প্রমথেশ যুগ বলে অভিহিত করা হয়। ত্রিশের দশকের শুরুতে সিনেমা সবাক হয় বাংলার প্রথম সবাক চলচ্চিত্র ছিল জামাইষষ্ঠী। এই সময়ে হলিউডের মতো বাংলায় শুরু হয় স্টুডিও সিস্টেম। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল বীরেন্দ্রনাথ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও। এর দ্বারা বাংলা সিনেমা যথেষ্ঠ উপকৃত হয়। জনপ্রিয়তায় সিনেমা তখন তুঙ্গে ছিল। কিন্তু ধরে নেওয়া হয় দুর্বল পরিচালনা, আত্মপ্রচারের লোভ ও অপেশাদারিত্বের ফলে চল্লিশের দশকের পর স্টুডিও সিস্টেমের পতন হয়।

৪.১.৩ দাদাসাহেব ফালকে

ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাল ১৯১৩। এই বছর ভারতবর্ষের কাহিনীচিত্র 'রাজা হরিশচন্দ্র' নির্মিত হয়। নির্মাণকারী পরিচালক ধুন্দিরাজগোবিন্দ ফালকে, তিনি দাদাসাহেব ফালকে নামেই অধিক পরিচিত। পৌরাণিক এই কাহিনীচিত্রে চিত্রশিল্প, সঙ্গীত এবং নাটকের এক অদ্ভুত মেলবন্ধন ঘটেছিল। দাদা সাহেব ফালকে তাঁর পূর্বসূরী চিত্রশিল্পী রাজা রবি বর্মার চিত্রশৈলী থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, এবং ছবির চরিত্রের অর্থাৎ রাজা হরিশচন্দ্রে রাজা রবি বর্মার প্রভাব স্পষ্ট। এছাড়া তৎকালীন মারাঠি নাট্যমঞ্চও ফালকে-কে প্রভাবিত করেছিল। রাজা হরিশচন্দ্র ১৯১৩ সালে নির্মিত হলেও এইরকম ছবি করার কথা ফালকে প্রথম ভেবেছিলেন ১৯১০ সালে। সেই সময় 'লাইফ অফ ক্রাইস্ট' নামে একটি ছবি দেখে তিনি অনুপ্রাণিত হন। ঠিক এইরকমই ভারতীয় পুরাণের ভিত্তিতে পাওয়া চরিত্রের ওপর একটি সম্পুর্ণ ভারতীয় চলচ্চিত্র তৈরি করবেন স্থির করেন।

চলচ্চিত্রের পেশায় আসার আগে ফালকে বিভিন্ন রকম পেশায় যুক্ত ছিলেন। ১৮৬০ সালে মহারাষ্ট্রের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ফালকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে জে. জে. স্কুল অফ আর্ট এর ছাত্র হিসেবে যোগ দেন। সেখানের শিক্ষা শেষে তারপর বরদার কলাভবনে যোগ দেন। দুটি ক্ষেত্রে শিক্ষনের ফলে দাদাসাহেব ফালকে শিল্পকলা, ছাঁচ নির্মাণ, লিথোগ্রাফ, স্থাপত্য বিদ্যা এবং ফটোগ্রাফিতে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। এই সময় মঞ্চাভিনয়ে যোগ দেন। তিনি জর্জ মেলিয়ের মতন যাদুবিদ্যা রপ্ত করেছিলেন যা তাঁর মতে চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী। রাজা হরিশচন্দ্র ১৯১৩ সালের ৩রা মে করোনেশন সিনেমাটোগ্রাফ—এ মুক্তি লাভ করে। রাজা হরিশচন্দ্র অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছিল সমগ্র ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষের মানুষ এই প্রথম সম্পূর্ণ ভারতীয় বিষয়বস্তু নির্ভর একটি ভারতীয় ছবি দেখতে পেলেন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তারা ছবিটির সাথে একাত্ম বোধ করেন। ১৯১৭ সালে ফালকে হিন্দুস্তান কোম্পানি তৈরি করেন। এই কোম্পানির প্রথম ছবি ছিল 'শ্রীকৃষ্ণ জনম' (১৯১৮)। ১৯১৯ সালে তৈরি হয় 'কালীয়দমন'। এই ছবিতে মূল চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ফালকের মেয়ে মন্দাকিনী। ফালকে মোট ১২০টি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। তার শেষ ছবি 'গঙ্গাবতরণ'। ১৯৪৪ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি দাদাসাহেব ফালকে পরলোকগমন করেন।

৪.১.৪ ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (ডি.জি)

ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর জন্ম ১৮৯৩ সালের ২৬ মার্চ, কলকাতায়। খুবই শিক্ষিত পরিবারে জন্ম হয়েছিল ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর। ছেলেবেলাতেই ধীরেন্দ্রনাথ পড়াশোনার জন্য চলে যান শান্তিনিকেতনে এবং সেখানে বালক বয়সে সংগীত, অঙ্কন, অভিনয় এবং যন্ত্রবাদনে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। শান্তিনিকেতনে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শিক্ষা অর্জন করেছিলেন। 'বাল্মিকী প্রতিভা'য় কবির সাথে অভিনয় করেছিলেন তিনি। কবি হয়েছিলেন 'বাল্মিকী' এবং ধীরেন্দ্রনাথ হয়েছিলেন 'মায়া'। শান্তিনিকেতনে এন্ট্রান্স পাশ করে কলকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন, এরপর তিনি সরকারি আর্ট স্কুল থেকে স্নাতক হন।

১৯১৬ সালে ধীরেন্দ্রনাথ হায়দ্রাবাদের নিজাম আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ হন। কিন্তু ১৯১৮সালে কর্মস্থলে ইস্তফা দিয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। ফিরে আসার মূল উদ্দেশ্য ছিল চলচ্চিত্র নির্মাণ করা। তিনি তৈরি করেন ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানি। তাঁর সাথে যোগ দেন ম্যাডান কোম্পানির তৎকালীন জেনারেল ম্যানেজার নীতিশ লাহিড়ী। ধীরেন্দ্রনাথ তৈরি করেন প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যর বাংলা ছবি 'বিলেত ফেরত'। ১৯২১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ভবানীপুরে রসা থিয়েটারে মুক্তি লাভ করে। এই ছবিটি একটি সামাজিক ছবি। ভারতীয়দের অন্ধভাবে ইউরোপীয় আচার ব্যবহার নকল করাকে বিদ্রুপ করেছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ এই ছবিতে। ছবির মূল চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ স্বয়ং। এছাড়া ছবির কাহিনীকার এবং পরিচালকও ছিলেন তিনি। হাস্যভিনেতা হিসেবে প্রথম ছবিতেই খ্যাতি লাভ করেন। ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানির দ্বিতীয় ছবি ছিল 'যশোদা নন্দন'। এই ছবিতে কাহিনীকার ছিলেন নীতিশ লাহিড়ী। তাঁদের তৃতীয় ছবি ছিল 'সাধু কী শয়তান'। কিন্তু এই ছবির নির্মাণকার্য সম্পন্ন হওয়ার আগেই ধীরেন্দ্রনাথ কোম্পানি ত্যাগ করেন।

প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের এবং সামাজিক ছবির নির্মাতা ধীরেন্দ্রনাথ-এর আরেকটি অনস্বীকার্য এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল, তিনি প্রথম শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের মেয়েদের সিনেমায় অভিনয়ের জন্য নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। নিজের স্ত্রী প্রমিলাদেবীকে 'যশোদা নন্দন' সিনেমায় অভিনয় করিয়েছিলেন। পরের দিকে কন্যা মনিকাকেও সিনেমা নিয়ে এসেছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ এর ভাষায় ''আমি মেয়েদের যথার্থ শিল্পী হতে আহ্বান জানিয়েছিলাম চলচ্চিত্রের পর্দায়। আমি ওদের মর্যাদা আদায় করে নিতে শিখিয়েছিলাম। আমার স্ত্রী ঠাকুর বাড়ির মেয়ে, তাকে প্রথমেই নামিয়ে আমি অন্যদের অনুপ্রাণিত করেছিলাম।'' শিল্পের উৎকর্ষতার জন্য শিক্ষিত মেয়েদের সিনেমায় যোগদান একান্ত আবশ্যক।

১৯২২ সালে ধীরেন্দ্রনাথ হায়দ্রাবাদের গড়ে তোলেন তাঁর লোটাস ফিল্ম কোম্পানি। তাঁর বড় দাদা জ্ঞানেন্দ্রনাথ ছিলেন হায়দ্রাবাদের নিজাম ইঞ্জিনিয়ার। তারই সহায়তায় ধীরেন্দ্রনাথ কোম্পানি গড়ে তোলেন। স্টুডিও যন্ত্রপাতি ক্যামেরা ইত্যাদি অবশ্য কলকাতা থেকে কিনেছিলেন তিনি। লোটাস ফিল্ম কোম্পানির প্রথম ছবি 'ইন্দ্রজিৎ ও লেডি টিচার'। টাইটেল সহ ছবিটি মুক্তি পায় ১৯২২ সালের ১৯ আগস্ট। এটি ছিল ৮ রীলের ছবি। এরপর একে একে তিনি তৈরি করেন 'ম্যারেজ টনিক', 'বিমাতা', 'হরগৌরী', 'বিল্বমঙ্গল', 'সতী সীমন্তিনী' ইত্যাদি। ছবিগুলি তখন হায়দ্রাবাদের লক্ষ্মী সিনেমায় দেখানো হত। ১৯২৯ সালে ধীরেন্দ্রনাথ প্রমথেশ বড়ুয়ার সাথে তৈরি করেন ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মস লিমিটেড।

৪.১.৫ কাহিনিনির্ভর চলচ্চিত্র এবং ম্যাডান

দাদাসাহেব ফালকের একের পর এক সফল ছবি নির্মাণে ও তাদের জনপ্রিয়তায় ও সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে কলকাতার চলচ্চিত্রপ্রেমী জে. এফ ম্যাডান ভারতের প্রথম চিত্রগৃহ স্থাপনাকার্যে মন দেন। ১৯১৭ সালে তার প্রথম নির্বাক ছবি ''নলদময়ন্তী'' মুক্তিলাভ করে। ঠিক এ সময়ই দুজন বাঙালি ব্যবসায়ী চিত্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এরা হলেন অনাদি নাথ বসু ও এন সি লাহিড়ি। কলকাতার প্রথম চিত্রগৃহ নির্মাণ করেন জে.এফ ম্যাডান। চিত্রগৃহটির নাম ছিল 'এনফিনাস্টোন পিকচার প্যালেস' যা পরে মিনার্ভা সিনেমা হল নামে পরিচিত হয়।

ভারতের প্রথম সবাক চিত্র ''আলম আরা'' ১৯৩১ সালের ১৪ মার্চ বোম্বের ম্যাজিস্টিক সিনেমা হলে মুক্তি লাভ করে সে কথা আগেই বলা হয়েছে। ছবিটি প্রযোজনা করেন আরবদেশীয় ব্যবসায়ী আরদোশর ইরানী। কলকাতার ম্যাডান থিয়েটার্স, বোম্বের কৃষ্ণ ফিল্ম কোম্পানি ও ইমপেরিয়াল মুভি টোন সর্বপ্রথম ভারত তথা উপমহাদেশে সবাক কাহিনী চিত্র নির্মাণের উদ্যোগ নেন। শেষ পর্যন্ত প্রথম সবাক কাহিনী চিত্র নির্মাণে সক্ষম হন ইমপেরিয়াল মুভি টোন। চলচ্চিত্রের ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায়, 'আলম আরা'র মুক্তির ঠিক এক মাস আগে ১৯৩১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি সবাক চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ রেখেছিলেন কলকাতার এই জে এফ ম্যাডান কোম্পানি। সেইসময়ের প্রখ্যাত মুন্নি বাঈয়ের একটি গান শুটিং করে সবাক চিত্রের মাধ্যমে উপহার দিয়েছিলেন এই প্রতিষ্ঠানটি। এই সঙ্গীত চিত্রটি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয় তৎকালীন কলকাতার ক্রাউন হলে। শুধু তাই নয় আলম আরার মুক্তির তারিখেই (১৪ মার্চ ১৯৩১ সাল) ম্যাডান কোম্পানি আরো একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য পাঁচমিশালী সবাক ছবি উপহার দেন ওই ক্রাউন হলেই। এরপর ১৯৩১ সালের ১১ এপ্রিল জেএফ ম্যাডান কোম্পানির তৈরি প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা সবাক চিত্র 'জামাই ষষ্ঠী' ক্রাউন সিনেমা হলে মুক্তিলাভ করে। এটি ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম বাংলা সবাক কাহিনী চিত্র। ছবিটির পরিচালনায় ছিলেন অমর চৌধুরী। ঠিক এই বছরই নিউ থিয়েটার্স লিমিটেডের প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই নব প্রতিষ্ঠানের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র ''দেনা পাওনা'' ১৯৩১ সালের ২৪ ডিসেম্বর চিত্রায় মুক্তি পায়। এবছরেই আরো কয়েকমাসের মধ্যে ম্যাডান কোম্পানি আরো ৩টি পূর্ণাঙ্গ সবাক চিত্র 'জোরবরাত', 'ঋষির প্রেম', 'প্রহ্লাদ' ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের কৌতুক চিত্র 'তৃতীয় পক্ষ' তৈরি করে সবাক ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেন। এমনিভাবেই ভারতীয় সবাক ছবির সূচনা হয়েছিল ম্যাডান কোম্পানি সৌজন্যে। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত ম্যাডানের তোলা ছবির সংখ্যা ছিল ৬১ (বাংলা ১০ ও হিন্দি ৫১)।

৪.১.৬ অন্যান্য স্টুডিও

স্টুডিও নির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণের তৎকালীন পরম্পরায় ম্যাডান কোম্পানি বা ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানি ছাড়া অন্য যে নাম করা স্টুডিওগুলো ছিল সেগুলি হল

- অরোরা সিনেমা কোম্পানি — যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯১১ সালে।প্রতিষ্ঠতা ছিলেন অনাদিনাথ বসু ও দেবী ঘোষ। এদের তৈরি প্রথম ছবি 'রত্নাকর'। ছবির কাহিনীকার ও পরিচালক ছিলেন সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়। মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেন চুনিলাল দেব, শশীমুখী ও সুশীলাবালা। এটি ৭রিলের ছবি ছিল।
- ইন্ডিয়া ফিল্মসকোম্পানি ছবি নির্মাণ করা ছাড়াও ছবি পরিবেশনার কাজ করতেন।

- কোহিনূর ফিল্ম কোম্পানি যাদের প্রথম ছবি 'কৃষ্ণ সুদামা' (৭রিলের ছবি)
- ইন্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানি এবং এদের প্রথম ছবি 'লব কুশ'।
- হিন্দুস্তান ফিল্ম কোম্পানি - এদের প্রথম ছবি 'কংস বধ'৭ রিলের এই ছবি মুক্তি পায় ১৯২২ সালে।
- তাজমহল ফিল্ম কোম্পানি - প্রথম ছবি 'আঁধারে আলো' মুক্তি পায় ১৯২২ সালে।
- ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মস লিমিটেড নামক এই স্টুডিওর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, প্রমথেশ বড়ুয়া প্রমুখ। ১৯২৯ সালে ৭ জানুয়ারি স্টুডিও শুরু হয়। ধীরেন্দ্রনাথ হায়দ্রাবাদ থেকে ফিরে এসে এই কোম্পানি শুরু করেন। মোট আটটি ছবি তৈরি হয় এখানে। 'কামনার আগুন' (১২ রীলের), 'টাকায় কি না হয়' (৪ রীলের), 'দুষ্টু বালক' (৩ রীলের), 'অলীক বাবু' (৭ রীল), 'মরণের পরে' (১০ রীলের), 'সীমান্ত চোর' (১০ রীল) এবং 'চরিত্রহীন' (১০ রীল)।

ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মস লিমিটেড বাংলা চলচ্চিত্র কে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। প্রথমত বিশেষ কিছু প্রতিভা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের হাতে খড়ি এখানে। যেমন দেবকী কুমার বসু এখানে কাজ শুরু করেন। দ্বিতীয়ত ঘরের মেয়েদের ধীরেন্দ্রনাথ এখানেও নিজের ছবির জন্য নিয়ে আসেন। এখানেই 'টাকায় কি না হয়' ছবিতে প্রমথেশ বড়ুয়ার প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। তবে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো বাংলা সিনেমার নির্বাক যুগের একটি মাত্র খন্ডচিত্র পাওয়া যায়, তার নাম 'জামাইবাবু'। পরিচালক ছিলেন কালীপদ দাস। এটি ১৯৩১ সালে নির্মিত হয়। স্ল্যাপ-স্টিক ধরনের কমেডি ছবি ছিল 'জামাইবাবু'।

দক্ষিণ ভারতেও চলচ্চিত্রের ও স্টুডিও সিস্টেমের বিকাশ হয়েছে সমান তালে। আর নটরাজা মুদালিয়ার নামে এক ব্যবসায়ী নিজের আগ্রহে সিনেমাটোগ্রাফি শিখে নিজের ইন্ডিয়ান ফিল্ম কোম্পানি বানান ও বেশ কিছু ছবি তৈরি করেন যা ছিল মূলত পৌরাণিক কাহিনীনির্ভর। ১৯২৩ সালের মধ্যে ছটি নির্বাক ছবি তৈরি করেন। প্রথম প্রয়াস ছিল 'কিচকা বধ' (১৯১৭), তারপর তৈরি হয়েছে দ্রাউপাদি, লব কুশ, মার্কণ্ডেয়, মায়ি রাবণ। এইসব ছবিতে ইংরাজি ও স্থানীয় ভাষায় সাবটাইটেল থাকত।

৪.১.৭ প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া

ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসে একটি বিশেষ সময়কে প্রমথেশ যুগ বলা হয়। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রমথেশ বড়ুয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম।প্রমথেশ বড়ুয়ার জন্ম ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ২৪ অক্টোবর গৌরীপুর রাজপরিবারে। বাবা ছিলেন শ্রী প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়া। প্রমথেশ পরিবারের জ্যেষ্ঠপুত্র। ছেলেবেলা থেকেই পড়াশোনা খেলাধুলা গান-বাজনা এবং ছবি আঁকার আগ্রহ ছিলো। পরবর্তীকালে এসবের সঙ্গে যুক্ত হয় তার ছবি তোলার শখ এবং ছবি তোলার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ এতটাই গভীর ছিল যে এই বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে তিনি ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের বিভিন্ন জায়গায় যান। প্রমথেশ ১৯২০ সালে কলকাতার হেয়ার স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন এবং ১৯২৪ সালে প্রেসিডেন্সি থেকে পদার্থবিদ্যা নিয়ে বিএসসি পাস করেন। ১৯২৮ সালে চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ পার্টিতে যোগ দেন। এছাড়া অসমের লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির সদস্য ছিলেন ১৯২৮ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত। এর মাঝে বিদেশে থাকাকালীন আর্নেস্ট এর ছবি দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সিনেমা শিল্পে ১৯২৯ সালে ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর সাথে একযোগে

তিনি তৈরি করেন ব্রিটিশ লিমিটেড। প্রমথেশ চন্দ্র কোম্পানির এক অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন। এর আগে তিনি তাঁর সমসাময়িক চলচ্চিত্রকারদের তিনি কাজ করতে শিখে এ জগতে আসেন নি। পরে তিনি প্যারিসের বিখ্যাত ফক্স ফিল্মস এর ক্যামেরাম্যান মিস্টার বর্জাজের অধীনে সহ ক্যামেরাম্যান হিসাবে কাজ করে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ইন্ডিয়ান সিনেমা আর্টসের নির্বাক চলচ্চিত্র 'ভাগ্যলক্ষী' -তে অভিনয় করে তিনি চলচ্চিত্র জগতের বিদগ্ধজনের নজরে আসেন। ১৯৩১ সালে প্রমথেশ বড়ুয়া বরুয়া ফিলমস নামে একটি চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। বড়ুয়া ফিল্মস এর প্রথম ছবি ছিল 'অপরাধী' যেখানে প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালনা ছাড়াও নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন এবং দর্শকের মনে দাগ কাটেন। এই ছবির দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছিল ফ্লোরে, কৃত্রিম আলোতে। প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত প্রথম সবাক চলচ্চিত্র ছিল 'বাংলা ১৯৮৩'।

১৯৩২ সালে প্রমথেশ চন্দ্র বড়ুয়া নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেন। এবং ১৯৩২ থেকে ১৯৩৯ এর এই স্বর্ণযুগের মধ্যে তৈরি করেন একের পর এক কালজয়ী ছবি এবং সূচনা করেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক নতুন যুগের। বিখ্যাত ছবিগুলো ছিল 'দেবদাস', 'রজত জয়ন্তী', 'গৃহদাহ', 'অধিকার', 'মুক্তি', 'জিন্দেগি', 'উত্তরায়ণ', 'মায়ের প্রাণ', 'শেষ উত্তর', 'চাঁদের কলঙ্ক', 'মায়া'। তবে 'মুক্তি' এবং 'দেবদাস' এই দুটি ছবি বাংলা তথা ভারতবর্ষের চলচ্চিত্র তাত্ত্বিকদের বারেবারে ভাবিয়েছে এবং আলোচনায় উঠে এসেছে। তার নিজস্ব অভিনয়শৈলী বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। 'মুক্তি' এবং 'রজতজয়ন্তী' -তে বাস্তবতার ছাপ ছিল। তাত্ত্বিকদের মতে সেই বাস্তবতার বোধই আরো দৃঢ় ভাবে ভারতীয় ছবিতে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। চলচ্চিত্র নির্মাণে ক্যামেরার অবাধ গতি আর প্রকৃতিকে স্বাভাবিক ভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নতুনত্ব দেখা যায়। বিষাদমাখা প্রেমের গল্প, তার সাথে আভিজাত্যপূর্ণ, নিরাসক্ত ভাবাপন্ন অভিনয় ওনার ছবিগুলিতে অনন্য মেলোড্রামা সৃষ্টি করেছিল।

নিউ থিয়েটার্স সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর প্রমথেশ চন্দ্র বিভিন্ন স্টুডিওতে কাজ করেন। মোট ২১ টি ছবি পরিচালনা করেন প্রমথেশ বড়ুয়া। এই ছবির মধ্যে ১৪টি ছিল বাংলা ছবি আর ৭টি হিন্দি। তিনি কয়েকটি ছবিতে সুরারোপও করেছেন ১৯৫১ সালে ২৯ নভেম্বর এই মহান শিল্পীর জীবনাবসান ঘটে।

৪.১.৮ স্টুডিও সিস্টেম

ভারতীয় সিনেমায় স্টুডিও সিস্টেমের স্বর্ণযুগ ছিল ১৯৩০ থেকে ৪০ এর দশক। চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে স্টুডিও নির্ভর হয়ে ওঠে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাস। এই তিরিশের দশকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো সিনেমার সবাক হওয়া।

৪.১.৮.১ সবাক সিনেমা

ভারতবর্ষে প্রথম সবাক চলচ্চিত্র ইরানির 'আলম আরা' ছবিতে প্রায় এক ডজন গান এবং নাচ ছিল। ছবিটি অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করে। বলা হয় এই ছবিতেই কিন্তু পরবর্তীকালে ভারতীয় সিনেমার ধারা সৃষ্টি হয়। ১৯৩৩-৩৪ সাল, ভারতীয় সিনেমার মূল উপাদান ছিল গান আর নাচ। এমনকি কোনো কোনো ছবিতে প্রায় ৫০ খানা গানও থাকত। তবুও ভারতীয় দর্শক বিদেশি ছবির থেকে এই নৃত্য গীত সম্বলিত ছবিই বেশি উপভোগ করতেন। বাংলা সিনেমা সবাক হয়েছিল বিখ্যাত গায়িকা মুন্নি বাই-এর গান গাওয়ার দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে। এটিও ম্যাডানরাই তুলেছিলেন। এমনকি বাংলার প্রথম সবাক চলচ্চিত্র 'জামাইষষ্ঠী' নির্মাণের কৃতিত্ব ম্যাডানদের। ১৯৩১ সালের ১২ই এপ্রিল জামাইষষ্ঠী মুক্তি লাভ করে। বিদেশি ছবির আসার ফলে যে দর্শক মণ্ডলী ভারতীয় সিনেমার প্রতি বিমুখ

হয়েছিলেন, এই সবাক সিনেমা তাদের আবার ফিরিয়ে আনে। সিনেমা জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম হিসাবে এই প্রথম সাফল্যের মুখ দেখে। ১৯২৮ সালে এদেশে মোট ২৫৭টি সিনেমা হল ছিল, ১৯৩৮ সালে তা বেড়ে হয় ১৬৫৭। শহরে, মফস্বলে এমনকি বর্ধিষ্ণু গ্রাম অঞ্চলেও স্থায়ী সিনেমাহল তৈরি হয়। আর গ্রামে গ্রামে তৈরি হয় অস্থায়ী সিনেমা হল।

সিনেমা শিল্পের এই বানিজ্যিক সম্প্রসারণের পাশাপাশি সিনেমা নির্মাণ শৈলীতেও এক পরিবর্তন আসে। সিনেমার মান উন্নত হয়। মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় অবদান ছিল স্টুডিও সিস্টেমের। ত্রিশের দশকের প্রথমদিকে বোম্বাই, পুনে আর কলকাতায় এবং দশকের শেষের দিকে মাদ্রাজ সহ দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি শহরে স্থায়ী বিনিয়োগের ভিত্তিতে স্টুডিও তৈরি হয়। বাংলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্টুডিও হল নিউ থিয়েটার্স। সবাক যুগে কিছু সবাক চলচ্চিত্র যেমন 'জোর বরাত' (১৯৩১), 'ঋষির প্রেম'(১৯৩১),'তৃতীয় পক্ষ'(১৯৩১), ইত্যাদি তৈরি করলেও ১৯৩৩ সালে ম্যাডান কম্পানি বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে নিউ থিয়েটার্স এর অবদান বাংলা সিনেমার এক উল্লেখযোগ্য স্বর্ণালী অধ্যায়।

৪.১.৮.২ নিউ থিয়েটার্স

নিউ থিয়েটার্স এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ সরকার। ১৯৩০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর নিউ থিয়েটার্স স্টুডিয়োর উদ্বোধন হয়। টালিগঞ্জের শুরু হয় এক নম্বর স্টুডিও, যার দুই নাম্বার শাখা স্টুডিও গড়ে ওঠে আনোয়ার শাহ রোডে। ব্যক্তিগত স্টুডিও সিস্টেমের বদলে এখানে একসাথে অনেক গুণী মানুষের সমাবেশ ঘটে। ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর মতো অভিনেতা-পরিচালক, পরিচালক দেবকুমার বসু, পরিচালক ও অভিনেতা প্রমথেশ বড়ুয়া প্রমুখ একত্রিত হয়ে একসাথে কাজ করতে আসেন।

নিউ থিয়েটার্স প্রযুক্তিগত অনেক পরিবর্তন আনে যা ভারতীয় সিনেমা এর আগে দেখেনি। সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন ইন্ডোর শুটিং শুরু হয়। তৈরি করা হয় ফ্লোর অর্থাৎ শুটিংয়ের চত্বর। তাঁর সাথে ব্যবস্থা করা হয় কৃত্রিম আলোর। ক্যামেরা পরিচালনার ক্ষেত্রে আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ যেমন, ট্র্যাকিংএর ব্যবহার প্রথম এখানেই দেখা যায়। এখানে পরিচালন ব্যবস্থা এবং পরিচালকের ভাবনার স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হতো। লোকচালনা এবং মানব সম্পদ বিকাশকে বিশেষ করে প্রাধান্য দেওয়া হয়। স্টুডিওর সাথে জড়িত সমস্ত কলাকুশলী, শিল্পী মাস মাইনের কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হতেন। স্টুডিওর কর্মচারী ও শিল্পীদের জন্য কতকগুলি নিয়ম ছিল, যার দ্বারা কলাকুশলীদের শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধতা তৈরি হবে এবং তাদের শৃংখলাবদ্ধ রাখা যাবে ভাবা হত। যেমন, কলাকুশলী এবং অভিনেতা অভিনেত্রীদের কোনো ছবির কাজ না থাকলেও নিয়মিত স্টুডিওতে হাজির থাকা বাধ্যতামূলক ছিল। বাধ্যতামূলক ছিল নিয়মিত অনুশীলন।এই নিয়মিত অনুশীলন এবং পর্যবেক্ষণের দ্বারা তারা নিজেদের আরো উন্নত করার সুযোগ পেত। এই কারণেই স্টুডিওতে তৈরি ছবিগুলোর মধ্যে দক্ষ কুশলতার একটা নূন্যতম মাত্রা দেখা যেত এবং তাতে সামগ্রিকভাবে উপকৃত হয়েছে চলচ্চিত্র মাধ্যম। ফলে এই স্টুডিওগুলি বিশের দশকের স্টুডিও গুলির মত শুধু শুটিংয়ের জায়গা ছিল না, বরং বৃহত্তর অর্থে চলচ্চিত্র শিক্ষারক্ষেত্রও ছিল। নিউ থিয়েটার্স এর ছবি 'ভাগ্যচক্র' থেকে প্লেব্যাক গানের ব্যবহার শুরু হয়। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ব্যবহারে ছবি যে নতুন চেহারা নেয়, নিউ থিয়েটার এর ছবি বিদ্যাপতিতে প্রথম দেখান পরিচালক দেবকী বসু।

এত বড় কর্মকাণ্ডের কর্ণধার বীরেন্দ্রনাথ সরকারের জন্ম এবং বেড়ে ওঠা অত্যন্ত বিত্তশালী এবং উচ্চ শিক্ষিত পরিবারে। বাবা ছিলেন বিশিষ্ট আইনবিদ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার। নৃপেন্দ্রনাথ ছিলেন তৎকালীন বড়লাটের আইন উপদেষ্টা কমিটির

সদস্য। বীরেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১৯০১ সালের ৫ই জুলাই ভাগলপুরে। প্রেসিডেন্সি থেকে আইএসসি পাস করে ১৯২৩ লন্ডন থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। কলকাতা এসে মার্টিনবার্ন কোম্পানিতে শিক্ষানবিশ থেকে,পরে স্বাধীনভাবে ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু তাতে মন ভরেনি তাঁর এবং অবশেষে ১৯২৮-২৯ সালে চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত হন চলচ্চিত্রের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জনের তাগিদে। ১৯৩০ সালে এই বিশাল কর্মকান্ডের অবতারণা করেন।

ইতিহাস সৃষ্টিকারী এই নিউ থিয়েটার্স এবং অন্যান্য স্টুডিও গুলির মধ্যে পুঁজি পরিকল্পনায় যথেষ্ট অদক্ষতা ছিল। তাদের কাজের মধ্যে সুস্পষ্ট পরিকল্পনার অভাব ছিল। এক ধারে ছবি তৈরীর নির্দিষ্ট সময়সীমা লঙ্ঘিত হতো, অন্যদিকে পুঁজি আবর্তনের কোনো সদর্থক রীতি বা পরিকল্পনা ছিল না। সাহায্যকারী আর্থিক সংগঠনগুলি মূলত বিদেশীদের কুক্ষিগত হওয়ার দরুন ভারতীয় সিনেমা সম্পর্কে বা সেখানে লগ্নি করার বিষয়ে তারা উদাসীন ছিল। বীরেন্দ্রনাথ সরকারও বানিজ্যের মূলমন্ত্র পুঁজি-পন্য-আরও পুঁজি, বানিজ্যের এই চক্রাকার আবর্তনকে নিষ্ঠা সহকারে মেনে চলেননি।

আসলে সিনেমার সাফল্যের তখন মূল কারণ ছিল দর্শক আনুকূল্য। আর তার মূলে ছিল তৎকালীন সিনেমার শৈলী। একাধারে সিনেমা সবাক হয়েছে অন্যদিকে সিনেমা সাহিত্য নির্ভর হয়ে ওঠে। শব্দ সংযোজনার সুযোগ নিয়ে তৎকালীন বাংলা সিনেমা সম্পূর্ণ ভাবে সাহিত্যের চিত্ররূপ দিতে শুরু করে। নাচ গান এবং সাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্ররূপ সিনেমাকে দর্শকমহলে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা এনে দেয়। কিন্তু চল্লিশের দশকের পর থেকেই সমস্ত স্টুডিও সিস্টেম ভেঙে পড়তে শুরু করে। এর মূলে ছিল শৃঙ্খলাহীন পুঁজি ব্যবস্থা। পুঁজির বাজার তৈরি না হওয়া এবং সম্পূর্ণরূপে মহাজনী পুঁজির উপর নির্ভরশীল হওয়ার দরুন ঋণগ্রস্ত স্টুডিও মালিকদের ক্ষতিপূরণ দিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তিও হারাতে হয়। এছাড়াও ব্যবসার উন্নতির সাথে সাথে পড়ন্ত জমিদার এবং উড়ন্ত কালোয়াররা ভীড় করে লগ্নি করে সহজেই একতরফা মুনাফা করত। স্বাভাবিকভাবেই বিনিয়োগের এককেন্দ্রিকতা বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে। স্টুডিও মালিক এবং প্রযোজক দুটি আলাদা গোষ্ঠী সূত্র তৈরি হয়। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রিব্রত্ন হয় যখন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা আর নিছক বেতনভুক হয়ে থাকতে রাজি হয় না। তারা তাদের ব্যবসায়িক মূল্য এবং তারকা ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। নিউ থিয়েটার্স তাই এত প্রতিকূলতার মধ্যে ক্রমশ বিলীন হয়ে হতে শুরু করে। ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত গড়ে দুই বা তিন খানি ছবি বানালেও অবস্থার অবনতি ঘটে। স্টুডিও সিস্টেম এইভাবেই ক্রমে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

৪.১.৯ সারাংশ

আমরা এই এককে যে বিষয়ে আলোচনা করলাম সেই গুলি হলো:

- ভারতীয় সিনেমার যাত্রাপথ
- দাদাসাহেব ফালকে
- ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (ডি.জি)
- কাহিনিনির্ভর চলচ্চিত্র এবং ম্যাডান
- অন্যান্য স্টুডিও
- প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া
- স্টুডিও সিস্টেম

৪.১.১০ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন :

১. হীরালাল সেন কে?
২. ভারতের প্রথম কাহিনীচিত্র কী? পরিচালক কে ছিলেন?
৩. ভারতের প্রথম সবাক ছবি কী? কে ছিলেন পরিচালক?
৪. ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

বড় প্রশ্ন :

১. ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে দাদাসাহেব ফালকে অবদান বিস্তারিত আলোচনা করুন।
২. বাংলা চলচ্চিত্র ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির আধুনিক ভাবনায় কিভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে তা আলোচনা করুন।
৩. বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ম্যাডান এর গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৪. ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রমথেশ বড়ুয়া অবদান ব্যাখ্যা করুন।
৫. ভারতীয় সিনেমার সবার সাথে স্টুডিও সিস্টেমের যোগাযোগ কোথায় - ব্যাখ্যা করুন।
৬. নিউ থিয়েটার্সের অবদান ব্যাখ্যা করুণ।

৪.১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

- *সোনার দাগ,* গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ।
- *বাংলা সিনেমা,* অরুণ দাশগুপ্ত।
- *History - Bengali cinema,* Kiranmoy Raha
- *Encyclopaedia of Indian cinema*
- *Mass Communication in India,* Keval J kumar, Jaico Publishing House
- *গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি,* ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, লিপিকা
- *চলচ্চিত্রের অভিধান,* ধীমান দাশগুপ্ত, বানীশিল্প, কলকাতা
- *আধুনিক গণমাধ্যম,* ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, বুকস্ অ্যান্ড এলায়েড

একক - ২ □ ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের গুণীজন (স্বাধীনতা পরবর্তী)

৪.২.০ গঠন

৪.২.১ উদ্দেশ্য

৪.২.২ সত্যজিৎ রায়

৪.২.৩ ঋত্বিক ঘটক

৪.২.৪ মৃণাল সেন

৪.২.৫ তপন সিংহ

৪.২.৬ রাজ কাপুর

৪.২.৭ গুরু দত্ত

৪.২.৮ হৃষিকেশ মুখার্জী

৪.২.৯ সারাংশ

৪.২.১০ অনুশীলনী

৪.২.১১ গ্রন্থপঞ্জি

৪.২.১ উদ্দেশ্য

আমরা এই এককে যাদের বিষয়ে আলোচনা করবো তারা হলেন:

- সত্যজিৎ রায়
- ঋত্বিক ঘটক
- মৃণাল সেন
- তপন সিংহ
- রাজ কাপুর
- গুরু দত্ত
- হৃষিকেশ মুখার্জী

৪.২.২ সত্যজিৎ রায়

কেবল মাত্র ভারতবর্ষ নয় সমগ্র বিশ্বের বরেণ্য চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে অন্যতম হলেন সত্যজিৎ রায়। ভারতীয় সিনেমাকে তিনিই বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করেছেন। তার বহু ছবি প্রথম শ্রেণীর আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। সমগ্র এশিয়ায় কুরোশাওয়াকে বাদ দিলে এত বড় মাপের বহুগুণ সম্পন্ন চলচ্চিত্রকার আর হয়নি বলেই ধরা হয়। আদ্যপান্ত

একজন শিল্পী সত্যজিতের বহুমুখী প্রতিভার স্ফুরণ শুধু সিনেমায় নয়, ঘটেছে সাহিত্যে, আঁকায়, প্রচ্ছদ নির্মাণে এবং ক্যালিগ্রাফিতে। চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রত্যেকটি বিষয়ের সঙ্গেই তিনি গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। চিত্রনির্মাণকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন তিনি। চিত্রনাট্য রচনা, সংগীত রচনা ও নির্দেশনা, ক্যামেরা, শিল্পনির্দেশনা, অভিনয় প্রতিটি বিষয়কেই তিনি নিয়ন্ত্রণ করতেন।

ছবি সৌজন্যে-Wikipedia

সত্যজিৎ রায়ের জন্ম ২ মে , ১৯২১ কলকাতায় এক ঐতিহ্যশালী পরিবারে। পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ও পিতা সুকুমার রায়ের উত্তরসূরি সত্যজিৎ রায় পড়াশুনা করেন কলকাতায় এবং শান্তিনিকেতনে। ইস্কুলের পাঠ নেন বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে। তারপর প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অর্থনীতিতে অনার্স গ্রাজুয়েট। ছাত্রাবস্থা থেকেই ফোটোগ্রাফী, পাশ্চাত্ত সংগীত এবং সিনেমার প্রতি ভালবাসা তৈরি হয়। তাঁর ছবি আঁকার হাত ছিল খুবই ভালো। রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকার সময়েই শান্তিনিকেতনের কলাভবনে যান ছবি আঁকা শিখতে। তখন কলাভবনের দায়িত্বে ছিলেন নন্দলাল বসু। শান্তিনিকেতনের পাঠ শেষে কলকাতায় ফিরে এসে যোগ দেন একটি বিখ্যাত বিজ্ঞাপন সংস্থায়। এই বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করতে করতেই প্রথম সিনেমা তৈরির কথা মাথায় আসে তাঁর। সেই সময় কাজের ফাঁকে দেখতে থাকেন অজস্র বিখ্যাত ইতিহাস সৃষ্টিকারী বিদেশী ছবি। ডি সিকার 'বাই সাইকেল থিভস' দেখে অনুপ্রাণিত হন নয়াবাস্তববাদী ঘরানায় ছবি করার জন্য। এর মাঝে বন্ধু হরিসাধন দাশগুপ্তর জন্য রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরের চিত্রনাট্য লেখেন। ইতিমধ্যে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনে। তার আগেই জা পল রেনোয়ার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে এবং তাঁর নির্মীয়মাণ ছবি 'রিভারে'র পর্যবেক্ষক হবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

সত্যজিৎ নিজের প্রথম ছবির জন্য বেছে নেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'। সামান্য কিছু অংশ শুটিঙের পর টাকার অভাবে ছবির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরে স্ত্রীর এগিয়ে আসা অর্থসাহায্য ও পশ্চিমবঙ্গের তৎকলীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায়তায় 'পথের পাঁচালী' ছবি শেষ করেন। কোন বড়

তারকা ছাড়া একেবারে প্রায় নবাগত কলাকুশলীদের নিয়ে শেষ করেন 'পথের পাঁচালী'। ১৯৫৫ সালে সেই ছবি মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া পড়ে যায় গোটা দেশের চলচ্চিত্রপ্রেমিদের মধ্যে। শিল্পরসিক মহলও একেবারে অন্যধারার ছবি 'পথের পাঁচালীর' কালজয়ী গুরুত্ব অনুধাবন করেন। সংবাদপত্রের সমালোচনায় উচ্ছসিত প্রশংসা করা হয়। পরের বছর ১৯৫৬ সালে 'পথের পাঁচালী' যায় কান চলচ্চিত্র উৎসবে। সেখানে শ্রেষ্ঠ মানবতার দলিলের পুরস্কার জিতে নেয়। রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে ভূষিত হয় ছবিটি। ১৯৫৭ সালে তৈরি করেন পরের অধ্যায় নিয়ে 'অপরাজিত'। এই ছবিটিও বিদেশে পুরস্কৃত হয়। অসামান্য এই ছবিটি সত্যজিৎ রায়ের এক অনবদ্য সৃষ্টি।

'পথের পাঁচালী' ছিল অপুর বাল্যকাহিনী। বালক অপুর পথ চলার আখ্যান। গ্রামীণ পটভূমিতে ছোট্ট অপুর মানসলোকের বিস্ময়, আবেশ, বড় হয়ে ওঠার সাংসারিক অনটন ও জীবন কৌতুহল চিত্রিত। 'অপরাজিত' ছিল কিশোর অপুর বড় হয়ে ওঠার কাহিনী। শৈশবের ভিটের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে অপু এগিয়ে যায় শহরের দিকে। এইখানেই বড় হয়ে ওঠে তার অপরাজিত সত্ত্বা। অসম্ভব সম্পূর্ণ চিত্রনাট্যে ছবির অন্তরর্নিহিত মেজাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছিলেন সত্যজিৎ রায়। শুটিঙের জন্য বারাণসী, গ্রামের ভিটে, কলকাতা এই তিনটি জায়গারই দৃশ্যাবলীর সঙ্গে সঙ্গে অপুর জীবনের যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক তা অত্যন্ত অর্থবহ ও সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অন্যদিকে 'অপুর সংসার' যুবক অপুর জীবনকাব্য। তার ভালবাসা ও যন্ত্রণার মিশ্রণে একাকার বেদনা বিধুর জীবনকাহিনী। অপুর চাকরি খোঁজা, রোমান্টিকতা, অপর্ণার মৃত্যু, অপুর নিরুদ্দেশে যাওয়া এবং তারপর আবার ছেলে কাজলের কাছে ফিরে এসে তাকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া সবকিছুর মধ্যেই রয়েছে পথ চলা এবং অস্বীকার করতে চাওয়া শিকড়ের কাছে ফিরে আসা। ছবিটি দেশে বিদেশে উচ্চ প্রশংসা পায়। আজও সিনেমাপ্রেমীর মনের মধ্যে বেঁচে আছে অপুর সংসার। অসামান্য ফোটোগ্রাফী, মিউজিক ও অভিনয়ের দলিল এই চলচ্চিত্র।

'পরশপাথর' (১৯৫৭) সত্যজিৎ রায়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য ছবি। এক অপূর্ব ফ্যানটাসি তৈরি করেছেন এই ছবিতে। একজন অত্যন্ত নিম্নবিত্ত মানুষ হঠাৎ বড়লোক হলে কী হতে পারে তারই সার্থক চিত্রায়ন হয়েছে পরশ পাথরে। নিখুঁত চিত্রনাট্য, উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রয়োগ ও ক্যামেরার দৃষ্টিকোণের সঠিক ব্যবহার ছবিটির শিল্পগুণ বৃদ্ধি করেছে। আবার 'দেবী' (১৯৬০) ছবিতে সত্যজিৎ রায় আধুনিক শিক্ষা ও ধর্মীয় কুসংস্কারকে একই সাথে উপস্থাপিত করেছেন যেখানে একজন মানুষ তার নিজের পুত্রবধূর মধ্যে দেবীত্ব আরোপ করে দেবীপূজায় মেতে উঠেছেন। সংস্কার ও অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার সংঘাত খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন পরিচালক এই ছবিতে। এরপর রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকীতে তৈরি করলেন 'তিনকন্যা' (১৯৬১)। রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোট গল্প নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি। তিনটি গল্পে রয়েছে তিনটি কন্যার কাহিনী। প্রথম গল্প মণিহারা, দ্বিতীয় গল্প পোষ্টমাস্টার এবং শেষ গল্প সমাপ্তি। তিনটি গল্প তিনটি মেজাজের। মণিহারায় নারীর একাকিত্ব ও অলংকার প্রতি, পোষ্টমাস্টারে একজন শহুরে শিক্ষিত মানুষের গ্রামীণ পটভূমিকায় একটি মেয়ের সঙ্গে গভীর মানবিক সম্পর্কের টানাপড়েন আর সমাপ্তিতে বর্হিমুখী চপল কিশোরীর ধীরে ধীরে একজন মেয়ে হয়ে ওঠার গল্প অসাধারণ চিত্রভাষায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন সত্যজিৎরায়।

১৯৬২ তে করলেন 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'। দার্জিলিংএর প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কত নিবিড়ভাবে প্রভাবিত হয় তাই এই ছবির মুখ্য বিষয়। ১৯৬৩ তে তৈরি করেন 'মহানগর'। নরেন্দ্র মিত্রের নাগরিক কাহিনী নিয়ে এই ছবিতে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের এক বন্ধুর নীতিবোধ ও সংগ্রামের চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন নাগরিক জীবনের প্রেক্ষাপটে। এরপর ১৯৬৪ তে নির্মিত হয় ''চারুলতা', রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড় গল্প অবলম্বনে। এটি সত্যজিৎ রায়ের এক বিরল কুশলী সৃষ্টি। পুরোপুরি রাবীন্দ্রিক যুগের প্রেক্ষাপটে নারী পুরুষের এবং সমস্ত মানবিক সম্পর্কের জটিলতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন সিনেমার ভাষায়, প্রতীকি ব্যঞ্জনায় ও চিত্রকল্পে। ১৯৬৬ সালে করেন নায়ক। চিত্রতারকা উত্তমকুমারকে নাম ভূমিকায় রেখে একজন সিনেমার হিরোর ব্যক্তিজীবনের অভিঘাত, সংশয়, হতাশা, বেদনাকে দক্ষতার সঙ্গে চিত্রায়িত করেছেন। সামাজিক গভীর বিষয়ের বাইরেও তাঁর ছবির ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়ে ছোটদের জগতেও। ১৯৬৮ তে দাদু

উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর কাহিনী অবলম্বনে ছোটদের জন্য অসামান্য এক ছবি গুপী গাইন বাঘা বাইন তৈরি করলেন। আবহসংগীত ও সঙ্গীত এই ছবির এক বিরাট সম্পদ।

১৯৬৯ সালে তৈরি করলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে অরণ্যের দিনরাত্রি। ১৯৭০ সালে তৈরি হল প্রতিদ্বন্দ্বী। নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তোলা এই ছবিতে সত্তরের দশকের অস্থিরতা, সংকট ফুটে উঠেছে। ১৯৭৩এ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী নিয়ে তৈরি হয় দুর্ভিক্ষের ছবি 'অশনিসংকেত'। দুর্ভিক্ষের বাস্তবতা, অসময়ের সংকট, মানুষের অসহায়তা, প্রেম, ভালবাসা ও প্রকৃতি উঠে এসেছে অত্যন্ত সুনিবিড় ভাবে। এরপর ১৯৭৪ এ নির্মিত হয় 'সোনার কেল্লা', ১৯৭৫ এ 'জনঅরণ্য' হয়ে ওঠে এক বিশেষ সময়ের দলিল। বহু ছবির মধ্যে এরপর তার উল্লেখযোগ্য ছবিগুলি হল 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি' (১৯৭৮), 'হীরকরাজার দেশে' (১৯৮০), 'ঘরে বাইরে' (১৯৮৪), 'জয়বাবা ফেলুনাথ', 'গণশত্রু' (১৯৮৯), 'শাখাপ্রশাখা' (১৯৯০) ও 'আগন্তুক' (১৯৯১)। তাঁর প্রতিটি ছবিতেই নিজস্ব শৈলীর ছাপ রয়েছে। বিশেষ করে শেষ ছবি 'আগন্তুকে' তার জীবনদর্শন বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে, আগন্তুকরূপী উৎপল দত্তের আচরণে ও সংলাপে।

সত্যজিৎ রায় কয়েকটি বেশ তথ্যচিত্রও নির্মাণ করেছেন। তাঁর প্রথম সার্থক তথ্যচিত্র 'রবীন্দ্রনাথ'। এই স্বল্প দৈর্ঘের তথ্যচিত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের জীবনকে বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতন বহুমুখী প্রতিভার দীর্ঘ জীবনকে স্বল্পপরিসরে ব্যক্ত করা খুবই কঠিন। কিন্তু সত্যজিৎ রায় এই অসাধ্যসাধন করেছেন অত্যন্ত সাবলীলভাবে অনায়াস দক্ষতায়। তার অন্য কয়েকটি তথ্যচিত্রের মধ্যে রয়েছে 'ইনার আই', 'বালা', 'সিকিম' এবং 'সুকুমার রায়'। এছাড়াও চলচ্চিত্র বিষয়ক বেশ কিছু প্রবন্ধও লিখেছেন। 'বিষয় চলচ্চিত্র' এবং 'আওয়ার ফিল্মস, দেয়ার ফিল্মস' খুবই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সত্যজিৎ রায় ভারতীয় সিনেমাকে যেভাবে সমৃদ্ধ করেছেন তার তুলনা নেই। শ্যাম বেনেগাল তার জীবন নিয়ে তথ্য চিত্র তৈরি করেছেন। অস্কার সম্মানে ভূষিত, বিশ্ববরেণ্য এই চলচ্চিত্রকার ভারতের গর্ব।

৪.২.৩ ঋত্বিক ঘটক

ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক দুর্দম খামখেয়ালি 'দামাল শিশু' হলেন ঋত্বিক ঘটক। সমস্ত হিসেবের বাইরে উজ্জ্বল সৃজনশীলতার চমকে, মানবিক আবেদনের দীপ্তিতে, কথায়, ছবিতে, সংগীতে তৈরি করেছেন চলচ্চিত্রের গদ্য পদ্য ও প্রবন্ধ। 'নাগরিক' থেকে 'যুক্তি তর্ক গল্পে' যে উত্থান এবং বিন্যাস ঘটেছে তার মধ্যে কখনো মূর্ত হয়েছে কবিতা, কখনও গদ্য আবার কখনও দার্শনিক উপলব্ধি। প্রত্যেকটি ছবিতেই ফুটে উঠেছে স্বাতন্ত্র, সামাজিক সচেতনতা এবং নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার সযত্ন প্রয়াস। ভারতীয় চলচ্চিত্রে তিনি এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেছেন যাকে সহজেই ঋত্বিক ঘরানা বলে চিহ্নিত করা যায় এবং তাঁর প্রভাব আজও বহমান।

ছবি সৌজন্যে-Wikipedia

ঋত্বিক ঘটকও ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, অনুবাদ সাহিত্য, নাট্য আন্দোলন ও অভিনয়, চলচ্চিত্র পরিচালনা প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে ছিল তার অবাধ বিচরণ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি তার প্রতিভার নিজস্ব মৌলিকতার ছাপ রেখে গেছেন। প্রতিটি শিল্প ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন পুরোমাত্রায় সৃজনশীল। বলা যেতে পারে এক বিশেষ বৌদ্ধিক চেতনা সতত প্রভাবিত করেছে তার শিল্পকর্মকে। তার প্রাথমিক শিল্পী সত্তার প্রথম প্রকাশ ঘটে কবি হিসেবে। অল্পদিনের মধ্যেই কবিতা ছেড়ে কথাসাহিত্য, তারপরে নাটক এবং অভিনয় এবং সবশেষে চলচ্চিত্র পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত হন। সব সময়ই লক্ষ্য ছিল কি করে মানুষের একদম কাছে পৌছনো যায়, একটা মাধ্যম থেকে আর একটা মাধ্যমে হাত দিয়েছেন কেবলমাত্র এই একই পোঁছে দেওয়ার তাগিদে। কোন একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন মানুষের কাছেই নিজের বক্তব্যকে আরও ভালভাবে পৌঁছে দেবার জন্যই তিনি সাহিত্য থেকে নাটকে এসেছেন। তারপর একদিন নাটক থেকে সিনেমায় এলেন। এরপর বলেছেন যদি এমন কোন মাধ্যম আবিস্কার হয় যা তাকে মানুষের আরও কাছাকাছি নিয়ে যাবে তাহলে সেদিন ছুঁড়ে ফেলে দেবেন সিনেমাকে এবং স্বাগত জানাবেন ঐ নতুন মাধ্যমকে। সিনেমা তার কাছে মানুষের কথা বলে মানুষের কাছে পৌঁছানোর একটি শক্তিশালী শিল্প মাধ্যম ছাড়া কিছু নয়।

প্রথম ছবি 'নাগরিকে'র কাজ শুরু হয় ১৯৫০ - ৫১ সালে। বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে অতি সামান্য অর্থে তৈরি করেন এই ছবি। কিন্তু ছবিটি সেই সময় মুক্তিলাভ করেনি। ছবির বিষয়বস্তু হল এক টুকরো নিশ্চিন্ত জীবনের সন্ধানে এক যুবক নাগরিকের জীবন পরিক্রমার গল্প। যুবকটি স্বপ্ন দেখে সে চাকরি পাবে। সুখী করবে প্রিয়জনদের। চাকরির ইনটারভিউ দেয়, কিন্তু চাকরি হয় না। আবার ইনটারভিউ দেয় কিন্তু এবারেও চাকরি হল না। হতাশা আসে আর সেখান থেকেই এক বৃহত্তর উপলব্ধি আসে যে তৎকালীন সামাজিক কাঠামোয় এই হতাশা শেষ হবার নয়। এমনি অসহায় দুটি ছেলে মেয়ে এরপরও একসঙ্গে সংগ্রাম করে বাঁচতে চায়। দেশভাগের পর সেই সময়ের ক্ষয়িষ্ণু নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের বাস্তবচিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন ঋত্বিক ঘটক এই ছবিতে। ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৭৭ সালে।

পরের ছবি 'অযান্ত্রিক'। মুক্তি পায় ১৯৫৭ সালে, যা ছিল দর্শকদের সঙ্গে তার প্রথম সরাসরি পরিচয়। এই ছবিটি সাদরে গৃহীত হল এবং শিল্পানুরাগী দর্শকমহলে আলোড়ন ফেলে দিল। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গিমায় নিও - রিয়ালিজিমের ব্যবহার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বিখ্যাত চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক জর্জ সার্দুল এই ছবিটিকে অসামান্য এক যুগান্তকারী ছবি বলে বর্ণনা করেছিলেন। সুবোধ ঘোষের ছোট গল্প নিয়ে এই ছবিতে একজন ড্রাইভার কীভাবে তার মোটর গাড়িটিকে ভালবাসছে তারই কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের গভীরতা কী হতে পারে তা সমস্ত দৃশ্য পরিকল্পনায়, আবহ সংগীতে, অভিনয়ের মাধ্যমে এক অপরূপ শিল্পরসের সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তী ছবি 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' ১৯৫৮ সালে।শিবরাম চক্রবর্তীর গল্প অবলম্বনে ছোটদের জন্য একটি চমৎকার উপভোগ্য ছবি। একটি শিশুর চোখ দিয়ে কলকাতা মহানগরকে দেখানোর মধ্যে গভীর জীবনবোধ যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি রয়েছে সংলাপের নাটকীয়তা, দৃশ্যের উপভোগ্যতা এবং স্বাভাবিক অভিনয়ের স্বতঃস্ফূর্ততা।

এরপর তিনি ১৯৫৯ সালে তৈরি করলেন 'মেঘে ঢাকা তারা', যা এযাবৎ কালের একটি যুগান্তকারী ছবি। এখনও সমানভাবে মানুষকে মোহিত করে এই ছবি। নাটকীয়তায়, আবেগের স্বতঃস্ফূর্ততায়, মানবিক আবেদনে এবং দৃশ্য ও সংগীতের অনির্বচনীয় মেলবন্ধনে এই ছবি ক্লাসিক পর্যায়ের ছবিতে উন্নীত হল। দেশবিভাগের অনিবার্য বাস্তবতা নিয়ে এমন ছবি এর আগে কখনও হয়নি। নিমাই ঘোষের ছিন্নমুলের ডকুমেন্টেশনের উত্তরাধিকার ছিল এই ছবিতে। শুধু ডকুমেন্টেশন নয় এর সঙ্গে ছিল কাহিনীচিত্রের শৈল্পিক নির্মাণ যা দর্শকের মনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে যায়। এই ছবি থেকেই শুরু হয় এক বিশেষ পর্বের চিত্রনির্মাণ। দেশভাগ এবং উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে যে ট্রিলজি তৈরি করেছিলেন

ঋত্বিক তার প্রথম ছবি ছিল 'মেঘে ঢাকা তারা'। পরের ছবি দুটি হল যথাক্রমে 'কোমল গান্ধার' এবং 'সুবর্ণরেখা'। ১৯৬০এ 'কোমল গান্ধার' তৈরি হয়। ১৯৬১তে নির্মিত হয় 'সুবর্ণরেখা'। 'কোমলগান্ধার'এ একটি নাটকের দলের সদস্যদের দলাদলি, স্বার্থপরতা, অহংবোধ, সংকীর্ণতা এবং একই সঙ্গে পরস্পর নির্ভরশীলতা, মৈত্রী, সহযোগিতা চিত্রিত হয়েছে এই ছবিতে। দেশ বিভাগের সুগভীর বেদনা ও যন্ত্রণাও উঠে এসেছে ছবির অনুষঙ্গ হয়ে। তাঁর ছবিতে নাটকিয়তার বাহুল্য নিয়ে বহু কথা হয়েছে এবং বহু সমালোচকরা এই নাটকীয়তাকে মেনে নিতে পারেন নি। কিন্তু জীবনে পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা নাটক খুব অস্বাভাবিক কিছুও নয়। বিশেষত দেশবিভাগের পরবর্তী বছরগুলোতে শিকড় উপড়ানো মানুষগুলোর দুঃখ যন্ত্রণার শেষ ছিল না। সেই সময় বহু উদ্বাস্তু মেয়েরই জায়গা হয়েছিল নিষিদ্ধ পল্লীতে 'সুবর্ণরেখা'র গল্পের মতন। ঋত্বিক মানব জীবনকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। স্বপ্ন দেখতেন যথার্থ শিল্পীর মতো। তাই তিনি হতাশার, নিরাশার ছবিতেও তৈরি করেন সেই ইমেজ যা শেষমেশ ভোরের আলোর দিকে চেয়ে থাকতে বলে।

এছাড়াও ১৯৬৬ থেকে ১৯৭২এর ভেতর ছয়টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি করেছেন। এগুলি হল ফিয়ার (১৯৬৬), সায়েন্টিস অফ টুমরো (১৯৬৭), ছৌ ডান্স অ পুরুলিয়া (১৯৭১), আমার লেলিন (১৯৭১), দুর্বার গতি পদ্মা (১৯৭১)। তার অসমাপ্ত ছবিগুলি হল কত অজানারে, বগলার বঙ্গদর্শন। এরপর ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের আমন্ত্রণে সেখানে গিয়ে তুললেন অদ্বৈত মল্লবর্মণের বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে 'তিতাস একটি নদীর নাম'। রঙের ব্যবহারে, চিত্রগ্রহণের অভিনব কলাকৌশলে উঠে আসে এক ব্যাপ্ত জীবনের ছবি। একসঙ্গে বহু মানুষের এমন বেঁচে থাকার সংগ্রাম বাংলা সিনেমায় এর আগে কখনও চিত্রিত হয়নি। জেলেরা কেমনভাবে বাঁচে, লড়াই করে বাঁচার জন্য , কী সুর ভেসে বেড়ায় মালোপাড়ায় তা সঠিকভাবে ধরেছেন ঋত্বিক এই ছবিতে। অনন্ত এক আশার বোধ ঘুরে ফেরে এক ছবি থেকে আর এক ছবিতে। 'সুবর্ণরেখা' থেকে 'তিতাস' এই আশার আলো দিয়েই শেষ করেছেন তিনি। 'সুবর্ণরেখা'য় সীতার ছেলের হাত ধরে সীতার দাদা পাহাড় ঘেরা শান্ত জীবনের দিকে এগিয়ে যায়। 'তিতাসে' মৃত্যুপথযাত্রী বাসন্তীর স্বপ্নের দৃশ্যে তিতাসের ধারে শস্য খেতে ঢেউ ওঠে আর তার মধ্যিখান থেকে ছুটে আসে বাঁশি বাজিয়ে একটি ছোট্ট ছেলে। অপরূপ কল্পনায় স্থিরচিত্র, চলচ্চিত্র একাকার হয়ে যায় ।তাঁর শেষ ছবি 'যুক্তি তর্ক গপ্পো'। প্রধান চরিত্রে ঋত্বিক নিজেই অভিনয় করেছিলেন।

তাঁর সমস্ত সিনেমায় প্রতিফলিত হয়েছে নিজের জীবন, বিশ্বাস, অসহায়তা ও জীবনের প্রতি গভীর ভালবাসা। শিল্পী হিসেবে তিনি ছিলেন মূলত সত্যনিষ্ঠ। এই বিশ্বাসই তাকে ক্লাসিক পর্যায়ের ছবি তৈরি করতে উৎসাহিত করেছে। রূঢ় সত্যকে তুলে ধরার জন্য প্রয়োজন মতো আঙ্গিক বা ফর্মের পরীক্ষা - নিরীক্ষা তিনি করেছেন। প্রতিটি ছবিতেই রয়েছে তার নিজস্ব শিল্পভাবনার ছাপ যা ভীষণ সমকালীন ও প্রাসঙ্গিক। বক্তব্যে, আঙ্গিকে, সংগীতের মেলবন্ধনে যে শিল্পসৃষ্টি তিনি করেছেন তা ভারতীয় সিনেমায় তৈরি করেছে এক নতুন অধ্যায়। ভাবী কালের জন্য তিনি রেখেছেন সত্যনিষ্ঠ বাস্তবধর্মী মহান শিল্পরূপ যা দেখে মানুষ চিন্তার ভাবনার খোরাক পাবে।

৪.২.৪ মৃণাল সেন

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতীয় চলচ্চিত্রের আর এক বিশিষ্ট নয়া বাস্তববাদী পরিচালক হলেন মৃণাল সেন। সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটকের পাশাপাশি অন্যরকম নিজস্ব জায়গা তিনি করে নিয়েছিলেন সম্পূর্ণ স্বকীয় সৃজন ক্ষমতায়, সমাজভাবনায়। ভারতীয় সিনেমায় তিনি এনেছেন নতুন রূপ, নতুন আঙ্গিক, নতুন সমাজবাস্তবতা। রাজনৈতিক সচেতন একটা

সম্পূর্ণ নতুন ধারার সিনেমা বিকশিত হয়েছে তার হাতে। মৃণাল সেনের সমাজ দর্শন তার একেবারে নিজস্ব। শিল্পরচনা তার কাছে কেবল শিল্পের প্রয়োজনেই নয় বরং সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সাথী ওঠায়। সমাজ বাস্তবতাকে তিনি বিশ্লেষণ করেন নিজস্ব স্টাইলে, শিল্পরূপের নির্মাণ করেন এক বিশেষ দার্শনিক বোধের ওপর ভিত্তি করে। ১৯৫৫ থেকে তিনি বেশ কিছু ছবি তৈরি করেছেন এবং প্রতিটি ছবিতেই ঘটেছে এক সমান্তরাল উত্তরণ পর্ব।

ছবি সৌজন্যে-Wikipedia

প্রথম ছবি 'রাতভোর' (১৯৫৫).পরের ছবি 'নীল আকাশের নীচে' (১৯৫৭)। এই ছবির মাধ্যমেই তিনি প্রথম দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। মহাদেবী ভার্মার ছোট গল্প অবলম্বনে এই ছবিতে এক চীনা ফেরিওয়ালার গল্প বলা হয়েছে যে কলকাতার এক শিক্ষিত মহিলার সঙ্গে নিছক বন্ধুত্বের টানে জড়িয়ে পড়ে। ভাই বোনের মধ্যে যে বন্ধুত্ব তৈরি হয় তা ছবিটির আবেদন অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়। পরের ছবি 'বাইশে শ্রাবণ' (১৯৫৯)। এই ছবিতে প্রথম দেখা যায় তাঁর সুগভীর বাস্তববোধ। গ্রামের পুরুষ শাসিত সমাজের একটি সাধারণ দম্পতির করুণ কাহিনী পরিচালক চিত্রিত করেছেন। নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন যন্ত্রণা, সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার লড়াই অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন পরিচালক। এ ছবিতে আছে ১৩৫০ এর দুর্ভিক্ষের পটভূমিকা। চিত্রকল্প ও মন্তাজ সৃষ্টিতে বাইশে শ্রাবণের কিছু কিছু অংশ অনবদ্য। তাঁর পরের ছবি 'পুনশ্চ' (১৯৬১)। শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারের এক দাম্পত্য সমস্যাকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এরপর ১৯৬৫ সালে তৈরি করলেন 'আকাশ কুসুম'। এই ছবিতে গল্প বলার ভঙ্গিমা নিয়ে তিনি কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন প্রথাগত শুরু শেষের খেয়াল না রেখে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষের যেমন তেমন করে হটাৎ বড়লোক হওয়ার বাসনাকে আক্রমণ করেছিলেন। সামাজিক মূল্যবোধকে সামনে রেখে বেশ কিছু প্রশ্ন তুলেছিলেন। ছবিটি নিয়ে বিশেষ বিতর্ক তৈরি হয়েছিল এবং তাতে স্বয়ং সত্যজিৎ রায়ও যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

১৯৬৬ সালে তুললেন ওড়িয়া ভাষায় 'মাটির মানুষ'। কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীর উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি এই ছবিতে গ্রামের যৌথ পরিবারের ভেঙে যাওয়ার গল্প রয়েছে। সনাতন ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক মূল্যবোধের সংঘাত সাফল্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। ১৯৬৯ সালে তৈরি করলেন 'ভুবন সোম'। এই ছবিটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা পায় এবং জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়। এই ছবিতে তিনি এক সম্পূর্ণ নতুন চলচ্চিত্র ভাষা ব্যবহার করেন। গল্পের বিষয়বস্তুকে

এক অপরূপ চিত্রভাষায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এক দাম্ভিক ব্যুরোক্রাট কীভাবে এক সরল গ্রামবধুর সংস্পর্শে এসে জীবনকে নতুনভাবে উপলব্ধি করলেন তাই বলা হয়েছে এক মনোরম শৈলীতে যা যথার্থই ভারতীয় সিনেমায় নিয়ে আসে নবতরঙ্গ বা নিউ ওয়েভ।

১৯৭০ থেকে মৃণাল সেন দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্যরকম ছবি তৈরি করতে শুরু করেন। রূপকের আড়াল থেকে সরে এসে চলচ্চিত্রে তিনি সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে সমকালীন বাস্তবতাকে নিয়ে এলেন এবং সামাজিক অন্যায়ের প্রতি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। 'ইনটারভিউ' ছবিতে একটি বেকার ছেলে চাকরি পায় না। ইনটারভিউ দিতে গিয়ে অবান্তর প্রশ্নের মুখোমুখি হয়। ব্যর্থতাবোধই তাকে নিয়ে যায় নবতর উপলব্ধিতে। গল্প বলার একঘেয়ে গতানুগতিকতা থেকে একটু সরে এসে চিত্রভাষায় এক নতুন মাত্রা যোগ করলেন। বেকার ছেলেটি বেকারত্বের জন্য আক্রোশে, ক্রোধে ফেটে পড়ে সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে। শো কেসের কাঁচ ভেঙে চুরমার করে ফেলে একটি পোষাকের মডেলকে। প্রতীকি ব্যঞ্জনায় অসামান্য চিত্রকল্প তৈরি করেন পরিচালক। 'কলকাতা "৭১' (১৯৭২) ছবিতে সেই সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। পাঁচটি আলাদা আলাদা গল্পের মধ্য দিয়ে এক বিশেষ সামাজিক ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে এই ছবিতে। ভাবনাটি উঠে আসছে একটি যুবকের দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজের ইতিহাস হল শোষণ, বঞ্চনা, দারিদ্র, সামাজিক অন্যায়ের ও অবিচারের পুনরাবৃত্তির ইতিহাস। এরপর ১৯৭৩ এ তৈরি হয় 'পদাতিক'। মৃণাল সেনের রাজনৈতিক মননের যথার্থ পরিচয় পাওয়া গেল এই ছবিতে। ছবিটির পটভূমি কলকাতার আন্দোলন উদ্বেলিত নাগরিক জীবন। জেল পালানো এক তরুণ বিপ্লবী আশ্রয় নেয় এক মহিলার ফ্ল্যাটে এবং ক্রমে আত্মবিশ্লেষণের দৃষ্টিতে বিচার করতে চায় রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে, ব্যর্থ বিপ্লবের প্রয়াসকে। ভারতীয় চলচ্চিত্রে এমন সাহসিক প্রযোজনা এর আগে আর হয়নি। ইন্টারভিউ, কলকাতা " ৭১ এবং পদাতিক কে একত্রে ধরা হয় মৃণাল সেনের ত্রয়ী রাজনৈতিক চলচ্চিত্র।

পদাতিকের পরে মৃণাল সেনের উল্লেখযোগ্য ছবি হল 'কোরাস'। এই ছবিটিও ফ্যান্টাসীর সঙ্গে সমকালীন বাস্তবতাকে নিপুণ দক্ষতায় মিশিয়ে নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক ছবি। বুদ্ধিদীপ্ত উন্নত ফটোগ্রাফী, অসাধারণ কিছু সিকোয়েন্স এবং চলচ্চিত্র ভাষার সুনিপুণ প্রয়োগ 'কোরাস'কে এক মহৎ চলচ্চিত্রে পরিণত করেছে। শোষণের সঙ্গে পুঁজিপতিদের সংঘাত জন্ম দিয়েছে এক ঐক্যতানের যার নাম কোরাস। কোরাসের পরবর্তী ছবিগুলিতে আমরা এক ভিন্ন ধরনের সুরের সন্ধান পাই। পরশুরাম, ওকাউরি কথায় দেখি শ্রমজীবি মানুষ, নিচুতলার মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম। চলচ্চিত্রে জীবন অ রাজনৈতিক সংগ্রামের কাহিনী থাকলেও মৃণাল সেন তাঁর আত্ম বিশ্লেষণমূলক অভিজ্ঞতায় আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেন। 'আকালের সন্ধানে'ও সেই আত্মসমীক্ষা ও মূল্যবোধের সংকটের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে ওঠে। আবার ব্যবহারিক আঙ্গিকগত দিক দিয়েও সিনেমার মধ্যে সিনেমা নিয়ে এসে এক অসামান্য চমক তৈরি করেন। অন্যান্য ছবি 'একদিন প্রতিদিন', 'খন্ডহর', 'চালচিত্র', 'মহাপৃথিবী', 'অন্তরীণে'ও সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণক্রিয়াকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেন তিনি। 'একদিন প্রতিদিন' ছবিতে হঠাৎ একদিন একটি মেয়ের বাড়ী না ফেরাকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া উত্তেজনা , দুশ্চিন্তা, ঈর্ষা, দ্বেষ, মানবিক সহানুভূতি কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে তারই বিশ্লেষণ করেছেন। 'খণ্ডহরে' আবার চিত্রিত করেছেন একটি মেয়ের সুগভীর আশা নিয়ে বেঁচে থাকার কাহিনী। ধ্বংসস্তুপ প্রায় একটি বাড়ির প্রেক্ষাপটে মেয়েটির অনাগতের জন্যর প্রতীক্ষা এক সুন্দর রূপকের সৃষ্টি করে। 'মহাপৃথিবী' ও 'অন্তরীণে' তিনি প্রবেশ করেন মানুষের গভীর মননের বিশ্লেষণে। আবার 'আমার ভুবন' ছবিতে তিনি এযাবৎ ছবিতে অবহেলিত মুসলমান সম্প্রদায়ের জীবনধারাকে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন এক বিশেষ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে। কবিতার মতো উদ্ভাসিত হয়েছে ভালবাসার জীবন। মৃণাল সেনের দীর্ঘ চলচ্চিত্রজীবনে চলচ্চিত্র তৈরির পরিক্রমায় ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রভূতভাবে সম্পদশালী হয়েছে। তিনি নিজেই তৈরি করেছেন তাঁর নিজের

ঘরানা। সমাজ চিত্রায়নে, রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণে, মানবিক সম্পর্কের অনুসন্ধানে তিনি এক নতুন ধরনের ছবি তৈরির প্রেক্ষাপট তৈরি করেছেন যা সব দিক দিয়েই একান্ত নিজস্ব। প্রয়োজনীয় নাটকীয়তা সৃষ্টিতে, মন্তাজের সুষম ব্যবহারে, চিত্রকল্প তৈরির অনির্বচনীয় দক্ষতায় তিনি একজন সৃজনশীল সামাজিক দায়বদ্ধ পরিচালক হয়ে উঠেছেন।

৪.২.৫ তপন সিংহ

বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক উজ্জ্বল স্বকীয় নক্ষত্র তপন সিংহ। সাধারণ দর্শকের প্রতি এক বিশেষ দায়বদ্ধতা থেকে তিনি চলচ্চিত্র তৈরি করেছেন। সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন যখন একের পর এক অসামান্য এবং মেধাবী চলচ্চিত্র নির্মাণ করে হৈচৈ ফেলে দিচ্ছেন ঠিক তখনই তপন সিংহ একেবারে অন্য মেজাজে ছবি তৈরি করে সাধারণ দর্শকদের মন জয় করে চলেছেন। তার ছবিগুলি এক দিকে যেমন জমিয়ে বৈঠকি গল্প বলে, ঠিক তেমনি অপরদিকে ক্যামেরায়, সংগীতে এবং শব্দ সংযোজনায় সৃষ্টি করে কাব্যময় অপরূপ চিত্রভাষা। দীর্ঘ চার দশক ধরে তিনি বহু চলচ্চিত্র তৈরি করেছেন যা দেখে আপামর সাধারণ দর্শক মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছে।

ছবি সৌজন্যে-Wikipedia

জীবনের শুরুর দিকে তপন সিংহ নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে এসেছিলেন মূলত শব্দযন্ত্রী হিসেবে। পরে হন চলচ্চিত্র পরিচালক। একের পর এক অসাধারণ ছবি তৈরি করেন। চলচ্চিত্রকার হিসেবে তার উত্তরণ ঘটতে থাকে প্রতিটি ছবির সাথেই। দীর্ঘকাল ধরে ছবি করেছেন। এক একটি ছবির বৈচিত্রের সন্ধানে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ছিল অনায়াস বিচরণ। স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তার ক্ষমতার ব্যপ্তি, গভীর মনন ও সৃজনশীলতার পরিচয়। রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে এ প্রজন্মের বহু বিখ্যাত গল্প, উপন্যাস নিয়ে তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য অবলম্বনে তিনি তিনটি অসাধারণ ছবি নির্মাণ করেছিলেন। ১৯৫৭ সালে 'কাবুলিওয়ালা', ১৯৬০এ 'ক্ষুধিত পাষাণ' এবং ১৯৬৫ সালে তৈরি করেন 'অতিথি'। এই তিনটি চিত্রায়ণে 'কাবুলিওয়ালা' ছবিতে তিনি যেমন মানবিক সম্পর্ককে তুলে ধরেছিলেন, 'অতিথি' ছবিতে তেমনি তুলে ধরেছেন অনন্য বাঁধনছেঁড়া মুক্তির এক জীবন দর্শন যা সর্বদাই ছুটে বেড়ায়। তপন সিংহের পরিচালিত ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল টনসিল (১৯৫৬), কাবুলিওয়ালা (১৯৫৭), লৌহকপাট (১৯৫৮), ক্ষণিকের অতিথি (১৯৫৯), ক্ষুধিত পাষাণ (১৯৬০), ঝিন্দের বন্দী (১৯৬১), হাঁসুলিবাকের উপকথা (১৯৬২),

নির্জন সৈকতে (১৯৬৩), জতুগৃহ (১৯৬৪), আরোহী (১৯৬৪), অতিথি (১৯৬৫), গল্প হলেও সত্যি (১৯৬৬), হাটেবাজারে (১৯৬৭), সাগিনা মাহাতো (১৯৭০), হারমোনিয়াম (১৯৭৬), বাঞ্ছারামের বাগান (১৯৮০), সবুজদ্বীপের রাজা (১৯৭৯), আতঙ্ক (১৯৮৬), এক ডক্টর কী মওত (১৯৯১), হুইল চেয়ার (১৯৯৪)। প্রথম ছবি ১৯৫৪ সালে অঙ্কুশ। দুটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছিলেন।একটি জগদীশ চন্দ্র বসুকে নিয়ে ১৯৫৮ সালে, অপরটি ১৯৬২ সালে 'আমার দেশ' চীন ভারতের যুদ্ধের সময় তৈরি করেছিলেন। স্বল্প দৈর্ঘ্যের কয়েকটি কাহিনীচিত্রও পরিচালনা করেছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে আদমি আউর আউরত (১৯৮২) , মানুষ (১৯৮৩) , শতাব্দীর কন্যা (১৯৯৬) , অভাগী (১৯৯৭) ইত্যাদি ছবি।

তপন সিহের ছবিতে গল্পই প্রধান। আখ্যানধর্মী কুশলী চিত্র নির্মাণকেই তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। বিখ্যাত গল্প উপন্যাসকে কেন্দ্র করে বহু ছবি তিনি তৈরি করেছেন।ক্যামেরায় গল্প বলতে বলতে তিনি মানবিক সম্পর্কের টানাপড়েনকে তুলে ধরেন। মানবিকতাই তার জীবন দর্শন, মানুষের ধর্মকেই তিনি সকলের উপরে স্থান দেন। 'কাবুলিওয়ালা' থেকে 'হুইলচেয়ার' সর্বত্রই তিনি গল্পের আখ্যানের মধ্য দিয়ে মানবিকতাকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। যদিও সিনেমার আঙ্গিক নিয়ে খুব বেশি পরীক্ষা - নিরীক্ষা তিনি করেননি। চমক তৈরি করার প্রচেষ্টা সচেতন ভাবে করেন নি। শুধুমাত্র জীবনদর্শনের গভীরতা দিয়ে এবং নান্দনিক বোধ দিয়ে দর্শকদের মন জয় করতে চেয়েছেন। শিক্ষিত মানুষদের কাছে তিনি সমাদৃত হয়েছেন।

ডার্ককমেডির প্রতি দুর্নিবার আগ্রহ ছিল তপন সিংহের। 'গল্প হলেও সত্যি' ছবিতে রবি ঘোষকে দিয়ে যে মজার ছলে জীবন শিক্ষা তিনি দর্শককে দিয়েছিলেন তার তুলনা আজও মেলা ভার। 'হাটে বাজারে' ছবিতেও আছে হাসির উপকরণ। 'হারমোনিয়াম' ছবিতে অনেক মুহূর্তে আছে যা অসামান্য হাস্যরসের যোগান দেয়। আবার সমকালের প্রতিও তিনি উদাসীন ছিলেন না। 'সাগিনা মাহাতো', 'আপনজন' তাঁর উজ্জ্বল প্রতিফলন। প্রত্যেকটি ছবিতেই তিনি সমাজ বাস্তবতাকে ঘটনার অভিঘাতে, সংলাপের নাটকীয়তায় এবং উপযুক্ত ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলে তুলে ধরেছেন। কখনও শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্বের সংকট, কখনও দিশাহীন তরুণ ছেলেমেয়েরা, আবার কখনও আধুনিক সমাজে বিচার ব্যবস্থার প্রহসন ও মেয়েদের বিপন্নতাকে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আবার 'হারমোনিয়াম' ছবিটির সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব তিনি ছিলেন। সেখানেও এই ছবিতে সংগীতই সবকিছুকে ছাপিয়ে যায়। এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে, এক সমাজ বাস্তবতা থেকে অন্যত্তর সমাজ বাস্তবতায় পৌছে যায় হারমোনিয়াম।

যে কোন মহৎ শিল্পীর মতো তপন সিংহ সহজবোধে চিত্রায়িত করেছেন বাস্তবতা এবং শিল্পকে। বাস্তবকে যখন তুলে ধরেছেন তখন তা একেবারে আটপৌরে বাস্তব ছবি, সকলের ধরা ছোঁয়ার মধ্যে। আবার যখন শিল্প নির্মাণ করেন তখনও তা এক সার্বজনীন ব্যাপ্তি নিয়ে সকলের বোধগম্য হয়ে ওঠে।

এঁদের ভিত্তিপ্রস্তরে গড়ে উঠেছে ভারতীয় চলচ্চিত্রের আজকের কাঠামো। এছাড়াও বহু পরিচালক তাঁদের নিজস্ব অবদান রেখে গেছেন সময়ে সময়ে।

৪.২.৬ রাজ কাপুর

ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রথম শো ম্যান, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রাজ কাপুর এর আত্মপ্রকাশ ১৯৩৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ইনকিলাব চলচ্চিত্রে মাত্র দশ বছর বয়সে। এরপর ১৯৪৮ সালে চব্বিশ বছরের যুবক রাজকাপুর নিজস্ব স্টুডিও প্রতিষ্ঠিত করেন আর. কে. ফিল্মস নামে। এর সাহায্যেই ঐ সময়ের সর্বকনিষ্ঠ পরিচালক হিসেবে উঠে আসেন ও

'আগ' চলচ্চিত্রে তিনি ও নার্গিস অভিনয় করেন। ১৯৪৯ সালে মেহবুব খানের 'আন্দাজ' চলচ্চিত্রে নার্গিস ও দিলীপ কুমারের সাথে তিনিও অভিনয় করেন। এই ছবিটিই তাঁকে প্রথম ব্যবসায়িক সফলতা দেয় এবং অভিনেতা হিসেবে তার প্রথম স্বীকৃতি লাভ এই ছবির হাত ধরেই। ঐ বছরের শেষদিকে চলচ্চিত্র নির্মাতা, পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে 'বারসাত' চলচ্চিত্রে অসামান্য সফলতা পান। আর.কে. ব্যানারের অধীনে নির্মিত ১৯৫১ সালে 'আওয়ারা', ১৯৫৫ সালে 'শ্রী ৪২০', ১৯৫৬ সালে 'চোরি চোরি' ও 'জাগতে রাহো' এবং ১৯৬০ সালে 'জিস দেশ মে গঙ্গা বেহতি হ্যায়ে'র মতন বেশ কিছুসংখ্যক ব্যবসায়িকভাবে সফল চলচ্চিত্র মুক্তিলাভ করে। ১৯৬৪ সালে তার নির্মিত, পরিচালিত ও অভিনীত আবেগঘন সঙ্গীতধর্মী চলচ্চিত্র 'সঙ্গম' মুক্তিলাভ করে। এটি তার নির্মিত প্রথম রঙিন চলচ্চিত্র ছিল।

ছবি সৌজন্যে-Wikipedia

১৯৭০ সালে তার নির্মাণে, পরিচালনায় ও অভিনয়ে উচ্চাভিলাষী চলচ্চিত্র 'মেরা নাম জোকার' মুক্তি পায় যা ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক এক্সপেরিমেন্টাল ছবি। এ চলচ্চিত্র নির্মাণে ছয় বছরের অধিক সময় ব্যয় হয়। কিন্তু এই চলচ্চিত্রটি বক্স অফিসে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থতা লাভ করে ও তার পরিবারে চরম আর্থিক বিপর্যয় বয়ে নিয়ে আসে। যদিও পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রটি ধ্রুপদী চলচ্চিত্রের মর্যাদা পায়। রাজ কাপুর বেশ কিছু সর্বভারতীয় পুরস্কারে ভূষিত হন। তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য তিনবার ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ও এগারোবার ফিল্মফেয়ার পুরস্কার পেয়েছেন। রাজকাপুরের সম্মানার্থে ও তাঁরই নামানুসারে ফিল্মফেয়ারএর আজীবন সম্মাননা পুরস্কারের নাম রাখা হয়। 'আওয়ারা' ও ১৯৫৪ সালের 'বুট পলিশ' কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রাইজের জন্য দুইবার মনোনয়ন পায়। 'আওয়ারা'য় তাঁর অনবদ্য অভিনয়শৈলীর স্বীকৃতি স্বরূপ টাইম ম্যাগাজিন সর্বকালের সেরা দশ অভিনেতার মধ্যে তালিকাভুক্ত করে।

১৯৬৫ ও ১৯৭৯ সালে যথাক্রমে ৪র্থ ও ১১তম মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। চলচ্চিত্র ও শিল্পকলায় অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৭৯ সালে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তাকে পদ্মভূষণ পদকে ভূষিত করা হয়। এছাড়াও ১৯৮৭ সালে ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভারতের চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ

সম্মাননা দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পান তিনি। মৃত্যু পরবর্তীকালে ১৪ ডিসেম্বর, ২০০১ তারিখে ভারতীয় ডাকবিভাগ তার সম্মানার্থে মুখমণ্ডলকে ঘিরে ডাকটিকেট প্রকাশ করা হয়। ২০১৪ সালে গুগল তার ৯০তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে স্মারক তুলে ধরে।

৪.২.৭ গুরু দত্ত

আর এক প্রতিভাবান চলচ্চিত্র অভিনেতা ও পরিচালক গুরু দত্তর জন্ম ১৯২৫ সালের ৯ জুলাই। তার ব্যক্তিগত জীবনের নাম ছিল বসন্তকুমার শিব শংকর পাড়ুকোন। দক্ষিণ ভারতের অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান তিনি। গুরু দত্ত ছিল তার চলচ্চিত্রের নাম। বাবা-মা দুজনেই শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেই উত্তরাধিকারের সাংস্কৃতিক আবহে বেড়ে ওঠেন তিনি। কলকাতার ভবানীপুরে শৈশব কাটে তার। তিনি বাংলা সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন। অনেকটা সেই জন্যই বাঙালি নাম গ্রহণ করে হয়ে গেলেন ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের নক্ষত্র গুরু দত্ত।

গুরু দত্ত ছিলেন একাধারে পরিচালক, প্রযোজক, চিত্রনাট্যকার ও অভিনেতা। এই চার ভূমিকাতেই তিনি ছিলেন সমান সফল। শুধু তাই নয় এটাও মনে করা হয় যে গুরু দত্ত এগিয়ে ছিলেন তার সময়ের চেয়ে। তাঁরই পরিচালিত 'পিয়াসা', 'কাগজ কে ফুল' ছবি দুটিকে বলা হয় ভারতীয় চলচ্চিত্রের শতবর্ষের ইতিহাসে অন্যতম সেরা দুই সৃষ্টি। তাঁর পরিচালিত বাকি ছবির মধ্যে রয়েছে 'বাজি', 'বাজ', 'আর পার', 'জাল', 'কাগজ কে ফুল', 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ফিফটিফাইভ', 'সয়লাব'। এছাড়াও ছবির প্রযোজনাতেও হাত দেন তিনি , প্রযোজক ছিলেন 'আর পার', 'সিআইডি', 'পিয়াসা', 'গৌরি', 'কাগজ কে ফুল', 'চৌধুরি কা চান্দ', 'সাহেব বিবি অউর গোলাম','বাহারে ফির ভি আয়েগি' ছবির। অভিনেতা হিসেবেও ছিলেন জনপ্রিয়। আজও বলিউডের বিষাদরাজা তিনিই। 'সাহেব বিবি অউর গোলাম'সহ বিভিন্ন ছবিতে তিনি অনবদ্য অভিনয় করেন।

তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি 'কাগজ কে ফুল' ছবি। এ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন ওয়াহিদা-গুরু জুটি। যদিও কাহিনি, পরিচালনা, অভিনয় সব দিক থেকে ছবিটি ছিল এক অসামান্য কালজয়ী নজির।

ছবি সৌজন্যে-Wikipedia

কিন্তু বিবাহিত পরিচালকের সঙ্গে নায়িকার প্রেমের কাহিনি সে সময়ের দর্শক মন থেকে গ্রহণ করতে পারেনি। যদিও পরবর্তীকালে ক্ল্যাসিকের মর্যাদা পেয়েছে সিনেমাটি। কিন্তু এই ছবির সেই প্রাথমিক ও সাময়িক ব্যর্থতা আবেগপ্রবণ গুরু দত্তকে বিশেষ ভাবে আলোড়িত করেছিল।

অল্প বয়সে মৃত্যুর আগেও গুরু দত্ত কিছু নতুন ছবি নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন। এবং 'পিকনিক' ও 'লাভ অ্যান্ড গড' ছবির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। 'পিকনিক' ছিল তার নিজের ছবি। যেটি শেষ করা হয়নি। 'লাভ অ্যান্ড গড'এর পরিচালক ছিলেন কে. আসিফ। ছবিটি প্রায় দুদশক পর মুক্তি পায়। গুরু দত্তের পরিবর্তে সেটিতে অভিনয় করেন সঞ্জীব কুমার।

৪.২.৮ হৃষিকেশ মুখার্জী

হৃষিকেশ মুখার্জী ছিলেন ভারতীয় হিন্দি চলচ্চিত্রের একজন প্রখ্যাত জনপ্রিয় পরিচালক। নিজের চলচ্চিত্র জীবনে তিনি বেশ কিছু জনপ্রিয় ছবি যেমন 'সত্যকাম', ' চুপকে চুপকে', ' অনুপমা', 'আনন্দ', 'অভিমান', 'গুড্ডি', 'গোলমাল', 'আশীর্বাদ', 'বাবুর্চি', 'নেমক হারাম' প্রভৃতি নির্মাণ করেছেন। অনেকেই তাঁকে বলিউডে অমিতাভ বচ্চনেরও গডফাদার বলে থাকেন, তাঁর হাত ধরেই অমিতাভ বচ্চনের উত্থান! 'আনন্দ' থেকে শুরু করে 'চুপকে চুপকে' হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের ন'টি ছবিতে অভিনয় করেছেন অমিতাভ। হৃষিকেশ-অমিতাভ জুটির একের পর এক হিট অনুভবি ছবি এক সময়ে

ছবি সৌজন্যে-timesofindia.indiatimes.com

বলিউডে সাড়া ফেলেছিল। 'মিলি', 'জুরমানা', 'নমক হারাম'-এর মতো ছবিতে একেবারে আটপৌরে ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল বিগ-বি'কে। অনবদ্য গল্প, চিত্রনাট্য আর পরিচালকের হাতযশে এক অন্য অমিতাভ বচ্চনকে পেয়েছিলেন দর্শকরা।

এছাড়াও তিনি ভারতের কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র সনদায়ন কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় চলচ্চিত্র উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ভারত সরকার তাকে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৯৯ সালে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার এবং ২০০১ সালে পদ্মবিভূষণ প্রদান করেন। তিনি এনটিআর জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন।

৪.২.৯ সারাংশ

আমরা এই এককে যাদের বিষয়ে আলোচনা করলাম তারা হলেন:

- সত্যজিৎ রায়
- ঋত্বিক ঘটক
- মৃণাল সেন
- তপন সিংহ
- রাজ কাপুর
- গুরু দত্ত
- হৃষিকেশ মুখার্জী

৪.২.১০ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন :

১. সত্যজিৎ রায়ের কোন ছবি প্রথম আন্তর্জাতিক পুরস্কার পায়? কোন্ সালে?

২. ঋত্বিক ঘটকের প্রথম ছবি কোন্‌টি? কবে মুক্তি পেয়েছিল?

৩. মৃণাল সেনকে কী ভারতীয় নাতরঙ্গ ছবির পথিকৃৎ বলা যায়? সংক্ষেপে লিখুন?

৪. তপন সিংহের পাঁচটি ছবির নাম করুন।

৫. রাজ কাপুরের দুটি ছবির নাম করুণ।

বড় প্রশ্ন :

১. ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সত্যজিৎ রায়ের অবদান বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২. বাংলা চলচ্চিত্র ঋত্বিক ঘটকের ভাবনায় কিভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে তা আলোচনা করুন।

৩. বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নয়া বাস্তববাদের এর গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৪. ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে গুরু দত্ত ও রাজ কাপুরের অবদান ব্যাখ্যা করুন।

৫. ভারতীয় সিনেমার প্রেক্ষিতে মৃণাল সেনের গুরুত্ব - আলোচনা করুন।

৬. রাজকাপুর বলিউডের একজন নামকরা চিত্রনির্মাতা — ব্যাখ্যা করুন।

৪.২.১১ গ্রন্থপঞ্জি

- *সোনার দাগ,* গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ।
- *বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস,* কালীকা মুখোপাধ্যায়, পত্রভারতী
- *History : Bengali Cinema,* Kiranmoy Raha.
- *ঋত্বিকতন্ত্র,* সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, প্রতিভাস
- *Encyclopaedia of Indian cinema.*
- *Mass Communication in India,* Keval J kumar, Jaico Publishing House
- *গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি,* ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, লিপিকা।
- *আধুনিক গণমাধ্যম,* ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য বুকস অ্যান্ড এলায়েড।
- *Directory of Bengali Cinema,* Edited by Ansu Sur, Nandan, Kolkata
- *অনভিজাতদের জন্য অপেরা,* সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, প্রতিভাস

একক : ৩ □ ফিল্ম সেন্সরশিপ

৪.৩.০ গঠন

৪.৩.১ উদ্দেশ্য

৪.৩.২ সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন

৪.৩.৩ ভারতে সেন্সারশিপের প্রাথমিক ইতিহাস

৪.৩.৪ যে যে বিষয়গুলি সেন্সরশিপের আওতাভুক্ত

৪.৩.৫ যে যে বিভাগে সিনেমা সেন্সর হয়

৪.৩.৬ সিনেমার সেন্সরশিপ পদ্ধতি

৪.৩.৭ উপসংহার

৪.৩.৮ সারাংশ

৪.৩.৯ অনুশীলনী

৪.৩.১০ গ্রন্থপঞ্জি

৪.৩.১ উদ্দেশ্য

আমরা এই এককে যে বিষয়ে আলোচনা করবো সেই গুলি হলো:

- সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন বা CBFC
- ভারতে সেন্সারসিপের প্রাথমিক ইতিহাস
- যে যে বিষয়গুলি সেন্সরসিপের আওতাভুক্ত
- যে যে বিভাগে সিনেমা সেন্সর হয়
- সিনেমার সেন্সরশিপ পদ্ধতি

৪.৩.২ সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন বা CBFC

১৯১৮ সালে ভারতীয় সিনেম্যাটোগ্রাফ আইন পাশ হয়। এই আইনে প্রথম সেন্সরশিপ ও সিনেমার লাইসেন্স প্রথা সম্পর্কিত বিষয়ে বিধান দেওয়া হয়। সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনের প্রথম ধাপ সিনেম্যটোগ্রাফ আইন তৈরি হয়েছিল, যাতে কোনও ছবি কোনওভাবে সামাজিক সীমা লঙ্ঘন না করতে পারে। ভারতীয় চেতনার প্রতি অবমাননাকর কোনও কিছু প্রদর্শন করতে না পারে, বা হিংসাত্মক বিষয় দেখিয়ে কারও ভাবাবেগে আঘাত দিতে না পারে। এখন অনেকের মতেই, শিল্পের কাজ সমাজের সত্যিগুলোকে দেখানো। কিন্তু সেই সত্যিটা কতটা সত্যি কিংবা শিল্পভাবনা আসলে কতটা সৎ, তাই নিয়ে তর্ক বহুদূর গড়াতে পারে। সেন্সরসিপ শব্দটির মধ্যেই একটি অথরিটি সুলভ সুর আছে, যা নিয়ন্ত্রণ করে ওই অথরিটির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি। শিল্পের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এই নিয়ন্ত্রণ করার

বিষয়টিই ভীষণভাবে শিল্পের স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচারণ করে বলে মনে করা হয়। তাত্ত্বিকভাবে সিনেমায় কি থাকা উচিৎ আর কি থাকা উচিৎ নয় তাই নির্ধারণ করে সেন্সার বোর্ড।

ভারতীয় উপমহাদেশে সেন্সরসিপের বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত হয় সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনের দ্বারা। সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন (CBFC) ভারতীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীনস্থ এবং বিধিবদ্ধ সেন্সরসিপ এবং ক্লাসিফিকেশন সংস্থা। এটিকে সেন্সর বোর্ড বলেও অভিহিত করা হয়। সিনেমাসহ টিভি-শো, টিভি বিজ্ঞাপন প্রভৃতির সার্টিফিকেশন করে বা শংসাপত্র প্রদান করে CBFC। এককথায় যে সমস্ত অনুষ্ঠান জনসমক্ষে দেখানো হয় তাদের শংসাপত্র প্রদান করে CBFC। ভারতবর্ষে চলচ্চিত্রের আনুষ্ঠানিক মুক্তি সম্ভব হয় সেন্সর বোর্ডের সম্মতির পরেই। প্রধানত সিনেমার উপস্থিত যৌনতা, হিংস্রতা, নগ্নতা যা জনমনে বিরূপ প্রভাব তৈরি করতে পারে বলে মনে করা হয় তারই বিচার করে CBFC। বস্তুত বাকস্বাধীনতার বিরোধিতা নয়, বরং বাকস্বাধীনতার সংবিধান লিপিবদ্ধ বিধিনিষেধগুলিকে মান্যতা দিয়েই সিনেমায় সেন্সর আরোপ করা হয়।

ছবি সৌজন্যে-jaganrosh–com

CBFC সম্পর্কে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য হল, "ফিল্ম সেন্সরসিপ খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে কারণ ছাপার অক্ষরের তুলনায় সিনেমা তীব্রভাবে মানুষকে আকর্ষণ করে এবং ভাবনা ও কাজের বদল ঘটায়। সিনেমা, সংলাপ, দৃশ্য ও শব্দের সমন্বয়ে তৈরী সিনেমা থিয়েটারের আঁধারে দর্শকের মনে গভীর প্রভাব ফেলে এবং মানসিক অনুভুতির ভিত্তিকে নাড়িয়ে দেয়। এছাড়াও সিনেমার ভালোর তুলনায় খারাপ প্রভাব বেশি এবং সিনেমা সহজেই হিংস্রতা ও অস্বাভাবিক ব্যাবহারের জন্ম দেয়। এটা কখনই জনসংযোগের অন্যান্য মাধ্যমের সাথে তুলনীয় নয়।"

৪.৩.৩ ভারতে সেন্সারশিপের প্রাথমিক ইতিহাস

১৯১৩ সালে দাদাসাহেব ফালকের "রাজা হরিশচন্দ্র" মুক্তি পায়, আর ১৯১৮ সালে পাস হয় সিনেম্যাটোগ্রাফ অ্যাক্ট, যা কার্যকরী হয় ১৯২০ সালে। সেইসময় চেন্নাই, মুম্বাই, কলিকাতা, লাহোর এবং রেঙ্গুন পুলিশের অধীনে ছিল সেন্সর বোর্ডগুলি। স্বাধীনতার পর Bombay Board of Film Censors এর আওতায় চলে আসে স্বাধীন প্রাদেশিক সেন্সর

বোর্ডগুলি। ১৯৫২ সালের সিনেম্যাটোগ্রাফ অ্যাক্টের পর 'বম্বে বোর্ড অফ ফিল্ম সেন্সরস' নবরূপে 'সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সেন্সরস' রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৮৩ সালে সিনেম্যাটোগ্রাফ সার্টিফিকেশনের নিয়মনীতির সংশোধন হয়, ও তখন থেকেই 'সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সেন্সরস' নতুন নাম 'সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন' নামে পরিচিত হতে শুরু করে।

৪.৩.৪ যে যে বিষয়গুলি সেন্সরশিপের আওতাভুক্ত

ভারতীয় সিনেমার ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় শুরুর দিকে অর্থাৎ ১৯১৮ সালে সিনেম্যাটোগ্রাফ অ্যাক্ট পাস হওয়ার পর প্রদর্শিত সিনেমাগুলি ছিল হয় আমেরিকান নয়তো ব্রিটিশ। সেইসময় নগ্নতা,নারীর মদ্যপ অবস্থার দৃশ্য, যৌনতা এবং রাজনৈতিক আদর্শগত সংঘাত এই বিষয়গুলিই সেন্সরের আওতায় পরত। ১৯২৭ সালে ভারতীয় সিনেম্যাটোগ্রাফ কমিটিতে প্রথম একজন ভারতীয় যোগ দেন, তিনি হলেন টি রঙ্গচারিয়ার। তিনি নিয়োগের দু বছর পরে একটি রিপোর্ট দেন সিনেমায় সেন্সরশিপ কতটা জরুরী এই মর্মে। যুদ্ধকালীন সময়ে সেন্সরশিপের বিষয়টি বিশেষ মাত্রা পায়। উল্লেখ্য ভারতীয় সিনেমায় সেন্সরের বিষয়টির সূচনা হয় ব্রিটিশ রাজত্বের সময়ে, তাই সেন্সরসিপের ক্ষেত্রেও ব্রিটিশ পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়েছিলো, ১৯৫২ সালে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সেন্সরস শুরু হলেও সেই রীতির পরিবর্তন হয় নি, অর্থাৎ ১৯১৮ সালে থেকে এখনও অবধি ভারতীয় সিনেমার সেন্সারশিপ নির্ধারিত হয় ব্রিটিশ ট্র্যাডিশন অনুসরণ করেই। এখন সিনেমার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের যে যে কারণগুলি উঠে আসে সেগুলি হল, ১) যৌনতা, ২) রাজনীতি, ৩) ধর্মীয় কারণ, ৪) সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব, ৫) কোনও ব্যক্তি বা ঘটনা বা বিষয়ের ভুল উপস্থাপন, ৬) অতিরিক্ত হিংস্রতা।

১) যৌনতাঃ ভারতীয় উপমহাদেশ যে রক্ষণশীল অনমনীয় সমাজব্যবস্থা অনুসরণ করে সেখানে বিবাহোত্তর স্ত্রী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক স্বীকৃত।বিবাহই যৌন সম্পর্কের একমাত্র সমাজ স্বীকৃত পথ। অথচ বিবাহ ছাড়াও যে যে ধরণের যৌন সম্পর্কগুলি হয় তা হল, সমকামিতা। কিন্তু এই সম্পর্কগুলি ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা দ্বারা তীব্রভাবে সমালোচিত। এই পরিস্থিতিতে দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে যৌনদৃশ্যের উপস্থাপন সহজেই সেন্সরের কোপে পরে, এবং এর স্বপক্ষে যুক্তি হল, এই দৃশ্য ভারতীয় মূল্যবোধের অবনমন ঘটাতে পারে। এই কারণে যে সমস্ত সিনেমাগুলি সেন্সরের কোপে পরেছে এগুলি হল, 'কামসুত্র', 'ফায়ার', 'পিঙ্ক মিরর', 'দ্য গার্ল উইথ দ্য ড্রাগন ট্যাটু', 'ওয়াটার' প্রভৃতি।

২) রাজনীতিঃ সেন্সরশিপের থেকে রাজনীতিকে আলাদা করা প্রায় একপ্রকার অসম্ভবই। বাস্তবে দেখা যায় সিনেমায় আলোচিত রাজনৈতিক ঘটনাবলী তৎকালীন ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক দলের দ্বারা প্রত্যক্ষ্যভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত হয় এবং যে দল সিনেমার একটি চরিত্র তার দ্বারা সিনেমাটিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপের সমূহ সম্ভাবনা থাকে। ভারতীয় সিনেমার ক্ষেত্রে প্রথম রাজনৈতিক কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল মৃণাল সেনের ''নীল আকাশের নিচে''। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয় এই সিনেমার প্রেক্ষাপট হওয়ার কারণে বাংলা ভাষায় নির্মিত এই সিনেমাটি প্রথম ভারতীয় সিনেমা হিসেবে ভারত সরকারের দ্বারা নিষিদ্ধ হয়। এছাড়াও মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসের মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা নিয়ে ১৯৬৩ সালে নির্মিত 'গোকুল শঙ্কর'ও ভারত সরকারের দ্বারা নিষেধাজ্ঞার কবলে পরে। রাজনৈতিক কারণে নিষিদ্ধ আরও কয়েকটি সিনেমা হল, 'গরম হাওয়া', 'আঁধি', 'কিসসা কুরশি কা'। নিষেধাজ্ঞার কবলে পরেছিল অস্কার বিজয়ী বাঙালি পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের তথ্যচিত্র, ''সিকিম''। সিকিমের তৎকালীন রাজা সত্যজিৎ রায়ের এই তথ্যচিত্র নির্মাণ অনুমোদন করেন যখন সিকিম ভারত এবং চীন দুই দেশের তরফ থেকেই বিপদের আশঙ্কা করছিল।

উল্লেখ্য এই তথ্যচিত্রের জন্য সেন্সরসিপ বোর্ডের ডিরেক্টরের কাছে তাদের নির্ধারিত ৫১টি 'অবজেকশন' ব্যাখ্যা দিতে হয়েছিলো সত্যজিৎ রায়কে। ১৯৭৩ সালে সিকিম ভারতের সাথে যুক্ত হওয়ার পরেই তথ্যচিত্রটি ভারত সরকারের তরফে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, সেই নিষেধাজ্ঞা ২০১০ সালে ওঠে। এই শতাব্দীতে রাজনৈতিক কারণে বাধাপ্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য দুটি সিনেমা হল, 'অরক্ষণ', 'উড়তা পাঞ্জাব'।

৩) ধর্মীয় কারণ ঃ ধর্মীয় কারণ এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে যেকোনো গণমাধ্যমের একচুল একদিক ওদিক করাও উদারতার সাথে গ্রহণ করেনি ভারতীয় সেন্সর বোর্ড। ধর্মীয় ভাবনা তো বটেই, ধর্মীয় চরিত্রও এক্ষেত্রে সেন্সরের আওতায় পরে। ১৯৮৪ সালে নির্মিত আমেরিকান অ্যাডভেঞ্চার ''ইন্ডিয়ানা জোন্স অ্যান্ড দ্য টেম্পল অফ ডুম'' ভারত সরকারের দ্বারা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিলো, কারণ এখানে হিন্দু দেবী কালীকে অন্ধকার জগতের দেবী হিসেবে দেখানো হয়েছিলো। যদিও পরবর্তিকালে বিখ্যাত আমেরিকান লেখক Yvette Claire Rosser তীব্রভাবে এই সিনেমাটির সমালোচনা করে বলেন, এতে আদপে ভারতীয়ের ভারতীয়দের মতো করে উপস্থাপন করা হয় নি, বরং পশ্চিমিদের চোখে ভারতীয়রা কেমন সেটা উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ধর্মের কারণে নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়া আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিদেশী সিনেমা হল, 'The Da Vinci Code'। সাম্প্রতিককালে ভারতে নির্মিত যে সিনেমা ধর্মের কারণে প্রচুর সমস্যায় পরেছিল তা হল, 'PK'।

৪) সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ঃ ভারতের মতো বহু ধর্মের দেশে ধর্মীয় ভাবাবেগের মতো সংবেদনশীল যে বিষয়টি তা হল সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব। যে কারণে অনেক সিনেমা, তথ্যচিত্র সেন্সর বোর্ডের কোপে পরে। এই ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়া উল্লেখযোগ্য তথ্যচিত্রগুলি হল, গুজরাট দ্বাঙ্গা নিয়ে নির্মিত 'Final Solution'। সিনেমার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, 'Hawayein' , 'Amu' (কিছু অডিও ক্লিপ বাদ দিয়ে সিনেমাটি মুক্তি পায়), 'বিশ্বরূপম' প্রভৃতি।

৫) কোনও ব্যক্তি বা ঘটনা বা বিষয়ের ভুল উপস্থাপন ঃ বিখ্যাত বা কুখ্যাত মানুষ সম্পর্কে ভুল তথ্য উপস্থাপন করার কারণে নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়া ভারতীয় সিনেমার তালিকাটিও খুব ছোটো নয়। ফুলদেবীর জীবনী নির্ভর সিনেমা 'Bandit Queen' সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, কারণ ফুলন দেবী নিজেই এই সিনেমার সত্যতা নিয়ে দিল্লী হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন। 'Main Hoon Rajinikanth' দক্ষিনি সুপারস্টার রজনীকান্তের জীবনীনির্ভর এই সিনেমাটি স্বয়ং রজনীকান্তের দ্বারা সমালোচিত হয়েছিলো। সিনেমাটিকে নিষিদ্ধ ঘোষিত করতে তিনি হাইকোর্ট অবধি গিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক সিনেমা 'যোধা-আকবর' এবং 'পদ্মাবত'ও মুক্তির আগে তীব্র বিরোধিতা ও সমালোচনার মুখে পরলেও পরে মুক্তি পায়।

৬) অতিরিক্ত হিংস্রতা ঃ সিনেমা দেখার অন্যতম প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল এটি বিনোদন মাধ্যম। জীবনের গল্প তুলে ধরার আঙ্গিকে সিনেমা হিংস্রতা তুলে ধরলেও তা যদি অতিরিক্ত হয়ে যায় তখনই সেখানে সেন্সরের কোপ পরে। সিনেমার অতিরিক্ত হিংস্রতা দর্শকদের মানসিকতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে বলেই মনে করা হয়। অতিরিক্ত হিংস্রতা থাকার কারণেই অনুরাগ কাশ্যপের সিনেমা 'Paanch' আজও মুক্তি পায়নি। যদিও সেন্সর বোর্ড কিছু ক্লিপ বাদ দিয়ে সিনেমাটির মুক্তির অনুমতি দিলেও তা আর মুক্তি পায়নি।

৪.৩.৫ যে যে বিভাগে সিনেমা সেন্সর হয়

একটি সমীক্ষাতে দেখা গেছে, ভারতে প্রায় ১২৫০ সিনেমা নির্মিত হয় প্রতি বছর। সিনেমা থেকে প্রাপ্ত করের পরিমাণ প্রায় ১৩,৮০০ কোটি টাকা, ২০২০ তে তা প্রায় ২৩,৮০০ কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

বিপুল সংখ্যায় নির্মিত ভারতীয় সিনেমা আগে দুটি বিভাগে মুক্তি পেত, কিন্তু ১৯৮৩ সালের জুন মাস থেকে বিভাগ সংখ্যা বেড়ে হয় ৪। এখন সিনেমা যে চারটি বিভাগে মুক্তি পাওয়ার জন্য অনুমদিত হয় সেগুলি হল, U– U/A– A এবং ছ।

'ইউ' সার্টিফিকেট বা (uninterrupted) : সব বয়সের সব ধরণের দর্শকের দেখার উপযোগী হয় এই ধরণের সিনেমা। এতে যৌনতা, হিংস্রতা ইত্যাদি বিষয়গুলি থাকেই না। পুরো পরিবারের সাথে বসে দেখার উপযোগী হল এই সার্টিফিকেট পাওয়া সিনেমাগুলি।

U/A সার্টিফিকেট বা / : এই ধরণের সিনেমা সর্বসাধারণের জন্যই নির্মিত। এবং এতে সব ধরণের বিষয়ই থাকে। সব ধরণের দর্শকের জন্য হলেও, ১২ বছরের নিচের দর্শকের জন্য দেখার সময় অভিভাবক সাথে থাকা বাধ্যতামূলক। মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমার বেশিরভাগই এই সার্টিফিকেটটাই পায়।

'A' সার্টিফিকেট বা (Adult) : এই ধরণের সিনেমা প্রাপ্ত বয়স্কদের উপযোগী বিষয় ও দৃশ্য দিয়ে তৈরি হয়। ১৮ বছরের উর্দ্ধে অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্করাই এই সিনেমার দর্শক হতে পারে। যৌনতা, অতিরিক্ত হিংস্রতা, গালিগালাজ থাকলে সে ছবি 'এ' সার্টিফিকেট পায়। যদিও বেশ কিছু ছবিতে কখন কখন এমন দৃশ্যের প্রয়োজন হয়, যেখানে যৌনতার ছোঁয়া রয়েছে বা এমন সংলাপ রয়েছে যেটা অপমানজনক, অথচ প্রাত্যহিক জীবনে প্রায়ই শোনা যায় বা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক, তাহলে সে ছবি 'ইউ/এ পেতে পারে। আবারএমনও অনেক সময় হয়, যে ছবিতে হয়তো কোনও প্রথাগত আপত্তিকর দৃশ্য নেই, অথচ ছবির বিষয়বস্তু গুরুতর ও গম্ভীর, যেমন পাচারচক্র বা মাদকচক্র তাহলেও ছবিকে 'ইউ/এ' দেওয়া হয়।

'S' সার্টিফিকেট বা ঃ বিশিষ্ট দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে এই ধরণের সিনেমা।

বিদেশী সিনেমা, বা বিদেশী তথ্যচিত্রর এদেশে মুক্তির বিষয়ে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনের কোনও সার্টিফিকেট দেয় না। কিন্তু দেশেরই বিভিন্ন আঞ্চলিক ছবির ক্ষেত্রে নিয়মের একটু অদল-বদল হয়। এগুলো নির্ভর করে সেই জায়গার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপর। যেমন দক্ষিণ ভারতের ছবিতে অনেক বেশি হিংসা থাকলেও সে ছবি 'ইউ/এ' পেয়ে থাকে অনেকসময়। কারণ ওখানের দর্শক তাতে অভ্যস্ত। অথচ সেই একই ছবির হিন্দি রিমেক 'এ' সার্টিফিকেট পেতে পারে। কারণ বৃহত্তর ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে দর্শক অতটা হিংসা ছবির পর্দায় দেখতে অভ্যস্ত নন।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটা ছবি সম্পূর্ণ নাকচ হয়ে যেতে পারে নির্দেশিকা অনুযায়ী। যেমন কোনও ছবি যদি সরাসরি সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়ায় বা ছড়াতে প্রভাবিত করে, তাহলে সেটা পাশ হবে না। বা কোনও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব বা ধর্মগুরু সম্পর্কে কোন অসত্য এবং অপমানজনক কথা বললে, সেটাও পাশ হবে না। বিশেষ করে মহিলা এবং শিশুদের অসন্মান করে কিছু দেখালে, সেটা পাশ হবে না। বাচ্চাদের উপর হিংস্রতা, অত্যাচার, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে কাউকে গুলি করা আর শরীরে ড্রাগ ইনজেক্ট করার দৃশ্য দেখানো যায় না।

৪.৩.৬ সিনেমার সেন্সরশিপ পদ্ধতি

বোর্ডে মোট সদস্য থাকেন ৫০জন। যে কমিটি ছবিগুলোকে রিভিউ করে, তাতে একজন অভ্যন্তরীণ অফিসার থাকেন। আর থাকেন চার জন উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য। কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা এই বোর্ড গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় তথ্য এবং

সম্প্রচার মন্ত্রক এই বোর্ড তৈরি করে। নিয়ম অনুযায়ী, যার এক চতুর্থাংশ মহিলা থাকার কথা। বোর্ডের শীর্ষে থাকেন বোর্ডের চেয়ারম্যান। নত্রদ্দ নীচে রয়েছে একটা এগজামিনিং কমিটি। তারপর বিভিন্ন রিজিওনাল অফিসার। তারপর আঞ্চলিক এগজামিনিং কমিটি। বর্তমানে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনের চেয়ারম্যন প্রসূন যোশী। CBFC সদরদপ্তর মুম্বাইতে হলেও এর নয়টি আঞ্চলিক শাখা রয়েছে। সেগুলি আছে, মুম্বাই, কলকাতা, ত্রিবান্দাম, চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ, ব্যঙ্গালোর, কটক, গুয়াহাটি এবং দিল্লিতে।

শুরুর দিকে ১৯৫২ সালের সিনেমাটোগ্রাফ আইনের ৪১তম নিয়ম অনুসারে একটি সিনেমার সার্টিফিকেট পেতে সময় লাগতো কমবেশি ৬৮ দিন। বর্তমানে তা অনেকটাই কম লাগে। ১০০ টাকা প্রতি রিল মুল্যে সিনেমার প্রযোজককে প্রথমে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনের অ্যাপ্লিকেশন ভর্তি করতে হয়। সিনেমার একজামিন কমিটিতে চার জন সদস্য থাকেন অ্যাডভাইজারি প্যানেল থেকে এবং একজন একজামিন অফিসার থাকেন। শর্ট ফিল্মের ক্ষেত্রে একজন থাকেন অ্যাডভাইজারি প্যানেল থেকে এবং একজন একজামিন অফিসার থাকেন। সম্পুর্ণভাবে নির্মিত সিনেমা পাঠাতে হয় সেন্সর একজামিন প্যানেলে। ১৯৮৩ সালের সংশোধনী আইন অনুসারে ফিল্ম সার্টিফিকেশনের সমস্ত তথ্য এবং রেকর্ডস, ফিল্মের প্রিভিউ সব গোপনীয় বলে মানতে হবে। ফিল্ম একজামিন কমিটির কোনও সদস্যের পরিচয় কোনও অফিসিয়াল, নন-অফিসিয়াল বা প্রিভিউ হওয়া সিনেমার আবেদনকারীর কাছে প্রকাশ করা চলবে না কোনও অবস্থাতেই। ফিল্ম প্রিভিউ থিয়েটারে উপস্থিত থাকতে পারবেন না প্রিভিউ হওয়া সিনেমার আবেদনকারী স্বয়ং বা তার তরফের কোনও ব্যক্তি। প্রিভিউএর তিনদিনের মধ্যে একজামিন কমিটির সমস্ত সদস্যদের মতামত পাঠানো হয় একজামিন অফিসার পাঠান সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনের চেয়ারম্যনের কাছে। তার পরের সাতদিনের মধ্যে প্রযোজক জানতে পারেন সিনেমাটি কোন সার্টিফিকেট নিয়ে মুক্তি পেতে চলেছে। এই পর্যায়েই কোনও সিনেমার ওপর নিষেধাজ্ঞাও জারী হয়। অবশ্য তার আগে বোর্ডের তরফ থেকে আপত্তিকর শব্দ/বিষয়/বা ক্লিপ বাদ দেওয়ার আবেদন রাখা হয়। প্রযোজকের তরফ থেকে অনেক সময় তা মেনে নেওয়া হয় আবার কিছু সময় প্রযোজক সেটা না মেনে আর একবার দেখার জন্য আবেদন জানান। তখন রিভাইজিং কমিটি দ্বিতীয়বারের জন্য সিনেমাটি দেখে।

এই রিভাইজিং কমিটি তৈরি হয় সম্পুর্ন নতুন সদস্যদের নির্মিত প্যানেল নিয়ে। এতে থাকেন একজন চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যনের নির্ধারিত অনধিক ৯ সদস্য। তবে এই সদস্যদের মধ্যে তাঁরা থাকতে পারেন না যারা একজামিন প্যনেলে ছিলেন। অর্থাৎ একটি সিনেমার জন্য একজামিন প্যনেল এবং রিভাইজিং প্যনেলের সদস্য কখনও একই ব্যাক্তিরা হতে পারেন না। সিনেমা দেখার তিনদিনের মধ্যে সদস্যদের মতামত প্রিসাইডিং অফিসার পৌঁছে দেন সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনের চেয়ারম্যনের কাছে। সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনের বিরোধিতার জায়গাগুলি শোনে দিল্লীতে অবস্থিত Film Certification Appellate Tribunal (FCAT).

প্রসঙ্গত, এই "গোপনীয়" শব্দবন্ধটি যুক্ত হয় ১৯৮৩ রামকৃষ্ণ সিনে স্টুডিও এবং সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনের একটি মামলা হয় যার বিষয় ছিল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনকে জানাতে হবে কি কারণে একটি সিনেমা সেন্সরসিপের বিচারে সার্টিফিকেট পেলো না, তাতে মাদ্রাজ হাইকোর্ট যে রায় দেয় তা হল, "The Central Board of Film Censors has to come out with specific reasons when it asks for cuts in a film and it must

also furnish the particulars of guidelines under which cuts are sought to be effected to the film producer. If for any reason– the members of Committees (Examining or Revising) felt that any particular portion of film has to be cut–there could not be any confidentiality about these opinions especially when the privilege was not claimed on the ground of public interest."

এ তো গেলো সিনেমা মুক্তির সহজ পদ্ধতি। কিন্তু এরপরেও অনেক সিনেমার মুক্তির ক্ষেত্রে অনেক রকম বাধা আসে। সেই বাধাগুলি আসে জনতার কাছ থেকেই। অনেকেই হাইকোর্টে সিনেমা মুক্তির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দাবী করে মামলা করে, অনেক সময় রাজনৈতিক দল সিনেমার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, বাধা দেয় হলে সিনেমা মুক্তি পেতে। সুতরাং, একথা বলাই যায় সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনের ছাড়পত্রই সিনেমা মুক্তি পাওয়ার ব্যাপারে শেষ কথা নয়। সাম্প্রতিক অতীতে সেন্সরসিপের কোপে পরা কিছু সিনেমা হল, 'রং রশিয়া', 'মেসেঞ্জার অফ গড', 'ফিরিঙ্গি', 'যব হ্যারি মেট সেজেল', 'পদ্মাবত', প্রভৃতি।

৪.৩.৭ উপসংহার

সবার শেষে একটা কথা অস্বীকার করার জায়গা নেই যে, সেন্সরসিপ সভ্য মানুষের তৈরি শিল্পকর্মের ওপর মানুষ প্রদত্ত বাধা। যেহেতু কোনও শিল্পকর্মকে দেশ কালের সীমারেখায় বাঁধা যায় না তাই আজ যা সেন্সরসিপের আওতায় আসে, কাল তা নাও আসতে পারে। বা আজ যা সেন্সরসিপের আওতায় আসার মতো জরুরী বলে মনে হয় না কাল তা সেন্সরসিপের তালিকায় ভীষণ গুরুত্বপুর্ণ হয়ে উঠতেই পারে। এ ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী কোনও সিদ্ধান্তে আসা সেন্সরসিপের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষটির প্রতি অবিবেচনার সামিল বলেই মনে করা উচিৎ। সেইকারনেই সময়ের সাথে সাথে সেন্সরসিপের বিষয় পরিবর্তন ও সংশোধন করাও জরুরী।

৪.৩.৮ সারাংশ

আমরা এই এককে যে বিষয়ে আলোচনা করলাম সেই গুলি হলো:

- সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন বা CBFC
- ভারতে সেন্সারসিপের প্রাথমিক ইতিহাস
- যে যে বিষয়গুলি সেন্সরসিপের আওতাভুক্ত
- যে যে বিভাগে সিনেমা সেন্সর হয়
- সিনেমার সেন্সরশিপ পদ্ধতি

৪.৩.৯ অনুশীলনী

১. ভারতীয় চলচ্চিত্রে সেন্সরশিপের ইতিহাস বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২. চলচ্চিত্রে সেন্সরশিপের গুরুত্ব ও প্রয়োজন আলোচনা করুন।

৩. ভারতীয় চলচ্চিত্রে সেন্সরশিপের কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করুন।

৪. ভারতীয় সেন্সরবোর্ডের কাঠামো বর্ণনা করুন।

৪.৩.১০ গ্রন্থপঞ্জি

- *সোনার দাগ,* গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ, যোগমায়া প্রকাশনী।
- *বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস,* কালীশ মুখোপাধ্যায়, পত্রভারতী।
- *History: Bengali cinema,* Kiranmoy Raha.
- *Encyclopaedia of Indian cinema.*
- *Mass Communication in India,* Keval J kumar, Jaico Publishing House
- *গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি,* ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, লিপিকা।
- *আধুনিক গণমাধ্যম,* ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, লিপিকা।
- *অনভিজাতকের জন্য অপেরা,* সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, প্রতিভাস
- *ঋত্বিকতন্ত্র, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়,* সপ্তর্ষী
- *Cinema and Censorship,* Someswar Bhowmik, Sanctum Books.

একক : ৪ □ বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস

৪.৪.০ গঠন

৪.৪.১ উদ্দেশ্য

৪.৪.২ শুরুর কথা

৪.৪.৩ যাত্রাপথ

৪.৪.৪ স্বাধীনতা পরবর্তী পালাবদল

৪.৪.৫ সারাংশ

৪.৪.৬ অনুশীলনী

৪.৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৪.৪.১ উদ্দেশ্য

আমরা এই এককে যে বিষয়ে আলোচনা করবো সেই গুলি হলো:

- বাংলা চলচ্চিত্রের শুরুর কথা
- বাংলা চলচ্চিত্রের যাত্রাপথ
- স্বাধীনতা পরবর্তী পালাবদল

৪.৪.২ শুরুর কথা

পুরো পৃথিবী জুড়েই, সিনেমা বলতে প্রাথমিকভাবে বোঝানো হতো বায়োস্কোপকে। বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস ভারতের চলচ্চিত্রের ইতিহাসের সাথে সমান ভাবে সামঞ্জস্য রেখে এগিয়ে গেছে সময়ের হাত ধরে। বহু গুণী জনের প্রতিভায় অনন্য হয়ে নিজস্ব ইতিহাস রচনা করেছে বাংলা চলচ্চিত্র। উনিশ শতকের একদম শেষের দিকে, বাংলায় প্রথম বায়োস্কোপের দেখা মেলে। ১৮৯৮ সালে, প্যারিসের চলচ্চিত্র প্রেমী অধ্যাপক স্টিভেনসনের একটি স্বল্পদীর্ঘ ছবি কলকাতার স্টার থিয়েটার এ প্রথম দেখানো হয়। এই স্টিভেনসনের ক্যামেরা ধার করে নিয়েই বাংলা চলচ্চিত্রের জনক হীরালাল সেন বানান তার প্রথম ছবি, 'Dancing Scene From the Opera– The Flower of Persia'। পরে সহোদর মতিলাল সেনের সাহায্যে লন্ডনের ওয়ারউইক ট্রেডিং কোম্পানির চার্লস আরবানের থেকে তিনি নিজের জন্য একটি আরবান বায়স্কোপ কিনে নেন। পরের বছর তিনি ভাইয়ের সাথে রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানীর গোড়াপত্তন করেন। এভাবেই বাংলা চলচ্চিত্রের পথচলা শুরু হয়, মোটামুটি অনাড়ম্বর ভাবেই কিন্তু বিশ্ব ইতিহাসের সাথে তাল মিলিয়ে। আপাতভাবে শুরুর দিনে যা একদমই যান্ত্রিক উদ্ভাবন ছিল সেই চলচ্চিত্র ক্রমে ক্রমে অন্যতম শিল্পমাধ্যম হয়ে স্থান করে নিয়েছে সমস্ত বাংলায়। স্থান থেকে কাল, কাল থেকে কালান্তরে সিনেমার অনায়াস যাতায়াত। সিনেমার দৃশ্য ও শব্দের ধারাবাহিক মূর্ত থেকে ভেসে যাওয়া যায় বিমূর্ত নিরপেক্ষ চেতনায়।

৪.৪.৩ যাত্রাপথ

বাংলায় চলচ্চিত্রের সূচনা ১৮৯০ সাল থেকে যখন কলকাতার থিয়েটারে বায়োস্কোপ দেখানো হল এবং তার ঠিক একদশকের মধ্যেই আজকের এই 'টলিউড' বা বাংলা ইন্ডাস্ট্রির বীজবপন করেন হীরালাল সেন। তিনি রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে কলকাতার স্টার থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার, ক্লাসিক থিয়েটার ইত্যাদিতে জনপ্রিয় শো দেখাতেন যা জনপ্রিয় হতে শুরু করেছিল প্রথাগত শিল্প মাধ্যমের বাইরে। হীরালাল সেন সর্ব প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্যর চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শনী শুরু করেন কোলকাতা ও অন্যান্য স্থানে। তখনকার ঢাকা জেলায় ১৮৬৬ সালে হিরালাল সেন জন্মগ্রহণ করেন। এই পথপ্রদর্শক বাঙালি চলচ্চিত্রকারকে সারা ভারতবর্ষের এবং উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের জনক বলে গণ্য করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে অধ্যয়ন কালেই তিনি ছবি তৈরির কাজে নিজের উৎসাহ খুঁজে পান। হীরালাল সেন প্রথমে বিদেশী কলাকুশলীর সহকারী হিসেবে কাজ শুরু করেন এবং কিছুকাল কাজ শেখার পর তিনি নিজেই পরে একটি ক্যামেরা তৈরি করেন (মুভি ক্যামেরা কেনার মতন অর্থ তাঁর ছিল না) এবং ওই ক্যামেরা দিয়েই তিনি প্রথম ছবি তৈরির কাজ শুরু করেন। আদতে ফোটোগ্রাফার হীরালাল সেন ও তাঁর ভাই মতিলাল সেন তাঁদের 'রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি' থেকে পেশাদার মঞ্চে অভিনীত বিভিন্ন নাটকের টুকরো টুকরো দৃশ্য, ডকুমেন্টরি বিজ্ঞাপন চিত্র এবং নিউজ রিল মিলিয়ে প্রায় চল্লিশটির বেশি ছবি করেছেন।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি তাঁর প্রথম পরিচালনার ছবি 'আলিবাবা অ্যান্ড ফরটি থিভস' মুক্তি পায়। এই হীরালাল সেনেরই একক প্রচেষ্টায় কলকাতায় ক্ল্যাসিক থিয়েটারে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ভ্রমর' ('কৃষ্ণকান্তের উইল') সিনেমাটি পর্দায় প্রদর্শিত হয়। এই সেন ভাতৃদ্বয়কে যথার্থ ভাবেই তাই বলা হত ভারতের লুমিয়ের ব্রাদার্স। ১৯১৭ সালে কলকাতায় মারা যাবার আগে পর্যন্ত হীরালাল সেন বাংলা চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হীরালাল সেনের পর জ্যোতিষ চন্দ্র সরকার নামে একজন বাঙালি চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি সে সময় ভারতীয় রাজনীতিবিদ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্ব ও পরিচালনায় 'অ্যান্টি পার্টিশন ডে' এর শোভাযাত্রাটির ছবি তুলেছিলেন।

এরপর সাময়িক বিরতির পর হাল ধরেন ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি। তিনি ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন যা বাঙালি মালিকানার প্রথম ফিল্ম কোম্পানি (১৯১৮)। ভারতের প্রথম নির্বাক বাংলা ছবি :- ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বাংলা কাহিনিচিত্র 'সত্যবাদী রাজা হরিশচন্দ্র'। বাংলা ভাষায় তৈরি প্রথম ফিচার ফিল্ম ছিল 'বিল্বমঙ্গল' যেটি ১৯১৯ সালে ম্যাডান থিয়েটারের ব্যানারে নির্মিত হয়। 'বিলাত ফেরত' ছিল আইবিএফসি"র প্রথম প্রযোজনা (১৯২১)। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সবাক বাংলা ছবি 'জামাইষষ্ঠী', জে. এফ. ম্যাডান প্রযোজিত 'ম্যাডান' থিয়েটারে প্রদর্শিত হয় যার পরিচালনায় ছিলেন অমর চৌধরী। এবং প্রেমাঙ্কুর আতর্থী পরিচালিত 'দেনা পাওনা' চলচ্চিত্রটি ছিল বাংলার প্রথম সবাক চলচ্চিত্র। এই বছরই নিউ থিয়েটার্স লিমিটেডের প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই নব প্রতিষ্ঠানেরই প্রথম সবাক ছবি 'দেনা পাওনা' ১৯৩১ সালের ২৪ ডিসেম্বর চিত্রায় মুক্তি পায় (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের)। এ বছরেই আরো কয়েক মাসের মধ্যে ম্যাডান কোম্পানি আরো ৩টি পূর্ণাঙ্গ সবাক চিত্র 'জোর বরাত', 'ঋষির প্রেম', 'প্রহ্লাদ' ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের কৌতুক চলচিত্র 'তৃতীয় পক্ষ' উপহার দিয়ে সবাক ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেন। বলা যায়, বাংলা সবাক ছবির সূচনা হয়েছিল ম্যাডান কোম্পানি সৌজন্যে। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত ম্যাডানের তোলা ছবির সংখ্যা ছিল ৬১ (বাংলা ১০ ও হিন্দি ৫১)।

নির্বাক ছবির যুগে বাঙালি পরিচালক অনাদি বসু মফস্বল শহরে চলমান সিনেমার মারফত ছবি দেখানো প্রথম প্রবর্তন

করেন। বাঙালি শিল্পীদের নিয়ে তিনি ১৯১৮ সালে পূর্ণাঙ্গ বাংলা নির্বাক ছায়াছবি 'রত্নাকর' তৈরিতে মনোনিবেশ করেন। প্রাথমিক বিনিয়োগে নির্বাক ছবির ক্ষেত্রে প্রযোজকদের অভাব না থাকলেও সবাক ছবির প্রথম যুগে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে বিশেষ কেউ চলচ্চিত্র নির্মাণে এগিয়ে আসেন নি। তাই সবাক যুগের প্রথম দুবছর ম্যাডান ও নিউ থিয়েটারস ছাড়া কলকাতার চিত্র জগতে আর কেউই এগিয়ে আসেন নি ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে।

সবাক ছবির প্রথম দশকেই দেবকী কুমার বসু, সুশীল মজুমদার, প্রমথেশ বড়ুয়া, প্রফুল্লা রায়, চারু রায়, মধু বসু, ফণী মজুমদার, নীতিন বসু প্রমুখ যশস্বী পরিচালক বাংলা চিত্র জগৎকে গৌরবের আসনে অলঙ্কৃত করেন। চলচ্চিত্রে সঙ্গীতের ব্যবহার সাড়া ফেলেছিল এবং সঙ্গীত জগতের নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন রাইচাদ বড়াল ও তার সহকারীরা। সে আমলে সবাক যুগের শ্রেষ্ঠ ১০ টি ছবির নাম করা যেতে পারে। ছবিগুলো হলো- চন্ডিদাস (১৯৩২), দেবদাস (১৯৩৫), গৃহদাস (১৯৩৬), আলীবাবা (১৯৩৭), মুক্তি (১৯৩৭), বিদ্যাপতি (১৯৩৮), গোরা (১৯৩৮), দেশের মাটি (১৯৩৮) ও অধিকার (১৯৩৯)। দেবকী বসু পরিচালিত চন্ডিদাস ও প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত দেবদাস ও গৃহদাহ সাহিত্যের সঙ্গে সে যুগে চলচ্চিত্রের এক সেতুবন্ধন ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছিল। এই দুটি ছবিতেই বড়ুয়ার প্রতিভার স্বাক্ষর আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। এছাড়াও তিরিশ দশকে দেবকী বসু পরিচালিত 'চন্ডিদাস' ছবিটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় পরিচ্ছন্ন এক কাব্যিক পরিবেশ গড়ে দর্শকের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিল। শুধু তাই নয় এই ছবিতেই সর্বপ্রথম চলচ্চিত্রে আবহ সঙ্গীতের ব্যবহার চলচ্চিত্রের এক নব দিগন্তের দ্বার খুলে দেয়। এই সময়ে আরো যেসব উল্লেখযোগ্য বাংলা ছবি তৈরি হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল নরেশ মিত্র পরিচালিত রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' এবং মধু বসু পরিচালিত ক্ষীরোদ প্রসাদের 'আলীবাবা'। এই ছবি দুটি সে যুগের দর্শকদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। ঠিক এই সময়ই 'ঠিকাদার' ছবিটিও ভারত লক্ষ্মী পিকচার্স যথেষ্ট চমক দিয়ে সৃষ্টি করেছিল। ছবিটির পরিচালনায় ছিলেন প্রফুল্ল রায়।

৪.৪.৪ স্বাধীনতা পরবর্তী পালাবদল

দেশ স্বাধীন ও ভাগ হওয়ার অনেক আগেই যাত্রা শুরু করেছিল বাংলা সিনেমা এবং ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের উপর ছিল তার গভীর প্রভাব। এই বাংলার হীরালাল সেনই ভারতীয় চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ রূপে স্বীকৃতি পান। কিন্তু খুব ভাল করে শুরুর দিকের চলচ্চিত্র জগতের বিষয় ভাবনার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, চলচ্চিত্র নামক শিল্প মাধ্যমের সঙ্গে মানুষ-সমাজ-রাজনীতির সমকালের যে যোগসাজস রয়েছে বা সেটার যে স্বাভাবিক প্রকাশ মাধ্যম চলচ্চিত্র হতে পারে, এই সত্যিটা তখনকার বাংলা ছবি এবং তখনকার ছবি নির্মাতারা বুঝে উঠতে পারেননি। এটা লক্ষ্যণীয় যে স্বাধীনতার জন্য বাংলা তথা বাঙালির সংগ্রাম, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, কলকাতার রাজপথে মৃত্যু-মিছিল, দেশভাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা, ভাতৃঘাতী দাঙ্গা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানবতা ধ্বংসকারী ফ্যাসিবাদের উত্থান — একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ ও সমাজ জীবন বদলে দেওয়া ঘটনার প্রভাব বা প্রতিফলন সেভাবে বাংলা চলচ্চিত্রে দেখা যায়নি যা পরে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেনের হাত ধরে বাংলা চলচ্চিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী দশকে এই ভাবনা ক্রমেই মাথাচাড়া দিতে থাকে যে সিনেমা একটি শক্তিশালী শিল্পমাধ্যম বা আরও কিছুর জনক হতে পারে। সিনেমা সম্পর্কে এই নতুন ভাবনার ও পথের সূত্রপাত হয় একঝাঁক তরুণের উদ্যোগে। এই বাংলাতেই কলকাতার ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সূচনা হয়। সেই আন্দোলন থেকে উঠে এলেন নতুন বাস্তববাদী ধারার পরিচালক সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, রাজেন তরফদার, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, বংশী চন্দ্রগুপ্ত প্রমুখ। ভারতবর্ষ

স্বাধীন হওয়ার পরেই গঠিত হয় ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি। নব্য পরিচালক এবং চলচ্চিত্র অনুরাগীরা বিশ্বের চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ পান, বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্রকারদের ধ্রুপদী ছবিগুলির প্রতি মনযোগ যায় অর্থাৎ দেখা শুরু হয়, সেগুলি নিয়ে চর্চায় নিজেদের সমৃদ্ধ করা আর একই সঙ্গে শুরু হয়ে যায় ভালো সিনেমা নির্মাণের প্রস্তুতি।

পঞ্চাশের দশকের গোড়াতেই বাংলা চলচ্চিত্র-ভাবনা থেকে শুরু করে তার নির্মাণ সম্পর্কিত যাবতীয় প্রথাগত ধ্যানধারণা সবটাই পাল্টাতে থাকে। বিশেষ করে সত্যজিৎ রায়ের প্রথম ছবি পথের পাঁচালীর নির্মাণভাবনা থেকে শুরু করে তার শিল্পরূপ এবং এই অন্যধারার ছবিটির অভাবনীয় সাফল্য চলচ্চিত্রের আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলা ছবির পরিচিতি ঘটায়। তবে শুধুমাত্র সত্যজিৎ রায় নন, তাঁর সমসাময়িক বাংলা চলচ্চিত্রের অন্য দুই গুরুত্বপূর্ণ পরিচালক ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেনও স্বাধীনতার পরে প্রায় একই সময়ে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পে পা রেখেছিলেন। সমকালীন এই তিনজনের সৃষ্টির উড়ানে চেপেই বাংলার এবং ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প বিশ্ব চলচ্চিত্রের আসরে গৌরবময় অবস্থান দখল করে।

সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণাল এর মিলিত অবদানের পাশে উল্লেখযোগ্য আরও কিছু চলচ্চিত্র নির্মাতার নাম। রাজেন তরফদারের ১৯৫৭ থেকে ১৯৮৭ তিন দশকে মাত্র ৭টি ছবি- অন্তরীক্ষ, গঙ্গা, অগ্নিশিখা, জীবনকাহিনি, আকাশছোঁয়া, পালঙ্ক আর নাগপাশ। তার মধ্যে গঙ্গা আর পালঙ্ক বিশেষ ছাপ ফেলেছিল। বাংলা ছবির এই নতুন অধ্যায়ের সুচনায় তাঁর কথা উঠে আসে মূলত তাঁর বিচিত্র বিষয় নিয়ে ছবি তৈরির জন্য। গঙ্গাকে তিনি দেখেছিলেন এক দার্শনিক কোণ থেকে। 'আকাশছোঁয়া'র কেন্দ্রে ছিল সার্কাস। নায়ক মোটরবাইক স্টান্ট খেলোয়াড়। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাহিনি অবলম্বনে করলেন পালঙ্ক। দেশভাগ, বাংলাদেশ তৈরি হওয়ার প্রেক্ষাপটে উদ্বাস্তুদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং একটি পালঙ্ক ঘিরে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ এবং সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের ঊর্ধে আসে বাঙালি মূল্যবোধ। গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের ছাত্র রাজেন তরফদার কর্মজীবন শুরু করেন বিজ্ঞাপন জগতে আর সেখান থেকেই থেকেই সিনেমার জগতে আসা, ১৯৫৭-য়। তখন থেকেই সর্বক্ষণের চলচ্চিত্রকার-জীবন শুরু। শুধু পরিচালনাই নয়, অভিনয়েও নিজের ছাপ রেখেছেন মৃণাল সেনের 'আকালের সন্ধানে' ও 'খণ্ডহর', শ্যাম বেনেগালের 'আরোহণ' আর শেখর চট্টোপাধ্যায়ের 'বসুন্ধরা' য়।

বহু সমাদৃত সমান্তরাল সিনেমা-র বাইরে বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পে আর এক গুণী পরিচালক তপন সিংহ। যিনি খুব ভাল করেই জানতেন সংস্কৃতিমনা বাঙালির রুচি ঠিক কোন ধরনের সিনেমায় এবং গল্পের গুরুত্ব। তিনি সেলুলয়েডে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে তারাশঙ্কর, বনফুল, সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী, শংকর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের গল্প। তাঁর নির্মিত 'অঙ্কুশ, উপহার, কাবুলিওয়ালা, ক্ষুধিত পাষাণ, ঝিন্দের বন্দী, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, নির্জন সৈকতে, জতুগৃহ, হাটে বাজারে'র মতন ছবিগুলি মোটের উপর সাহিত্য নির্ভর। আবার 'আপনজন, সাগিনা মাহাতো' ইত্যাদি ছবিতে তপন সিংহকে পাওয়া যায় একেবারে অন্যভাবে যেখানে তিনি সময়ের দাবি মেনে রাজনীতি এবং সমাজকে কেবল যে বোঝবার চেষ্টা করছেন তাই নয় সমকালীন নিরিখে তাঁর নিজের কথাও বলেছেন। সময়কে আরও বেশি স্পষ্ট ও সোচ্চার হতে দেখা যায় তাঁর 'আতঙ্ক' ছবিটিতে। ছবির প্রয়োজনে কাহিনি, গান রচনা এবং তার সুরারোপ এমনকি শুটিং এর খুঁটিনাটি কারিগরি প্রকৌশলে তপন সিংহ ছিলেন দক্ষ। একথা স্বীকার করতেই হয় যে তপন সিংহ স্বাধীনতা-উত্তর মূলধারার সিনেমায় অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র-নির্মাতাদের একজন।

আবার তরুণ মজুমদারের মতন জনপ্রিয় পরিচালকের দর্শকের কাছে পৌঁছানোর পথ ছিল সিনেমার সহজ রসায়ন ভালো গল্প ও মন ছোঁয়া গান। এই রসায়নে পলাতক, আলোর পিপাসা, বালিকা বধু, শ্রীমান পৃথ্বীরাজ, ফুলেশ্বরী, সংসার সীমান্তে, গণদেবতা তার উল্লেখযোগ্য কাজ। অন্যদিকে ভালোবাসা ভালোবাসা, দাদার কীর্তি, আলো সাধারণ দর্শকদের কাছে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে।

পাশাপাশি গত শতকের আশির দশকের একেবারে গোড়ার দিক থেকেই সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণাল পরবর্তী প্রজন্মের বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গৌতম ঘোষ, অপর্ণা সেন, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী প্রমুখ চলচ্চিত্রকাররাও নান্দনিক দিক দিয়ে যেমন তেমনই সমাজ-সচেতন চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবেও উল্লেখ্য। সত্যজিৎ ঋত্বিক ও মৃণাল পরবর্তী আলোচনায় প্রথমেই আসতে পারেন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত তাঁর বেশ কিছু ছবির জন্য। দূরত্ব, নিম অন্নপূর্ণা, গৃহযুদ্ধ, তাহাদের কথা, মন্দ মেয়ের উপাখ্যান, চরাচর, লাল দরজা, উত্তরা, স্বপ্নের দিন, কালপুরুষ, আমি ইয়াসিন এবং আমার মধুবালা, শীত গ্রীষ্মের স্মৃতি, ফেরা ও বাঘ বাহাদুর বলে অন্যধারার ছবির কথা। যেমন নিম অন্নপূর্ণা উপনিবেশ-উত্তর বাংলার সমাজবাস্তবতার তৎকালীন সঙ্কটের ছবি। দারিদ্র্যে দুঃখে লীন মানুষের কাব্য।

গৌতম ঘোষ চলচ্চিত্র জীবন তথ্যচিত্র নির্মাণ দিয়ে শুরু করেও দখল, দেখা, পদ্মা নদীর মাঝি, আবার অরণ্যে, কালবেলা, মনের মানুষ, শূন্য অঙ্ক, শঙ্খচিল প্রভৃতি বাংলা ছবি করেছেন। বিষয় বৈচিত্র্যের পাশাপাশি চরিত্র ও আখ্যান নির্মাণেও তাঁর মুন্সিয়ানা লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রতি পরিচালক হিসেবে নির্মাণ করেছেন যৌথ প্রযোজনার ছবি 'শঙ্খচিল' (২০১৬)। ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সেরা বাংলা ছবি হয়েছে গৌতম ঘোষের 'শঙ্খচিল'। দেশ ভাগের পর বর্তমান সময়ের দুটি পরিবার যারা সীমান্তে বাস করছে তাদের জীবনের গল্প নিয়ে তৈরি 'শঙ্খচিল'। আর এক পরিচালক উৎপলেন্দু চক্রবর্তীও তথ্যচিত্র দিয়ে শুরু করেছিলেন। এরপর ময়নাতদন্ত, চোখ, দেবশিশু প্রভৃতি বাংলা ছবিতে তিনি স্বকীয়তা রাখার চেষ্টা করেন। সমাজ রাজনীতির কথা তিনিও সরাসরি তার ছবিতে আখ্যানের মাধ্যমেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

আর একজন অন্যরকম ব্যতিক্রমী ও প্রভাবশালী পরিচালক অপর্ণা সেন, অভিনয়ে-নির্মাণে বহুমাত্রিকতাই যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ৩৬ চৌরঙ্গী লেন থেকে গয়নার বাক্স, গল্প বলে নারীর একান্ত গহীন গোপন সব একাকিত্বের কথা। ৩৬ চৌরঙ্গী লেন এক সঙ্গীহীন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান নারীর জীবনের শূন্যতার করুণ উপাখ্যান। বাংলা সিনেমায় নারীচরিত্রের সহযোগী হয়ে থেকে যাওয়া ভবিতব্যের উল্টো স্রোতে হাঁটে অপর্ণা সেনের পরমা, পারমিতার একদিন, গয়নার বাক্স। নারীবাদকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করেন তিনি যাতে ছোঁয়া লাগে মানবতার। যেমন 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস' আয়ার যুদ্ধ ও দাঙ্গার চরম মুহূর্তে মানুষের মানবিক আবেদনের জায়গা। বিভিন্ন ধর্ম ও গোষ্ঠীর মানুষের বিপদের মাঝে বেঁচে থাকার লড়াইয়ের বিচিত্র কর্মকাণ্ড। অপর্ণা সেন, ভারতীয় তথা বাংলা সিনেমাজগতে এক অতি পরিচিত অতীত ও বর্তমান নাম। ভবিষ্যতের পথেও তিনি এক পা বাড়িয়েই রেখেছেন। অভিনয়, চিত্রনাট্য লেখা, চলচ্চিত্র নির্মাণ- পর্দার সকল ধাপেই তিনি সাবলীল ও অনন্য। ১৯৮১ সালে অপর্ণা সেনের প্রথম পরিচালিত সিনেমা 'থার্টি সিক্স চৌরঙ্গী লেন' মুক্তি পায়। এর জন্য তিনি ম্যানিলা চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে গোল্ডেন ঈগল পুরস্কার পান।

আর এক ব্যতিক্রমী পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের স্বল্প কর্মজীবনের মাত্র উনিশ বছরের মধ্যেই মেধা এবং প্রতিভার ফসল মোট উনিশটি ছবি। তাঁর প্রত্যেকটি ছবিই স্বতন্ত্র, অনবদ্য এবং স্বকীয় চিন্তার প্রতিফলন। বেশ কিছু ছবিই

জাতীয় পুরষ্কার জয় করেছিল। পরবর্তী বাংলা সিনেমার নতুন এক ধারা তৈরি করেছিলেন ঋতুপর্ণ। তাঁর চলচ্চিত্র জীবন শুরু ""হীরের আংটি'-র হাত ধরে এবং শেষ হয় 'চিত্রাঙ্গদায়'-য়। এর মাঝে তৈরি করেছেন উনিশে এপ্রিল, দহন, উৎসব, চোখের বালি, দোসর, রেনকোট, শুভ মহরত, সব চরিত্র কাল্পনিক, নৌকাডুবি সহ এক গুচ্ছ জনপ্রিয় অন্যধারার ছবি। তাঁর গল্প উপস্থাপনের কাব্যিক ধরন তাঁর প্রায় প্রতিটি সিনেমাকেই এক অন্য বিশিষ্টতা দিয়েছিল। আরেকটি প্রেমের গল্প, মেমরিস ইন মার্চ ও চিত্রাঙ্গদা - এই তিনটি ছবিতে অভিনেতা ঋতুপর্ণ ঘোষের অনন্য অভিনয় প্রতিভার সাক্ষী থেকেছেন দর্শকরা। এরপর চলচ্চিত্রে স্বকীয়তার দাবী নিয়ে এসেছেন কৌশিক গাঙ্গুলী, সৃজিত মুখোপাধ্যায়।

সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণাল উত্তরকালে চলচ্চিত্রের ভাষা ও চলচ্চিত্র নির্মাণরীতির নান্দনিক সৌকর্যকে ভারতীয় চলচ্চিত্রে বিশিষ্ট জায়গা দেওয়ার ক্ষেত্রে এঁদের অবদান অসামান্য বলেই মনে করা হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালে, বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এদের অসামান্য অবদান রয়েছে। এদের ছবি দেখতে বাঙালি দর্শক প্রেক্ষাগৃহের টিকিট কাউন্টারে দীর্ঘ লাইন দিয়েছে, বিনোদিত হয়েছে বলেই প্রযোজকরা বাংলা ছবিতে লগ্নি করতে সাহস পেয়েছেন। সে লগ্নিতে ভর করেই আজ ওই ব্যাবস্থাটা পুরোপুরি বদলে মাল্টিপ্লেক্স চর্চায় পরিণত হয়েছে। একে একে কলকাতার তথা বাংলার অন্য শহর মফস্বলের ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রেক্ষাগৃহগুলি যেমন মল বা মাল্টিপ্লেক্সে পরিণত হয়ে পৌঁচেছে চলচ্চিত্র বাণিজ্যের অন্য মাত্রায়।

৪.৪.৫ সারাংশ

আমরা এই এককে যে বিষয়ে আলোচনা করলাম সেই গুলি হলো:

- বাংলা চলচ্চিত্রের শুরুর কথা
- বাংলা চলচ্চিত্রের যাত্রাপথ
- স্বাধীনতা পরবর্তী পালাবদল

৪.৪.৬ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন :

১. হীরালাল সেনের প্রথম ছবি কী? কোন সালে মুক্তি পায়?

২. প্রথম বাংলা সবাক ছবির নাম কী? কে পরিচালনা করেছিলেন?

৩. দেবকীকুমার বসু সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

বড় প্রশ্ন :

১. বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে হিরালাল সেনের অবদান বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২. বাংলা চলচ্চিত্র ঋতুপর্ণ ঘোষের ভাবনায় কিভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে তা আলোচনা করুন।

৩. বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসের যাত্রাপথ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪. বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসের স্বাধীনতা পরবর্তী যুগের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৫. বাংলা চলচ্চিত্রের নির্মাণে প্রমথেশ বরুয়া/দেবকী বসুর অবদান আলোচনা করুন।

৪.৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১. *সোনার দাগ,* গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ।

২. *Directory of Bengali Cinema,* Edited by Ausu Sur, Nandan, Kolkata.

৩. *বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস,* কালিকা মুখোপাধ্যায়, প্রতিভাস।

৪. *History of Bengali Cinema,* Kiranmoy Raha, Nandan.

৫. *Encyclopaedia of Indian cinema.*

৬. *Mass Communication in India,* Keval J kumar, Jaico Publishing House.

৭. *গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি,* ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য/লিপিকা।

৮. *চলচ্চিত্রের অভিধান,* ধীমান দাশগুপ্ত/বাণী শিল্প।

৯. *অনভিজাতদের জন্য অপেরা,* সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, প্রতিভাস।

১০. *ঋত্বিকতন্ত্র,* সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, সপ্তর্ষী।

নোটস্

নোটস্

নোটস্

নোটস্

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিস্যাৎ করতে পারি।

—সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

—Subhas Chandra Bose

Price: ₹400.00
[Not for sale]

Published by : Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-I, Salt Lake, Kolkata-700 064 &
Printed at : The Saraswati Printing Works, 2, Guru Prosad Chowdhury Lane, Kolkata 700 006